জানুয়ারি ২০১৩

কোয়ান্টাম বুলেটিন

বর্ষায়নে গুরুজীর বাণী

কোয়ান্টাম পরিবারের প্রিয় সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী,

আসসালামু আলাইকুম।

শুভ কোয়ান্টাম বর্ষায়ন! কোয়ান্টামের ২১ তম বছরের শুভলগ্নে আপনারা আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। ২০ বছর ধরে আপনাদের আন্তরিকতা ও নিরলস পরিশ্রমের ফলেই কোয়ান্টাম এখন লাখো লাখো মানুষের ভরসাস্থল। ধ্যানের গভীরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়, মুমূর্ষু অবস্থায় রক্তের প্রয়োজনে, জটিল ব্যাধি নিরাময়ে, বিপদমুক্তির আশায়, ব্যর্থতার বেড়াজাল ভাঙার প্রয়াসে, সফল প্রাচুর্যময় জীবন নির্মাণে, নিজের মেধা ও দক্ষতা বিকাশে, সৃষ্টির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যে মানুষ ছুটে আসে কোয়ান্টামে। উজ্জীবিত হয় নতুন বিশ্বাসে, নেমে পড়ে জীবন বদলানোর প্রয়াসে।

এই আস্থা, এই প্রত্যাশার পটভূমিতেই আমাদের যাত্রা শুরু হচ্ছে ২১ তম বছরের, এক নতুন দশকের। একুশ আমাদের জীবনে প্রতীক হচ্ছে শপথের, প্রতীক হচ্ছে অর্জনের। আজ থেকে একষট্টি বছর আগে ফেব্রুয়ারির একুশে রক্ত দেয়ার মাধ্যমেই আমরা অর্জন করেছিলাম আমাদের ভাষার অধিকার। তাই ভাষাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আমাদের।

কোয়ান্টামের ২১ তম বছরকে আমরা ঘোষণা করেছি শপথের বছর হিসেবে। আমাদের শপথ হচ্ছে– বিশ্বাসের আলোকে বদলাবো নিজেকে। আর এ বদলানোর সূচনা হোক ভাষা থেকে। আসুন আমরা একসাথে প্রতিজ্ঞা করি, 'আমরা শুদ্ধ ভাষায় কথা বলবো। অশ্লীল ও ব্যঙ্গাত্মক শব্দ বর্জন করবো। সবার সাথে সদাচরণ করবো।'

প্রিয় সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী, আজকের এই বিশেষ ক্ষণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা–সুবচন আর সদাচরণের কল্যাণস্রোতে সার্থক হোক আমাদের জীবন, আলোকিত হোক পৃথিবীর মানুষ।

পরম করুণাময় আমাদের সহায় হোন!

কোয়ান্টাম বর্ষ ২১

শুরু হোক নৈতিক মানবিক পুনর্জাগরণ

২০১৩। কোয়ান্টাম বর্ষ ২১-এর যাত্রা শুরু হলো। এর মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে কোয়ান্টামের তৃতীয় দশক। মায়াসভ্যতার ক্যালেন্ডার অনুসারে আগমন ঘটেছে নতুন পঞ্চম সহস্রাব্দের। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী সূর্য সৌরমণ্ডলের সব গ্রহ নিয়ে প্রবেশ করেছে কুম্ভে। আমরা প্রবেশ করেছি দুহাজার বছরের কুম্ভযুগে। আর এই কুম্ভযুগেই পৃথিবীতে ঘটবে এক নৈতিক মানবিক আত্মিক পুনর্জাগরণ। আমরা সত্যিই ভাগ্যবান, আমাদের জীবনকালে এ উত্থানের সূচনা ঘটছে।

১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম। সেই থেকে এর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত হয়েছেন অসংখ্য মানুষ। উদ্বুদ্ধ হয়েছেন মানবিক ও ইতিবাচক জীবনদৃষ্টিতে। ধ্যানের নৈতিক ও আত্মিক শক্তির আলোকে জীবন বদলে উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন। বদলে গেছে লাখো জীবন।

ফাউন্ডেশনের এ দুদশকের পথ-পরিক্রমায় রচিত হয়েছে অভূতপূর্ব সব সাফল্যগাথা। টানা ২০ বছর ধরে উদ্ভাবক কর্তৃক একক পরিচালনায় সম্পন্ন হয়েছে ৩৫০টিরও বেশি মেডিটেশন কোর্স, যা বিশ্বে এই প্রথম।

কোয়ান্টামের সদস্যরা শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যের আঙিনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি; তারা একত্রিত হয়েছেন, সঙ্ঘবদ্ধভাবে সফল করে তুলেছেন মানবিক ও সেবামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম। উদ্দেশ্য একটাই–স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন ও সৃষ্টির সেবা। স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরিকল্পনা, স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ফাউন্ডেশনের সেবামূলক কার্যক্রমগুলো তাই চারপাশে সৃষ্টি করেছে মানবিকতার এক ভিন্নমাত্রা।

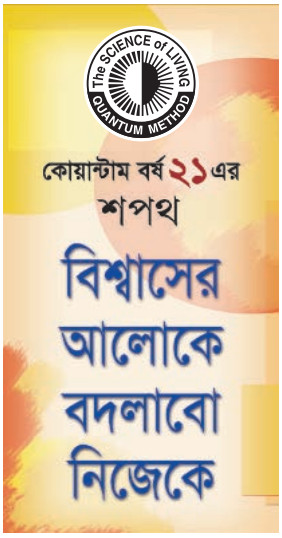
২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক প্রযুক্তির স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম কোয়ান্টাম ল্যাব ইতোমধ্যেই বাঁচাতে সহায়তা করেছে প্রায় পাঁচ লক্ষ প্রাণ। বান্দরবানের লামায় সাড়ে পাঁচ শতাধিক বঞ্চিত পাহাড়ি বাঙালি শিশুকে আলোকিত করে তোলা হচ্ছে শিক্ষার আলোয়। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছে নলকূপ। গর্ভবতী দরিদ্র মায়েদের প্রয়োজনীয় পুষ্টিচাহিদা পূরণ ও নিরাপদ সন্তান প্রসবে সহায়তা করছে মাতৃমঙ্গল কার্যক্রম।

এছাড়াও বেওয়ারিশ লাশ দাফন, বৃক্ষরোপণ, চিকিৎসাসেবা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ বিতরণ ও খতনা সেবাসহ বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ফাউন্ডেশনের সদস্যদের আন্তরিক কর্মোদ্যমে। আর এসব কাজ সম্ভব হচ্ছে সদস্যদের কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে সঞ্চিত সাধ্যমতো দানের মাধ্যমে।

ধ্যানচর্চা ও সৃষ্টির সেবার পাশাপাশি সর্বাবস্থায় শুকরিয়া, উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, পারস্পরিক দোয়া কামনা, সময় ও নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি সদাচরণের মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম মানুষকে একটি নৈতিক মূল্যবোধে জাগিয়ে তুলছে। কারণ, কোয়ান্টাম বিশ্বাস করে, সামগ্রিক যেকোনো পরিবর্তনের জন্যেই আগে চাই নিজেকে বদলানো। আর ব্যক্তিমানুষের এই পরিবর্তনই সমাজের সর্বস্তরে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করবে। সূচিত হবে নৈতিক মানবিক আত্মিক পুনর্জাগরণ।

মা-জীর শুভেচ্ছা

২০১৩-এর ১ জানুয়ারি ২১ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে কোয়ান্টাম মেথড। এ উপলক্ষে ৪ জানুয়ারি শুক্রবার সারাদেশে ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা উদযাপন করবেন কোয়ান্টাম বর্ষায়ন। এ আনন্দক্ষণে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য আর সাফল্য প্রত্যাশা করে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শ্রদ্ধেয়া মা-জী নাহার আল বোখারী।



মাটির ব্যাংক সালতামামি উৎসব

২১, ২২ ও ২৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হলো মাটির ব্যাংক সালতামামি উপলক্ষে বিশেষ করসেবা। কোয়াটাম ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলগুলো একযোগে অংশ নেয় মাটির ব্যাংক সংগ্রহ, জমাদান ও বিতরণে।

মাটির ব্যাংকের সাথে বিতরণ করা হয় মাটির ব্যাংকের বিশেষ বুলেটিন এবং গুরুজীর শুভেচ্ছাবাণী সম্বলিত নতুন বছরের পকেট ক্যালেন্ডার। বছর শেষের এই মাটির ব্যাংক করসেবা উৎসবমুখরতা আর শ্রমানন্দে পূর্ণ। শীতের প্রকোপ উপেক্ষা করে করসেবায় কোয়ান্টিয়ারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিলো চোখে পড়ার মতো।

দানের কল্যাণস্পর্শ চারদিকে ছড়িয়ে দিতে সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেল কোয়ান্টিয়াররা ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকেই গ্রহণ করেছিলেন নানা রকম প্রস্তুতি। বিতরণকৃত ব্যাংক সংগ্রহ, নতুন ব্যাংক বিতরণ আর সাথে ঘরে ঘরে তারা পৌঁছে দেন ৪ জানুয়ারি কোয়ান্টাম বর্ষায়নের বার্তা।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স
৩৫৪ তম ব্যাচ

ঢাকা : ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ জানুয়ারি

জানুয়ারির কর্মসূচি

প্রজ্ঞা জালালি : ২ জানুয়ারি

প্রো-মাস্টার্স ওয়ার্কশপ (১৭ ও ১৮ ব্যাচ) : ১১ ও ১২ জানুয়ারি

কোয়ান্টামম গ্রাজুয়েট কোয়ান্টায়ন : ১০, ১১ ও ১২ জানুয়ারি

কোয়ান্টামম প্রো-মাস্টার্স কোয়ান্টায়ন : ১৭, ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি

দেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম। বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ 'বাংলাপিডিয়া' তার দীর্ঘদিনের স্বপ্নের ফসল। এছাড়াও গত কয়েক দশকের দীর্ঘ গবেষণায় তিনি বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে স্যার যদুনাথ স্বর্ণপদকে ভূষিত ড. সিরাজুল ইসলাম বাংলাদেশের একমাত্র ইতিহাসবিদ, যিনি ব্রিটেনের রয়েল হিস্টোরিকাল সোসাইটির সম্মানিত ফেলো মনোনীত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাপিডিয়ার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ-এর তিন বারের প্রেসিডেন্ট সত্তরোর্ধ্ব এই কর্মীপুরুষ সম্প্রতি কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আমাদের এবারের প্রতিবেদন।



ইতিহাসের জ্ঞান আমাদের বর্তমানকে বুঝতে সাহায্য করে

প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম

তখন আমরা এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে কাজ করছিলাম। পরবর্তীতে যা বাংলা ও ইংরেজিতে মোট ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। সে কাজটি করতে গিয়ে ইতিহাসের অনেক নাম, স্থান, ঘটনার বিবরণ ও তারিখ ইত্যাদি জানার প্রয়োজন হচ্ছিলো। দেখা যেত, ছোট্ট একটি তথ্য খুঁজে পেতে অনেক সময় চলে যাচ্ছে। তখনই এনসাইক্লোপিডিয়ার মতো আমাদের নিজস্ব একটি রেফারেন্স বইয়ের প্রয়োজনীয়তাটা অনুভব করলাম। মনে হলো, বাংলাদেশ বিষয়ে এ সব তথ্যগুলোকে একসাথে করতে পারলে বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়। আমাদের সে চিন্তারই ফসল আজকের বাংলাপিডিয়া।

বিশ্বজুড়েই এশিয়াটিক সোসাইটি একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। এর প্রতি মানুষের আস্থা আছে। তাই এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে আমরা যখন উদ্যোগ নিলাম তখন সরকারের পাশাপাশি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, বিভিন্ন ব্যাংক এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। অনেকের সম্মিলিত সহযোগিতায় একসময় প্রয়োজন মতো পাঁচ কোটি টাকার পুরোটা যোগাড় হয়ে গেল।

আমরা কাজ শুরু করলাম। দেশে এবং বিদেশে বাঙালিদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যারা ছিলেন, তাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের প্রয়োজন আর কাজের ধরনটা বুঝিয়ে দিলাম। যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাকে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দের মধ্যে নিবন্ধ লিখে দেয়ার আহ্বান জানালাম। তারপর ২০ সদস্যের একটি অভিজ্ঞ সম্পাদকমণ্ডলী পুরো কাজটি সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করলেন। সবমিলিয়ে এতে কাজ করেছেন প্রায় দুশ জন কর্মী।

বিশ্বকোষের আঙ্গিকে সম্পূর্ণ নিজেদের এরকম একটি সংকলন তৈরি করার কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ছিলো না। তাই বিশ্বের বিভিন্ন বড় বড় ও বিখ্যাত বিশ্বকোষ, যেমন–এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা-তে কাজ করেছেন এমন পণ্ডিত ব্যক্তিদের আমরা আমন্ত্রণ জানালাম। নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে তারা আমাদের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিলেন।

একসময় আমাদের দশ বছরের চিন্তা স্বপ্ন শ্রম বাস্তব রূপ পেলো। সৌভাগ্যই বলতে হবে, আমরা সফল হলাম। প্রকাশিত হলো বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ 'বাংলাপিডিয়া'। প্রকাশের পর থেকেই বাংলাপিডিয়া বেশ সাড়া জাগিয়েছে। তথ্যের সহজলভ্যতার কারণে আইডিয়াটা সবারই পছন্দ হয়েছে। ফলে এটি বিক্রিও হয়েছে প্রচুর। প্রথম সংস্করণে বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই দশ খণ্ডে এবং দ্বিতীয় সংস্করণে এটি চৌদ্দ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও সিডিতে এবং অনলাইনেও বাংলাপিডিয়া পাওয়া যাচ্ছে। অনলাইন বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়া এবং সার্চ ইঞ্জিন গুগল ইতোমধ্যেই আমাদের কাছ থেকে এটি নিয়েছে এবং রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করছে। এখন প্রতি মাসে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে শুধু আমাদের ওয়েবসাইটেই এটি খোঁজ করা হচ্ছে গড়ে ৩০ লক্ষ বারের চেয়ে বেশি। বলা যায়, বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিচ্ছে বাংলাপিডিয়া।

পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে নানা দিকে এগিয়ে আছে, এমন অনেক দেশ এখনো নিজস্ব জ্ঞানকোষ সংকলন করতে পারে নি। বাংলাপিডিয়ার মতো এমন একটি ব্যাপক আকারের কাজে আমরা যে শেষপর্যন্ত সফল হতে পেরেছি, তার প্রধান কারণ হলো আমরা আমাদের সীমিত সুযোগ ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পেরেছি। সেইসাথে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আমরা অনেকগুলো মানুষ একত্রিত হয়ে কাজ করেছি। এ কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের একটি বাস্তব উপলব্ধি হলো, কোনো একটি লক্ষ্যের জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও একত্রিত হলে আমরা যেকোনো কাজে সফল হতে পারি।

এই যে একত্রিতকরণ, এটা আবার করতে হয় একজনকে। আর এখানেই আসে নেতৃত্বের প্রশ্ন। সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্ব আসলে এজন্যেই প্রয়োজন। এই নেতৃত্বটা আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন পরিমণ্ডলে এসেছে। ফলে শিল্পায়ন ও সামাজিক নানা ক্ষেত্রে এখন অনেক ভালো ভালো কাজ হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে। এদের সবাইকে একত্রিত করে একটি সম্মিলিত জাতীয় শক্তিতে রূপ দিতে চাইলে এখন আমাদের চাই একটি আস্থাপূর্ণ নেতৃত্ব। তাহলে সত্যিই আবার আমরা একটি সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত হতে পারবো–যেমনটা একসময় আমরা ছিলাম।

আজকে পাশ্চাত্যের যে বৈষয়িক সমৃদ্ধি, সেটি এসেছে মূলত তাদের শিল্প-বিপ্লবের পথ ধরে। ১৮ শতকের শেষ সিকিতে ইউরোপে আর ১৯ শতকের প্রথম দিকে আমেরিকায়–এ দুটো শিল্প-বিপ্লবের পেছনে রয়েছে তাদের ঔপনিবেশিক বাণিজ্য। বিশেষত ভারতবর্ষ ও বাংলার সাথে তাদের বাণিজ্য। অর্থাৎ তাদের দেশে শিল্পায়নের মূল উপাদান ও পুঁজি সরবরাহ করেছি আমরা। আমাদের সম্পদ নিয়ে তারা বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য করেছে, আমরা সেটা পারি নি। কারণ আমাদের সম্পদ ছিলো ঠিকই, কিন্তু দায়িত্বটা আমরা নিতে পারি নি। আর এটি তখনই সম্ভব, যখন আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে পারবো। ইতিহাসের শিক্ষা আমাদের তা-ই বলে।

ইতিহাস আসলে এমন একটি বিষয়, যা জানা থাকলে মানবসভ্যতার উত্থান-পতন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার গতিপ্রকৃতিগুলো আমরা সহজেই বুঝতে পারি। বিশ্বসভ্যতার পরিবর্তনের ধারাগুলো সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাই। আর এর আলোকে আমরা বর্তমানকে তুলনামূলক ভালো বুঝতে পারি। বর্তমানকে ভালোভাবে মোকাবেলা করতে পারি।

উন্নয়ন আর প্রযুক্তিতে পাশ্চাত্য অনেকখানি এগিয়ে গেছে সত্যি। কিন্তু তা এখন এমন একটি অবস্থানে গিয়ে পৌঁছেছে, যা ধরে রাখার প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ আজ তাদের নেই। এ কারণে সারা পৃথিবী থেকে তারা লোক নিয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের নিজেদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে তরুণদের যোগ্যতর করে গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ দিতে হবে আমাদের।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, তরুণদের জন্যে অত্যন্ত অনুপ্রেরণামূলক একটি কার্যক্রম এটি। এতজন মানুষকে একত্রিত করে এরকম একটি কার্যক্রম পরিচালনা করা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি অনেক কিছু করতে না পারি, কিন্তু আমার সাধ্যমতো কিছু তো করতে পারি–এ ধরনের কার্যক্রম সবার মাঝে এ বোধটুকু জাগিয়ে তুলবে বলে আমার বিশ্বাস।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

হাঁটুন, নিয়মিত হাঁটুন



হাঁটার উপকারিতা বিস্তর

Walking is the best medicine. আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস এ কথাটি বলেছিলেন আড়াই হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে। কথাটি আজও একইরকম সত্য। বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য-গবেষকদের মতামত তা-ই বলছে।

হাঁটার উপকারিতা বিস্তর। নিয়মিত হাঁটেন যারা, তাদের হৃৎপিণ্ড সুস্থ থাকে। কারণ, হাঁটার ফলে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বাড়ে। আর উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও স্ট্রোকের মতো জীবনঘাতী রোগগুলো প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত হাঁটার ভূমিকা এখন একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত। শুধু শারীরিক সুস্থতার জন্যেই নয়, মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখারও চমৎকার একটি উপায় হলো হাঁটা।

প্রায় চল্লিশ হাজার নারী-পুরুষের ওপর পরিচালিত একটি ব্যাপক আকারের গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত হাঁটার অভ্যাসটি যাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ, তারা তুলনামূলক কম অসুস্থতায় ভোগেন। তাদের ওষুধ সেবনের প্রয়োজনও পড়ে অনেক কম। এছাড়াও হাঁটার ফলে দেহের অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা বাড়ে। ফলে শরীর-মন সবসময়ই থাকে প্রাণবন্ত।

হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখতে নিয়মিত হাঁটুন

নিয়মিত হাঁটুন। আপনার হৃৎপিণ্ডের সুস্থতার জন্যে এটি বিশেষভাবে উপকারি। যারা সপ্তাহে তিন ঘণ্টা দ্রুতগতিতে হাঁটেন, তাদের করোনারি হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে অনেকখানি। সেইসাথে কমে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি। হৃৎপিণ্ড থাকে সুস্থ সবল ও অধিকতর কর্মক্ষম।

রক্তে কোলেস্টেরল-মাত্রার তারতম্য করোনারি হৃদরোগের একটি অন্যতম কারণ। এখানে উল্লেখ্য, হৃৎপিণ্ডের সুস্থতার জন্যে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল এলডিএল-এর পরিমাণ থাকা চাই পরিমিত আর উপকারি কোলেস্টেরল এইচডিএল-এর পরিমাণ থাকা উচিত নির্দিষ্ট সীমার চেয়ে বেশি। নিয়মিত হাঁটলে তা-ই ঘটে। অর্থাৎ এলডিএল-এর পরিমাণ কমে এবং এইচডিএল-এর পরিমাণ বাড়ে। হৃৎপিণ্ডের সুস্থতার জন্যে এটি জরুরি।

এছাড়াও নিয়মিত হাঁটলে শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। উল্লেখ্য, অতিরিক্ত ওজন বা মেদস্থূলতা করোনারি হৃদরোগের অন্যতম কারণ।

ন্যাচারাল বাইপাসের সম্ভাবনা বাড়ে

নিয়মিত হাঁটেন যারা, তাদের হৃৎপিণ্ডের চারপাশে কোলেটারাল সারকুলেশন গড়ে ওঠে। সেটা কেমন? আমরা অনেক সময় শুনি, এনজিওগ্রাম করে দেখা গেছে, কারো একটি বা দুটি করোনারি ধমনীতেই রক্ত চলাচল শতভাগ বন্ধ অর্থাৎ ১০০% ব্লকেজ। মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক–তবে তিনি বেঁচে আছেন কী করে? রক্তনালী শতভাগ বন্ধ হয়ে পড়লে তো হৃৎপিণ্ডের কোষ আর পেশিগুলো প্রয়োজনীয় রক্ত ও পুষ্টির অভাবে পুরোপুরি অকেজো এমনকি মারা যাওয়ার কথা। কিন্তু তার ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে না কেন?

এর অন্যতম কারণ হলো, এদের হৃৎপিণ্ডের ব্লকেজ-আক্রান্ত ধমনীর চারপাশে কিছু পরিপূরক রক্তনালী সচল হয়ে ওঠার মাধ্যমে একটি কোলেটারাল সারকুলেশন গড়ে ওঠে। এখানে যে বিষয়টি ঘটে তা হলো, হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনীর চারপাশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালী থাকে, যারা শারীরিক পরিশ্রম করেন, ব্যায়াম করেন, বিশেষত যারা নিয়মিত হাঁটেন, তাদের এই রক্তনালীগুলো সচল হয়ে ওঠে। মূলত এই বিকল্প রক্ত সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমেই হৃৎপিণ্ডের সব অংশে প্রয়োজনীয় রক্ত পৌঁছে যায়।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালীর সংখ্যা কারো কারো ক্ষেত্রে দুশ থেকে আড়াইশটি পর্যন্ত হতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে ন্যাচারাল বাইপাস হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

করোনারি হৃদরোগ নিরাময়ের একটি উপায় হিসেবে বর্তমানে দেশে-বিদেশে ইসিপি নামে একটি চিকিৎসাপদ্ধতির প্রচলন ঘটেছে। যার মূল উদ্দেশ্য প্রধানত এটাই–কোলেটারাল সারকুলেশন গড়ে তোলা। আর এ উপকারটিই আপনি বিনা অর্থ ব্যয়ে চমৎকারভাবে লাভ করতে পারেন নিয়মিত ৩০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা হাঁটা এবং ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে। হাঁটার ফলে একদিকে আপনার ন্যাচারাল বাইপাসের সম্ভাবনা বাড়লো, এর পাশাপাশি হাঁটার অন্যান্য উপকারিতাগুলোও আপনি লাভ করলেন।

উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে

নিয়মিত হাঁটলে আপনি উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও স্ট্রোকের ঝুঁকিমুক্ত থাকবেন। পরিবারে ডায়াবেটিসের ইতিহাস আছে যাদের, তারা বেশ দুশ্চিন্তায় ভোগেন। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি হয়তো তাড়া করে ফেরে তাদের। প্রায়ই ভাবেন, এ থেকে বুঝি আর মুক্তি নেই। গবেষকরা বলছেন, মুক্তির উপায় আছে বৈকি। আর সেটি হলো, সপ্তাহে অন্তত ৪–৫ দিন জোরে হাঁটুন। ইংল্যান্ডে পরিচালিত একটি গবেষণায় এটি প্রমাণিত হয়েছে।

আবার, ইতোমধ্যেই উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে থাকেন যদি, তবে প্রতিদিন নিয়ম করে হাঁটা আপনার জন্যে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এ রোগগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে হাঁটা অত্যন্ত কার্যকরি। তাতে এসব রোগ থেকে সৃষ্ট নানান জটিলতাগুলো আপনি খুব সহজেই এড়াতে পারবেন। আর সে কারণেই এসব অসুখ শনাক্ত হলে চিকিৎসকরা ওষুধের পাশাপাশি নিয়মিত হাঁটার পরামর্শ দেন।

উপকারিতা আছে আরো

হাঁটলে ক্যান্সার ঝুঁকি কমে। একাধিক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন, নিয়মিত হাঁটার ফলে কোলন ক্যান্সার এবং বিশেষত মহিলাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে। এমনকি ক্যান্সার-আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে যারা নিয়মিত হাঁটেন, তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অন্যদের চেয়ে তুলনামূলক কম।

হাঁটার ফলে হাড়ক্ষয় বা অস্টিওপোরোসিস-এর ঝুঁকি কমে। এছাড়াও নিয়মিত হাঁটার ফলে শরীরের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হয়ে ওঠে অধিকতর সংহত ও কার্যকরি।

হাঁটুন, সুখী হবেন

নিয়মিত হাঁটার একটি উল্লেখযোগ্য উপকারিতা হলো, এর ফলে মস্তিষ্কের নিউরোনগুলোতে রক্তপ্রবাহ বাড়ে। মস্তিষ্কের নিউরোন, সিন্যাপ্স ও রক্তনালিগুলো কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। মস্তিষ্ক হয়ে ওঠে অধিকতর সক্রিয় ও প্রাণবন্ত।

নিয়মিত হাঁটেন যারা, তাদের দেহ-মনে সৃষ্টি হয় এক চনমনে সুখানুভূতি। কারণ, এতে স্ট্রেস-এর পরিমাণ কমে। গবেষকরা বলছেন, এরা তুলনামূলক দুশ্চিন্তামুক্ত, হাসিখুশি, তারুণ্যদীপ্ত ও ইতিবাচক মনোভাবে উজ্জীবিত। শুধু তা-ই নয়, নিয়মিত হাঁটার ফলে বয়সজনিত স্মৃতিভ্রম রোগ আলঝেইমার্স-এর ঝুঁকি কমে।

হাঁটা বিষণ্নতা প্রতিরোধ ও নিরাময় করে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, গুরুতর বিষণ্নতায় ভুগছিলেন এমন রোগীদের মধ্যে একদলকে নিয়মিত হাঁটার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। টানা ১২ সপ্তাহ এভাবে চলার পর দেখা গেছে, তাদের বিষণ্নতার হার কমে গেছে অনেকখানি। বিজ্ঞানীদের মতে, হাঁটা সত্যিই সুখকর। আর হাঁটার সাথে রাতের সুখনিদ্রার সম্পর্কটাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

নিয়মিত হাঁটুন

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন, হাঁটা আপনার দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা বাড়ায়। আপনাকে সার্বিকভাবে সুস্থ রাখে। তাই নিয়মিত হাঁটুন। সকালে বা বিকেলে আপনার সুবিধামতো যেকোনো সময়ে হাঁটতে পারেন। একে দৈনন্দিন রুটিনের একটি আনন্দময় অনুষঙ্গে পরিণত করুন। সুস্থতার আনন্দ নিয়ে হাঁটুন।

দেহ-মনের সুস্থতার জন্যে চাই জোর কদমে হাঁটা। ঘণ্টায় চার মাইল বেগে। দিনে অন্তত ৩০ মিনিট। এভাবে না পারলে ধীরে হাঁটুন এবং দিনে ১৫/২০ মিনিট করে শুরু করুন। প্রতিদিনই একটু একটু করে হাঁটার গতি ও সময় বাড়ান।

হাঁটার আদ্যোপান্ত জানলেন। সত্যতা নিজেই পরখ করে দেখুন। হাঁটতে বেরিয়ে পড়ুন...।

গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

সপরিবারে অংশ নেয়া উচিত

ডা. জি এম আবদুস সালাম



২০০০ সাল থেকে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের মাধ্যমে আমি এ পরিবারের সাথে জড়িত। কোর্সে এসে অনুভব করলাম, আরো আগে যারা কোর্সটি করেছেন তারা লাভবান হয়েছেন এবং জীবনের সঠিক সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন। কোর্সের অনেক কথা হয়তো আগেও জানতাম কিন্তু এর বাস্তব প্রয়োগ শিখলাম এখানে এসে। আরো উপলব্ধি হলো, চমৎকার এ কোর্সে একা নয়, সপরিবারে অংশ নেয়া উচিত।

[ডা. জি এম আবদুস সালাম, ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ, ক্যান্সার হোম, মহাখালী। ৩৫১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

লক্ষ্য ঠিক করতে পেরেছি

সারিকা সাবরিন



গত কয়েক মাস ধরে নিজের এবং পরিবারের কিছু বিষয় নিয়ে আমি বেশ মানসিক কষ্টে ছিলাম। মনে হচ্ছিলো আমার চারপাশে শুধু সমস্যা আর সমস্যা। কিন্তু এ কোর্সের চারদিন পর আমার মনে হলো, আসলে আমার কোনো সমস্যাই নেই। সমস্যা ছিলো একটাই–আমার লক্ষ্য ঠিক ছিলো না।

গুরুজীকে ধন্যবাদ যে, কোর্সের মাধ্যমে আমি আমার লক্ষ্য ঠিক করতে পেরেছি। সেইসাথে নিজের সাথে অঙ্গীকার করতে পেরেছি যে, লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে আমি সর্বাত্মক পরিশ্রম আর চর্চা করবো।

[সারিকা সাবরিন, অভিনেত্রী। ৩৫২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আমার বিশ্বাস এখন চশমা ছাড়াই দেখতে পারবো

নবনীতা ঘোষ



প্রথমদিন কোর্সে এসে স্টেজের ওপরে একটা গোল জিনিস দেখলাম। কিন্তু চশমা পরে বুঝতে পারলাম সেটা আসলে ঘড়ি। অথচ দূরত্ব খুব বেশি ছিলো না। এই ছিলো আমার চোখের অবস্থা। কোর্সে ৩য় দিন নিরাময়ের মেডিটেশনের পর চোখ খুলে একই দূরত্ব থেকে দেখতে পারলাম ঘড়িতে কয়টা বাজে। আমি খুবই অবাক হয়ে গেলাম! আমি বিশ্বাস করি, নিয়মিত মেডিটেশনের মাধ্যমে আমার আর চশমা পরার প্রয়োজন হবে না।

[নবনীতা ঘোষ, ৯ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী, ভিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ। ৩৫২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আরো প্রাণবন্ত আর সুস্থবোধ করছি

এ কে এম সফিকুর রহমান



আমার অনেকদিন যাবৎ লিভারের সমস্যা। ওষুধ খেয়ে যাচ্ছি প্রায় চার/পাঁচ বছর ধরে। যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা করিয়েছি। দেশে ডাক্তাররা জানালেন আমার অসুখ এখন ইনিশিয়াল স্টেজে। আত্মীয়স্বজন আর সহকর্মীদের প্রতিনিয়ত উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আমাকে আরো অসুস্থ করে তুললো।

আমার মেয়েদের উৎসাহেই কোয়ান্টাম কোর্সে এলাম। কোর্সের প্রতিটি কথা আমাকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করেছে এবং অন্যরকম আত্মবিশ্বাস কাজ করছে যা আমার সুস্থতার জন্যে খুব জরুরি ছিলো। প্রতিদিন টানা ১০ ঘণ্টা ক্লাস করে কোনো ক্লান্তিবোধ তো করিই নি বরং নিজেকে আরো প্রাণবন্ত আর সুস্থ মনে হয়েছে। কোয়ান্টামের প্রতিটি কাজে শৃঙ্খলাবোধ এবং সময় সচেতনতা আমাকে বিস্মিত করেছে। এত মূল্যবান একটি মস্তিষ্ক যে আমার আছে এটা উপলব্ধি করলাম এখানে এসে।

[এ কে এম সফিকুর রহমান, জেনারেল ম্যানেজার, পেট্রোবাংলা। ৩৫২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ধূমপানে আর আসক্তি নেই

দিদার চৌধুরী



আমার দীর্ঘদিনের ধূমপানের অভ্যাস ছিলো। ১৯৯৬ সালে বাইপাস করানোর তিন মাস পর থেকেই আবার ধূমপান শুরু করি। সম্প্রতি আবার হার্ট এবং কিডনিতে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। তখন আমার মনে হলো, সিগারেটটা ছাড়তে পারলে হয়তো বুকের ব্যথা ৯০ ভাগ সেরে যাবে। এ উদ্দেশ্যেই কোর্সে আসা।

প্রতিদিন আমার ২৫/৩০টি সিগারেট লাগতো। অথচ কোর্সে এসে আমি এতটাই উজ্জীবিত যে, প্রথমদিন খেয়েছি তিনটা সিগারেট, পরের দুইদিন দুইটি এবং এরপর থেকে ধূমপানে আর আসক্তিবোধ করি নি। আমার বিশ্বাস, কোয়ান্টাম আমাদের যে প্রশান্তি আর সুস্থতার পথ দেখাচ্ছে তা অনুসরণ করে প্রতিটি মানুষ সুন্দর জীবন গড়তে পারে।

[দিদার চৌধুরী, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, আইডিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মতিঝিল (প্রাক্তন)। ৩৫২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

জাতি ধর্ম বর্ণের অতুলনীয় সম্প্রীতি

ড. মো. তাজুল ইসলাম



কোয়ান্টাম কোর্স আমার মাঝে বিশ্বাস সঞ্চার করেছে এবং তা কোনো অন্ধ বিশ্বাস নয় বরং যৌক্তিক বিশ্বাস। আমরা জানি মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এখানে শিখলাম সেই নিয়ন্ত্রণের কৌশল। আবার মন দিয়ে যে মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, শরীরের নানা রোগব্যাধি নিরাময় করা যায় তা-ও শিখলাম এ কোর্সে।

কোয়ান্টাম আমাদের মাঝে যে প্রত্যয় আর বিশ্বাস সঞ্চার করে যাচ্ছে তা থেকে আমরা আরো উপকৃত হবো যদি নিয়মিত চর্চা করি। গুরুজীর প্রতিটি আলোচনায় দেশের জন্যে দেশের মানুষের জন্যে ভালবাসা এবং সেই ভালবাসায় আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার একটা চেষ্টা সবসময় ছিলো। মহান মুক্তিযুদ্ধকে তিনি বার বার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যা আমাকে ভীষণ আলোড়িত করেছে। এখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে সম্প্রীতি আর সবার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ–তা সত্যিই অতুলনীয়।

[ড. মো. তাজুল ইসলাম, অধ্যাপক (অর্থনীতি বিভাগ), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৫২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আবার ফিরে পাবো সুস্থ জীবন

মির্জা নাহিদ হোসেন বন্যা



কোর্সে এসে অনুভব করলাম, এতদিন অনেককে অনেক পরামর্শ দিয়েছি অথচ নিজেকে সুস্থ রাখার জন্যে কোনো যত্ন আমি নেই নি। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জেনেও নিজে প্রচুর ওষুধ খেয়েছি আর মানুষকেও খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছি।

আমার এনার্জি লেভেল এত কম ছিলো যে, অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে যেতাম। কিন্তু কোর্সের চারদিন কোনো ক্লান্তবোধ করি নি বরং দারুণ এক উদ্যম অনুভব করছি সারাক্ষণ। আমার বিশ্বাস, মেডিটেশনের নিরাময় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমি আবার সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে পারবো। সেইসাথে চারপাশের সবাইকে বলবো–যত দ্রুত সম্ভব জীবনযাপনের এ বিজ্ঞান সম্পর্কে জানুন।

[মির্জা নাহিদ হোসেন বন্যা, ডেন্টাল ফ্যাকাল্টিতে কর্মরত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৫১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

**শত ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে আমরা ব্যক্তি আমি'র যত্ন নিই না।
কাজ এগিয়ে যায় কিন্তু ব্যক্তি পেছনে পড়ে থাকে।
এ দূরত্ব একসময় জীবনে ছন্দপতনের কারণ হয়।**

কোয়ান্টামম কোয়ান্টায়ন ॥ এক নতুন আমি-তে উত্তরণ

প্রতিনিয়ত ছুটে চলা আর দিনমান ব্যস্ততাই নাগরিক মানুষের জীবনচিত্র। ব্যস্ততার ফাঁক গলে ক্রমশ সে হারিয়ে যেতে থাকে নিজের কাছ থেকেই। অথচ জীবনে সাফল্য, সুস্থতা এবং প্রশান্তির জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন নিজের প্রতি মনোযোগ দেয়া, নিজের গভীরে ডুব দেয়া। আর এই সুযোগ করে দিতেই প্রতি মাসে বান্দরবান লামায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোয়ান্টামম কোয়ান্টায়ন। কোয়ান্টামমের বিশুদ্ধ প্রকৃতিতে মৌনতার মাঝে সে অনুভব করে নিজের সম্ভাবনাকে, আত্মশক্তিতে জাগ্রত হয়ে তার উত্তরণ ঘটে এক নতুন আমি-তে। কোয়ান্টামমে কোয়ান্টায়ন সম্পন্নকারীদের অনুভূতি নিয়ে আমাদের এবারের প্রতিবেদন।



সম্ভাবনাগুলো আবিষ্কার করেছি

সিফাত রহমান



কোয়ান্টায়নে আমরা পুরোটা সময় মৌনতার মাঝে আত্মপর্যালোচনা করেছি। ফলে নিজেদের ভুলগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছি খুব সহজে আর জেনেছি ভুল থেকে উত্তরণের উপায়। আবার নিজের সম্ভাবনা ও গুণগুলোও আবিষ্কার করেছি। আমাদের সারাদিনে বলা কথার একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে অপ্রয়োজনীয় কথা আর অন্যের সমালোচনা। কোয়ান্টায়নে সেসব বিষয়ে নিজেকে শোধরানোর যে দিক-নির্দেশনা পেয়েছি তা পাথেয় করে আমি সামনে এগুতে চাই।

[সিফাত রহমান, শিক্ষার্থী, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ। ৩৫০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সুশৃঙ্খল হতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি

মো. কামরুল হাসান



কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে সাফল্যের যে সূত্রগুলো জেনেছিলাম তা অনুসরণের পথটা সহজ হয়ে গেল কোয়ান্টায়নে এসে। এখানে প্রতিটি কাজ এত সুশৃঙ্খল যা আমাকে ভীষণভাবে উদ্দীপ্ত করেছে সুশৃঙ্খল হতে। কোয়ান্টামমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে মেডিটেশনের অনুভূতি এক কথায় অসাধারণ। নিজেকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া জানতে পেয়েছি কোয়ান্টায়নে এসে।

[মো. কামরুল হাসান, অনার্স, ৩য় বর্ষ, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা কলেজ। ৩৩৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কর্মস্পৃহা বেড়েছে

হাজী মো. আলাউদ্দীন



কোয়ান্টামে আসার পর আমার জীবনদৃষ্টিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আর কোয়ান্টায়ন থেকে ফিরে আমার কর্মস্পৃহা অনেক বেড়েছে। অথচ কাজ করার প্রতি, দায়িত্ব নেয়ার প্রতি আমার তেমন আগ্রহ ছিলো না। কোয়ান্টায়নে গিয়ে আমি শিখেছি জীবনে কাজের গুরুত্ব। কর্মব্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে আমার জীবনে সচ্ছলতাও এসেছে অনেক।

[হাজী মো. আলাউদ্দীন, ব্যবসায়ী। ৩৫২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নিজের ভুলগুলো চিহ্নিত করেছি

ডা. দীপা সাহা



কোয়ান্টায়নে গিয়েছিলাম উচ্চতর ডিগ্রি, নিজের পড়ালেখা, পরীক্ষা এসবের জন্যে প্রার্থনা করার নিয়তে। কিন্তু আত্মনিমগ্ন হতেই মনের চোখে ভেসে উঠলো আমার তিন বছরের ছোট্ট মেয়েটার মুখ। অঝোরে কাঁদতে লাগলাম এ অনুশোচনায় যে, আমার ব্যস্ততার কারণে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছে আমার সন্তান। কোয়ান্টায়নে উপলব্ধি করলাম, আমার সন্তানের শৈশবের এ অপ্রাপ্তি তো কখনো পূরণ হবে না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে কত কত ভুল আমাদের, তা এভাবে আত্মনিমগ্ন না হলে অজানাই রয়ে যেত। মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করানো নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। ঢাকায় ফিরেই শুনি খুব ভালো একটা স্কুলে ২০০০ জনের মধ্যে সে লটারিতে সুযোগ পেয়েছে। কোয়ান্টায়নে এ জন্যেও একাগ্র প্রার্থনা করেছি।

[ডা. দীপা সাহা, শিশুবিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ। ৩৪৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কল্যাণ চেতনায় একাত্ম হতে পেরেছি

নরোত্তম নাথ



কোয়ান্টামের সাথে প্রকৃত অর্থে একাত্ম হতে পারলাম লামা কোয়ান্টায়নে এসে। কোয়ান্টামের এই কল্যাণকর চেতনার প্রতি সবসময়ই ভালো লাগা কাজ করেছে কিন্তু কোথায় যেন আমার মনের মধ্যে একটা ফাঁক ছিলো। কোয়ান্টায়নে আমি এই চেতনাকে হৃদয়ের গভীরে নিতে পেরেছি। আমার বিশ্বাসের সাথে এখন আমার আর কোনো দূরত্ব নেই।

সবচেয়ে বেশি উৎসাহ পেয়েছি মাটির ব্যাংক বিতরণ করার ক্ষেত্রে। সবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে যে এত কল্যাণকর কাজ হচ্ছে এ সম্পর্কে ধারণা পেলাম লামায় এসে। এখন আমি নিঃসংশয়ে মাটির ব্যাংক বিতরণ করবো চারপাশের সবার কাছে।

[নরোত্তম নাথ, শিক্ষার্থী। ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছি

ফারজানা নাজ



কোয়ান্টামের প্রতিটি কার্যক্রমই নতুন নতুন ভালো লাগার সঞ্চার করে। লামা কোয়ান্টায়নে এসে জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছি নতুন করে। এতদিন মনে হতো, যথেষ্ট বয়স হয়েছে, ছেলে বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করেছে, জীবনে আর কী দেখার আছে, চাওয়ার আছে! কিন্তু কোয়ান্টায়নে এসে উপলব্ধি করলাম, এখনো তো নিজেকেই ভালোভাবে চেনা হলো না, জানা হলো না।

কোয়ান্টায়নে অনুভব করেছি, নিজের জন্যে, চারপাশের মানুষের জন্যে এখনো অনেক কিছু করার আছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, ছোটবেলা থেকেই আমার ঠান্ডা লাগার প্রবণতা আছে। কিছুটা শঙ্কিত ছিলাম পাহাড়ি পরিবেশে শীতে কষ্ট পাবো কি না। তিন দিনে কোনো অসুবিধা তো হয়ই নি বরং ফিরে এসে আমি আরো সুস্থ অনুভব করছি।

[ফারজানা নাজ, গৃহিণী। ৩৩৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নিজেকে শোধরানোর পথ দেখায় কোয়ান্টায়ন

মনিরা সিদ্দিকা



কোয়ান্টায়নের মতো এভাবে নিজেকে চেনার, নিজেকে জানার, নিজেকে শোধরানোর সুযোগ আর কোথাও আছে বলে আমার মনে হয় না। কোয়ান্টায়নে গিয়ে অনুভব করেছি, স্রষ্টা আমাদের কত ভালবাসেন! প্রতি মুহূর্তের জীবন কত নেয়ামতে পরিপূর্ণ অথচ আমরা নেতিবাচকতার জন্যে দেখতে পাই না। আর জেনেছি জীবনে সমস্যা যত বড় হোক না কেন মানুষকে স্রষ্টা তা সমাধানের শক্তিও দিয়েছেন। কোয়ান্টামমের কার্যক্রম দেখে খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি। এখন মনে হয় যতদিন বেঁচে আছি আমার দেশের জন্যে কিছু করবো, মানুষের জন্যে কিছু করবো।

[মনিরা সিদ্দিকা, প্রভাষক, লায়ন নজরুল ইসলাম ডিগ্রি কলেজ, টাঙ্গাইল। ২১৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *অনেক সময় ব্যস্ততা ও ক্লান্তির কারণে আধা ঘণ্টা মেডিটেশন করা সম্ভব হয় না। তখন ১০ মিনিট মেডিটেশন করা যাবে কি?*

উত্তর : ব্যস্ততা আর ক্লান্তি দুটি ভিন্ন বিষয়। ব্যস্ততা হলো আপনার সময় নাই, আপনি ১০ মিনিট করে হলেও মেডিটেশন করে নিলেন। যেহেতু সময় বের করতে পারছেন না সেই মুহূর্তে ১০/১৫ মিনিট করতে পারেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ১০/১৫ মিনিট মেডিটেশন করলেই হবে। কিন্তু যখন সময় থাকবে তখন ৩০ মিনিট করেই মেডিটেশন করবেন।

আর ক্লান্তির কারণে যদি হয়–মেডিটেশন তো ক্লান্তি দূর করার জন্যেই। আপনি ৩০ মিনিট মেডিটেশন করুন, আপনার ক্লান্তি বলে কিছু থাকবে না। দুই ঘণ্টার ঘুম হলে আপনি যেরকম প্রাণবন্ত, কর্মোদ্দীপ্ত অনুভব করেন সেরকম এনার্জি পাবেন ৩০ মিনিট মেডিটেশনে।

কিন্তু মেডিটেশনের মাঝে আপনি যদি ঝিমাতে থাকেন তাহলে ক্লান্তি দূর হবে না। আমরা অনেক সময় মেডিটেশন করতে গিয়ে ঝিমাই। ঝিমালে কখনো ক্লান্তি দূর হবে না।

প্রশ্ন : *আমার বাবার কোনো কিছু আমার ভালো লাগে না। আমি কীভাবে এ পাপবোধ থেকে মুক্তি পাবো?*

উত্তর : আসলে আপনি আপনার বাবাকে খুব ভালবাসেন। পারিবারিক সম্পর্কে কখনো কখনো এরকম হয়। যে, ভালোও লাগে আবার সামনে গেলে ঝগড়া আর বিরক্তি। পরিবারের সদস্যরা অনেক সময় একসাথে বেশিক্ষণ থাকলেই ঝগড়া শুরু হয়ে যায়, তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে যায়। আবার দূরে গেলে একজন আরেকজনকে না দেখে থাকতে পারে না।

আপনি আপনার বাবাকে নিয়মিত কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসুন। তাকে কত ভালবাসেন এটা বলুন। বাবাকে বোঝাবেন যে, বাবা তোমাকে যদি আমি এই এই জিনিসগুলো করতে দেখি আমার খুব ভালো লাগবে। এই কাজগুলো তোমার করা উচিত, এই কাজগুলো তোমার করা উচিত না। তাহলেই দেখবেন বাবার প্রতি আপনার মমতা বাড়বে এবং বাবাও অনেক কিছু থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

প্রশ্ন : *আমি মেডিটেশন করার সময় যখনই কারো জন্যে কোনো ভালো কিছু দোয়া করতে চাই দেখা যায় যে, নেগেটিভ কিছু মনে আসে। আমি সাথে সাথে তা বাতিল বলে সংশোধন করার চেষ্টা করি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এই নেগেটিভ ভাব মনে আসে বলে আমার মেডিটেশন করতে ভালো লাগে না।*

উত্তর : আমাদের চারপাশে এরকম অনেক নেগেটিভ পার্সোনালিটির মানুষ আছেন যাদের নেগেটিভ জিনিসই প্রথমে মনে আসে। আর আপনার ক্ষেত্রেও সেটিই হয়েছে। এ নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগার কিছু নেই। আসলে নেগেটিভ চিন্তা আপনার মনে চলে আসে, কিন্তু দোয়ার ওপর এ চিন্তার কোনো প্রভাব পড়ে না। তারপরেও এ প্রভাব থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে চাইলে অটোসাজেশন দেবেন যে, যত নেতিবাচক চিন্তা সবটাই আমার ক্ষেত্রে ইতিবাচকতায় রূপ নেবে। যে চিন্তাই নেতিবাচকরূপে আসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা ইতিবাচক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

প্রশ্ন : *কারো যদি জীবনে ভুলের পরিমাণ বেশি হয় তবে কি সে সর্বদা খারাপ মানুষ হিসেবে গণ্য হবে? জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ নিতে গিয়ে সে ভুলগুলো সামনে আসে। এটা দূর করার উপায় কী? তার কি উচিত এগুলো পরবর্তী জীবনে কারো সাথে শেয়ার করা? এক্ষেত্রে শেয়ার করলে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা অনেক। আর না করলে সত্য গোপনের প্রশ্ন চলে আসে।*

উত্তর : প্রশ্নটি জটিল কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রয়োজনীয় প্রশ্ন। একজন মানুষের জীবনে যদি ভুলের পরিমাণ বেশি হয় তবে সে খারাপ মানুষ হিসেবেই গণ্য হবে। তবে জীবনের যেকোনো পর্যায়ে ভুলের পরিমাণ বেশি থাকতে পারে। কেউ যদি ভুলগুলোকে শুধরে ভালোর পথে চলে আসেন তাহলে তিনি ভালো মানুষ হিসেবে গণ্য হবেন।

বাল্মিকি রত্নাকর দস্যু ছিলেন। কিন্তু আমরা তাকে মুনি হিসেবে চিনি তার কর্মের জন্যে। আপনার কর্ম যদি পরবর্তী জীবনে ভালো হয় আপনার অতীতও এমন করেই মানুষ ভুলে যাবে। আসলে অতীত নিয়ে চিন্তা করাটা অর্থহীন। এটি আহাম্মকের লক্ষণ। তারা অতীত নিয়ে শুধু শুধু অনুশোচনা করে। সবসময় চিন্তা করতে হবে যে, ভবিষ্যতে কী কী ভালো কাজ করা যায়।

আর নিজের অতীত ভুল নিয়ে পরবর্তী জীবনে কারো সাথে শেয়ার করাটা হচ্ছে আরেক আহাম্মকী। নিজের ভুলের সাক্ষী কাউকে বানাবেন না। যেখানে আপনি নিজেই বলছেন যে, এক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে পারে। কিন্তু না বললে সত্য গোপনের প্রশ্ন চলে আসে। এখানে সত্য গোপনের কিছু নেই। ভবিষ্যতের জীবন যার সাথে জড়াবেন তাকে বলবেন, অতীত নয় আমার ভবিষ্যতকে তুমি দেখবে। ভবিষ্যৎ নিয়ে যদি কখনো কোনো প্রশ্ন হয় আমাকে করবে। আমি আমার ভবিষ্যতের জন্যে তোমার কাছে দায়বদ্ধ, অতীতের জন্যে না।' (বোঝা যাচ্ছে বিষয়টি স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, এখানে অতীতের ভুল শেয়ার করার মতো মূর্খতা আর কিছু নেই)

অতএব যে-ই হোক না কেন, কারো সাথে অতীত শেয়ার করাটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অর্থহীন।

প্রশ্ন : *নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করার প্রকৃত সূত্র কী?*

উত্তর : এর সূত্র আসলে খুব সহজ। প্রথমত, যার সাথে যোগাযোগ তৈরি করা দরকার, তার সাথে যেখানেই দেখা হোক তাকে সালাম দিন। কুশল জিজ্ঞেস করুন। শুরুতেই অন্য কোনো কথা বলার দরকার নেই। দুই/তিন দিন সালাম দিন। চেহারা পরিচিত হবে। পরে একদিন নিজ উদ্যোগে পরিচিত হোন। অর্থাৎ আগে সালাম দেয়া গণযোগাযোগ বা নেটওয়ার্কিংয়ের সবচেয়ে সহজ উপায়।

কেন যোগাযোগ করছেন এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনার নিয়ত যদি হয় তার উপকার করা তাহলে আপনি দেখবেন যে, খুব দ্রুত আপনার যোগাযোগ হচ্ছে। অন্যেরা দ্রুত আপনার ওপরে আস্থা আনছে। আর যোগাযোগের উদ্দেশ্য যদি হয় ব্যক্তিগত স্বার্থ তাহলে ফলপ্রসূ যোগাযোগ বলতে যা বোঝায় সেটা আপনার হবে না। অর্থাৎ আপনার নিয়ত সবসময় থাকতে হবে যে, এই যোগাযোগের মাধ্যমে আমি তার কল্যাণ করবো। আপনার নিজের কল্যাণ তখন বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে আসবে।

প্রশ্ন : *নিয়মিত চর্চা ধরে রাখতে পারবো না, এই ভয়ে চর্চা শুরু করা হয় না।*

উত্তর : আপনি আবার চর্চা শুরু করুন। অধিকাংশ মানুষই সারা জীবন নিয়মিত কোনো চর্চা ধরে রাখতে পারে না। কিন্তু যখনই প্রয়োজন হয় তখন থেকে সে শুরু করে। ধরুন, আপনি যখন সাঁতার আয়ত্ত করে ফেলবেন, তারপরে দীর্ঘদিন সাঁতার কাটার অভ্যাস না থাকলেও পানিতে পড়ে গেলে আপনি সাঁতার কাটতে পারবেন। আর সাঁতার যদি আপনার আয়ত্তে না থাকে, বিপদে পড়লেও আপনি সাঁতার কাটতে পারবেন না। এ কারণেই অনুশীলন, মেডিটেশন ইত্যাতি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাঝে মাঝে চর্চা বাদ যেতে পারে, যেমন আল্লাহ নামাজকে ফরয করার পরও আমাদের নামাজ কাজা হয়ে যায়। কিন্তু আবার যখন বিপদ আসে তখন নামাজ পড়া শুরু হয়।

একইভাবে আপনি যদি মনোযোগ একাগ্র করা, আত্মনিমগ্ন হওয়া একবার আয়ত্ত করে ফেলেন, জীবনে যেকোনো সংকটে প্রয়োজনে তা প্রয়োগ করতে পারবেন। মাঝে মধ্যে বাদ যেতে পারে কিন্তু জানা থাকা চাই। অতএব সারাজীবন চর্চা রাখতে পারবেন কি পারবেন না, সেটা জরুরি বিষয় না। আপনি চর্চা শুরু করুন।

প্রশ্ন : *আমার ছেলে ৩৩৮ ব্যাচে কোর্স করেছে। ও ক্রিকেট খেলে, পাশাপাশি 'ও লেভেল' পরীক্ষার্থী। ওর মনছবি ছিলো নামকরা ক্রিকেটার হওয়া, ক্রিকেট খেলেও ভালো। অনূর্ধ্ব-১৯-এর বাছাই পরীক্ষায় চক্রান্ত করে ওকে মেডিকেলের কোনো ফরম দেয়া হয় নি। এখন আর ওর জাতীয় টিমে খেলার সুযোগ নেই। ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছে। মেডিটেশন একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। পড়ার প্রতিও আগ্রহ কমে গেছে। অনেক বুঝিয়েছি, কাজ হচ্ছে না।*

উত্তর : আসলে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যে কারো জীবনে যেকোনো সময় ঘটতে পারে। ব্যর্থতাও যে কারো জীবনে যেকোনো সময় আসতে পারে। এবং এটাই চূড়ান্ত কিছু নয় যদি বিশ্বাস প্রবল থাকে, চেষ্টা প্রবল থাকে, শ্রম প্রবল থাকে। অনূর্ধ্ব-১৯-এ হয় নি তো কী হয়েছে, পরবর্তীতে হবে। কারণ জীবন তো শেষ হয়ে যায় নি।

আসলে জীবনে কোনো ব্যর্থতাই ব্যর্থতা নয় যদি আমি নিজেকে ব্যর্থ না মনে করি। একটা হিট মিস হয়েছে তাতে কী। দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার, চতুর্থ বার হিট করতে হবে। লাগবেই, যদি বিশ্বাসকে প্রবল করা যায়। জীবনে সাফল্যের জন্যে এ বিশ্বাসটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যে, আমি হবোই। একবার হয় নি, আপনি চক্রান্তের শিকার হয়েছেন তাতে কী? দ্বিতীয় বার আপনি সব ব্যাপারে সচেতন থেকে অগ্রসর হবেন। আপনি অবশ্যই পারবেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

আমি জ্ঞানী হবো। ধ্যানী হবো।
প্রজ্ঞা ও অতিচেতনা অর্জন করবো।
প্রতিটি ব্যাপারে জ্ঞান ও মেধাকে
কাজে লাগাবো।

সাফল্যের এক দশক

বিজয় দিবসের প্যারেড ও ডিসপ্লেতে কোয়ান্টারা



চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে বিশেষ পারদর্শিতা পুরস্কার গ্রহণ করছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা

১৬ ডিসেম্বর ২০১২, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে জেলা পর্যায়ে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্যারেড ও ডিসপ্লেতে এ বছর চতুর্থবারের মতো অংশ নেয় কোয়ান্টাম স্কুল এন্ড কলেজ। প্যারেড বড় দল, ছোট দল এবং ডিসপ্লেতে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে কোয়ান্টারা। 'তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবো রে'–গানের সাথে কোয়ান্টারা দৃষ্টিনন্দন ডিসপ্লে প্রদর্শন করে।

এ বছর তারা দ্বিতীয়বারের মতো অর্জন করে বিশেষ পারদর্শিতা পুরস্কার যা এক বিরল সম্মান। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করার জন্যে এবং সুযোগ দেয়ার জন্যে গত বছরের মতো এবারো কর্তৃপক্ষ কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতার বাইরে রেখে তাদের ভূষিত করেছেন 'বিশেষ পারদর্শিতা' পুরস্কারে।

এছাড়াও বান্দরবান জেলা স্টেডিয়ামে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের মোট ৯৬ জন কোয়ান্টা অংশগ্রহণ করে প্যারেড বড় দল, ছোট দল ও ডিসপ্লেতে। 'জ্বলে ওঠো বাংলাদেশ' গানের তালে তালে তারা উপস্থাপন করে চমকপ্রদ ডিসপ্লে। বান্দরবান জেলার ৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্যারেড ও ডিসপ্লে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সবগুলো ইভেন্টে তারা প্রথম স্থান অর্জন করে। উচ্ছ্বসিত দর্শকরা মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে স্বাগত জানান ব্যান্ড দলের পরিবেশনা।



উপজেলা পর্যায়ে লামা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত বিজয় দিবসের প্রোগ্রামে সূচনা শ্রেণীর কোয়ান্টারা



বান্দরবান জেলা স্টেডিয়ামে ৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকারী কোয়ান্টারা

উপজেলা পর্যায়েও কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের সূচনা শ্রেণী ও প্রথম শ্রেণীর কোয়ান্টারা প্যারেড ও ডিসপ্লেতে অংশ নেয়। প্যারেড ছোট দল ও বড় দলে বিভক্ত হয়ে তারা প্যারেড প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি পুরস্কারই অর্জন করে তাদের সুশৃঙ্খল আর দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপনার জন্যে। থানা পর্যায়েও মোট ১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্যারেড দল একই বিভাগের আওতায় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সমান পারদর্শিতায় সূচনা শ্রেণীর কোয়ান্টারা ডিসপ্লে প্রদর্শন করে 'বাংলাদেশের ছয়টি ঋতু' গানটির সাথে।

উল্লেখ্য, এ বছর মহান বিজয় দিবসের প্যারেড ও ডিসপ্লে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল পূর্ণ করলো তাদের সাফল্যের এক দশক। ২০০৩ সাল থেকে লামা থানা ও বান্দরবান জেলা পর্যায়ে এবং ২০০৯ থেকে চট্টগ্রামে বিজয় দিবসের প্যারেড ও ডিসপ্লেতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ।

কোয়ান্টাম মাতৃমঙ্গল কার্যক্রম

দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের আশ্রয়স্থল

নিরাপদ মাতৃত্ব ও সুস্থ শিশুর আগমনকে নিশ্চিত করতে চট্টগ্রামে ২০০৫ সাল থেকে শুরু হয় মাতৃমঙ্গল কার্যক্রম। সন্তান ধারণের তিন মাসের মধ্যে আবেদনের প্রেক্ষিতে পুষ্টিচাহিদা পূরণে অসমর্থ দরিদ্র মায়েদেরকে এ কার্যক্রমের আওতায় সেবা দেয়া হয়। এতে সন্তান প্রসব হওয়ার সময় পর্যন্ত পুষ্টিচাহিদা পূরণ, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, ওষুধ, নিয়মিত ফলোআপ ইত্যাদি সেবা পেয়ে থাকেন গর্ভবতী মায়েরা।

বিভিন্ন বস্তি পরিদর্শন করে সন্তানসম্ভবা মাকে সেবার আওতায় এনে নিয়মিত মনিটরিং করা হয় এ কার্যক্রমে। এছাড়া দায়িত্বশীলদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও নিয়মিত কাউন্সেলিংয়ের কারণে পরিবারের অন্য সদস্যরাও গর্ভবতী মায়ের যত্নে সচেতন হয়ে উঠছেন এখন।

চট্টগ্রামের পাশাপাশি মিরপুর, খুলনা এবং বান্দরবানের রাজবিলাতেও মাতৃমঙ্গল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমে সেবাগ্রহণকারী কয়েকজন মায়ের অনুভূতির কথা তুলে ধরা হলো এ প্রতিবেদনে।

দুস্থ মা-কে দেখলেই বলি



২০০৮ সালে আমার বিয়ে হয়। কয়েক মাস পর গর্ভে সন্তান এলো। অভাবের সংসারে এ অবস্থায় আমার কী হবে–এসব নিয়ে যখন দুশ্চিন্তায় ছিলাম তখনই সন্ধান পেলাম মাতৃমঙ্গলের। গর্ভকালীন পুরো সময়ে পেয়েছি ওষুধ ও পুষ্টিসেবা। সন্তান প্রসবের সময় কোয়ান্টাম মাতৃমঙ্গলের সহযোগিতায় চট্টগ্রামের ইউএসটিসি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অপারেশনের মাধ্যমে একটি সুস্থ পুত্রসন্তানের জন্ম হয় যা আমার পক্ষে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য ছিলো। পরিচিতদের মধ্যে সন্তানসম্ভবা কোনো দুস্থ মা-কে দেখলেই তাকে বলি মাতৃমঙ্গলে যাওয়ার কথা।

শামীমা, ঝাউতলা বাজার স্কুল ক্যাম্প, চট্টগ্রাম

১৫ বছর পর মা হলাম



আমার বিয়ে হয়েছে প্রায় ২৩ বছর। ১৮ বছর আগে আমি প্রথমবারের মতো গর্ভধারণ করেছিলাম। রিকশাচালক স্বামীর দরিদ্র সংসারে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পুষ্টির অভাবে তখন বাচ্চাটা নষ্ট (মিসক্যারেজ) হয়ে যায়। এর মধ্যে আর গর্ভধারণ করতে পারি নি। প্রায় ১৫ বছর পর দ্বিতীয়বারের মতো যখন আমি মা হতে যাচ্ছি তখন মাতৃমঙ্গলের কথা জানতে পারি। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ, ডিম, নিয়মিত ডাক্তারি পরীক্ষা এসব সেবা আমি পেতে থাকি। আল্লাহর রহমতে যথাসময়ে হাসপাতালে আমার একটি সুস্থ কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। তিন বছর পর আবারো গর্ভধারণ করি এবং দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের মা হই। সিজারসহ সমস্ত খরচ মাতৃমঙ্গল থেকেই দেয়া হয়।

মনসুরা বেগম, তারা কলোনী, চট্টগ্রাম

বাচ্চার চিকিৎসার সব ব্যয় বহন করলো কোয়ান্টাম



তিন বছর আগে দ্বিতীয় সন্তানের মা হতে গিয়ে এক বান্ধবীর মাধ্যমে আমি সন্ধান পাই মাতৃমঙ্গলের। সে নিজেও এ সেবা নিয়েছিলো। আমি নিয়মিত এখান থেকে চিকিৎসা, ওষুধ, ডিম পেতে থাকলাম। এভাবে চিকিৎসা নেয়ার নয় মাস পরে মাতৃমঙ্গল থেকেই আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং নিরাপদেই একটি সুস্থ সন্তান জন্ম দেই। হাসপাতালের সব খরচও মাতৃমঙ্গল থেকেই দেয়া হয়। শুধু তা-ই নয়, জন্মের নয় দিন পরে বাচ্চার শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। সেসময় চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থাও মাতৃমঙ্গল থেকে করা হয়। আমার দিনমজুর স্বামীর পক্ষে হয়তো তা সম্ভব হতো না।

বেবী, ঝাউতলা বিহারী কলোনী, চট্টগ্রাম

লাইফ লং ব্লাড ডোনার 'সিলভার' ও 'গোল্ডেন' ক্লাব সদস্যদের সম্মাননা প্রদান

স্বেচ্ছা রক্তদান এক অতুলনীয় আত্মত্যাগ



মুমূর্ষু মানুষের রক্তের প্রয়োজন আমরা মেটাতে পারি খুব সহজে। সবার জানা থাকা প্রয়োজন যে, রক্ত দিলে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না বরং খুব দ্রুততার সাথে সে ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। প্রকৃতি আমাদের এভাবেই সমৃদ্ধ করেছে যেন আমরা একে অপরের কল্যাণে হাত বাড়াতে পারি। আর্তের জীবন বাঁচাতে নিজের শরীরের রক্ত দেয়া এক অতুলনীয় আত্মত্যাগ।

কোয়ান্টাম এই রক্ত সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের যে ব্রত নিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এখানে এসে লক্ষ করলাম বেশিরভাগ রক্তদাতাই তরুণ। তরুণ প্রজন্মের মাঝে এরকম ভালো কাজের প্রতি আগ্রহ আমাকে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত করেছে।

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের উদ্যোগে গত ১৪ ডিসেম্বর লাইফ লং ব্লাড ডোনার 'সিলভার ক্লাব' ও 'গোল্ডেন ক্লাব'-এর সদস্যদের নবম ও সপ্তমবারের মতো সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ বাংলাপিডিয়ার প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম।

জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় এ সম্মাননা। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. আব্দুল্লাহ আল সাফী মজুমদার। তিনি বলেন, সারা বিশ্বের পরিসংখ্যান হলো প্রতি ২ সেকেন্ডে এক ব্যাগ করে রক্তের প্রয়োজন হয়। আর এ প্রয়োজন পূরণ করতে হয় তাৎক্ষণিকভাবে এবং সে রক্ত নিরাপদ কি না তা নিশ্চিত করা একান্ত জরুরি। আর এই নিরাপদ রক্ত নিশ্চিত করতে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের উদ্যোগ প্রশংসার দাবিদার।

স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-এর হেমাটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ও কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের অনারারি পরিচালক প্রফেসর ডা. এ বি এম ইউনুস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারী।

ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট মিডিয়াকর্মী, দায়িত্বশীল ও কোয়ান্টিয়াররা এতে উপস্থিত ছিলেন। এবার লাইফ লং ব্লাড ডোনার 'সিলভার ক্লাব' ও 'গোল্ডেন ক্লাব' সদস্যদের সম্মাননা অনুষ্ঠানে ২৫ বার রক্ত দিয়েছেন এমন ৩৩ জন পুরুষ এবং এক জন মহিলা ডোনারের প্রত্যেককে দেয়া হয় নিজ নিজ ছবি সম্বলিত সুদৃশ্য গোল্ডেন ক্রেস্ট। ১০ বা এর অধিক বার রক্ত দিয়েছেন এমন ১৮৮ জন সিলভার ক্লাব সদস্যকে দেয়া হয় সার্টিফিকেট, বিশেষ আইডি কার্ড ও মেডেল।

বিজয় দিবস স্মরণে মাসব্যাপী স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম



যাদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তাদের স্মরণে রক্ত দিন–এই বাণী নিয়ে স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ঢাকা ও ঢাকার বাইরে মাসব্যাপী বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ১০ ডিসেম্বর স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম পরিচালিত হয় ঢাকার অদূরে গাজীপুরে অবস্থিত ডুয়েটে। এর উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির ছাত্রকল্যাণ পরিষদ-এর পরিচালক ড. গণেশ চন্দ্র সাহা। ডুয়েটের ভিসি ড. মো. আলাউদ্দীন এ রক্তদান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং বিজয়ের মাসে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রক্ত দেয়ার জন্যে ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করেন। এ ক্যাম্প থেকে সংগৃহীত হয় ১০৭ ব্যাগ রক্ত।

১৪ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে মিরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ ও রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্প থেকে সংগৃহীত হয় ৯৩ ব্যাগ রক্ত।

১৬ ডিসেম্বর সাত শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ-এর নামে সাতটি পৃথক স্থানে ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। রহমতগঞ্জ টাইগার স্পোর্টিং ক্লাব, বংশাল, ক্রিসেন্ট রোড, পশ্চিম চৌধুরী পাড়া কল্যাণ সমিতি, জাতীয় জাদুঘরের সামনে, মিরপুরের মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় এবং মোহাম্মদপুরের জাপান গার্ডেন সিটি আয়োজিত এ ক্যাম্পগুলো থেকে সংগৃহীত হয় মোট ৩৬২ ব্যাগ রক্ত। ২৮ ডিসেম্বর মিরপুরের লালকুঠি বাজারে ব্লাড ক্যাম্পের মধ্যদিয়ে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাসব্যাপী এ কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়। সব মিলিয়ে ডিসেম্বরে সংগৃহীত হয় এক হাজার আট শতাধিক ব্যাগ রক্ত।

জানুয়ারি ২০১৩-এর ওরিয়েন্টেশন

কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী ওরিয়েন্টেশন
বনানী : ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি

কোয়ান্টাম ব্যায়াম ওরিয়েন্টেশন
কেন্দ্র : ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি (মহিলা)
ধানমণ্ডি : ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি (পুরুষ)

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় ওরিয়েন্টেশন
রাজশাহী : ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি

বেসিক কম্পিউটিং ওরিয়েন্টেশন
বনশ্রী : ৪, ৫, ৬ ও ৭ জানুয়ারি

কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি ওরিয়েন্টেশন
মিরপুর : ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি (কসমো স্কুল ভবন)
কেন্দ্র : ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি

জীবনে সফল হওয়ার পথ প্রথমায়ন ওরিয়েন্টেশন
বগুড়া : ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি

রক্তদাতারা মুমূর্ষু রোগীর আশ্রয়স্থল



২৮ নভেম্বর কোয়ান্টাম মেডিটেশন হল কাকরাইলে অনুষ্ঠিত হয় ৯৪ তম শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. মাহফুজুল হক।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, আমরা যদি মানবধর্মের কথা বলি, তাহলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হলো জীবে দয়া করা। আর সেই ধর্মাচার পালন করছেন স্বেচ্ছা রক্তদাতারা। একজন মানুষ যত ধরনের দান করতে সক্ষম তার মধ্যে রক্তদান অন্যতম। জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম সময়ে রক্তের প্রয়োজন হয় আর আপনারা সেসময় নিজের রক্ত দিয়ে পরিণত হচ্ছেন আশ্রয়স্থলে। এর চেয়ে বড় মানবসেবা আর কিছু হতে পারে না।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : জানুয়ারি ২০১৩ ॥ সম্পাদক : কাজী মাহ্তাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য– ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 8319377, 8391391 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন



জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম স্মরণে

জাতি হারালো এক ক্ষণজন্মা চিকিৎসাবিজ্ঞানী

কোয়ান্টাম হারালো একজন অভিভাবক

বরেণ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। এক বর্ণাঢ্য ও কর্মময় জীবন শেষে তিনি যাত্রা করেছেন অনন্ত মহাজাগতিক সফরের পথে। গত ২৪ জানুয়ারি রাতে ঢাকার একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। জাতি হারালো এক ক্ষণজন্মা কীর্তিমান পুরুষ, আর কোয়ান্টাম হারালো একজন আজন্ম অভিভাবক।

কোয়ান্টামের জন্মলগ্ন থেকেই ডা. নুরুল ইসলাম ছিলেন এর একজন সত্যিকার অভিভাবক। শুরু থেকেই তিনি কোয়ান্টামকে দিয়েছেন তার আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা আর অকুণ্ঠ সমর্থন। ১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি, কোয়ান্টামের যাত্রাশুরুর দিনটিতে, তিনিই প্রথম দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন–'কোয়ান্টাম মেথড আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূরক। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে এটি যুক্ত হলে রোগ নিরাময় আরো সহজ হবে, ত্বরান্বিত হবে।'

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম আমাদের জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান। দেবতুল্য চিকিৎসক, নির্ভীক সত্যবাদিতা, বহুল প্রশংসিত জাতীয় ওষুধ নীতির প্রণেতা, ধূমপানবিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ, বাংলাদেশে চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুরোধা ব্যক্তিত্ব, দেশের প্রথম বেসরকারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা– এমন অসংখ্য পরিচয় তাকে আসীন করেছিলো এক অনন্য ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় আসনে। অশীতিপর এই কর্মীপুরুষ মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন মানবসেবার কাজে একনিষ্ঠ ও অতন্দ্র, ছিলেন জনকল্যাণমূলক একাধিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত।

জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সত্যভাষণে অকপট, সততা ও সত্যের পথে অবিচল ডা. নুরুল ইসলাম কোয়ান্টামের প্রতি সবসময়ই ছিলেন আন্তরিক, মমতাপূর্ণ ও স্নেহার্দ্র। কোয়ান্টামের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো সত্যিকার অর্থেই এক স্নেহময় পিতার। যখন সামনে ছিলো না কোনো বাস্তব উদাহরণ–সেদিনও তিনি তার দূরপ্রসারী প্রজ্ঞার আলোকে উন্মুক্ত মঞ্চে কোয়ান্টাম মেথডের উপযোগিতাকে ব্যাখ্যা করেছেন, দিয়েছেন দৃঢ়চিত্ত সমর্থন। সবমিলিয়ে কোয়ান্টামের বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে তিনি এসেছিলেন, ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেবামূলক কাজের প্রতি জানিয়েছিলেন তার দোয়া ও শুভকামনা।

শুধু তা-ই নয়, কোয়ান্টামের প্রতি ভালবাসার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। অশীতিপর বয়সে পাহাড়ি রাস্তার চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তিনি গিয়েছিলেন বান্দরবান লামার কোয়ান্টামম-এ। চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন কোয়ান্টাম আয়োজিত মেডিকেল ক্যাম্পে।

২০১১ সালের ৫ মার্চের সে দিনটিতে তিনি উদ্বোধন করেছিলেন তার নামে নামকরণকৃত কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীদের আবাসন 'নুর হল'-এর। উল্লেখ্য, ডা. নুরুল ইসলামের সামগ্রিক অবদানের প্রতি সম্মান জানিয়ে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ২০০১ সালে 'নুর হল' প্রতিষ্ঠা করে।

এ বছরের ২৫ জানুয়ারি সারাদেশ থেকে লামার কোয়ান্টামম-এ জড়ো হয়েছিলেন কোয়ান্টাম পরিবারের প্রায় দেড়শত চিকিৎসক। তাদের অংশগ্রহণে সেদিন কোয়ান্টাম মা ও শিশু হাসপাতাল (প্রস্তাবিত) প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় একটি সুপরিসর মেডিকেল ক্যাম্প। আর এতে চিকিৎসাসেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ পান ২,৯০৫ জন দুস্থ রোগী। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এ মেডিকেল ক্যাম্পটি ডা. নুরুল ইসলামের স্মরণে উৎসর্গ করে। এর আগে চিকিৎসকবৃন্দকে নিয়ে গুরুজী ও কোয়ান্টামমের কর্মীরা তার গায়েবানা জানাজায় অংশ নেন।

আমরা জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের বিদেহী আত্মার অনন্ত প্রশান্তি কামনা করি। জাতীয় জীবনে তার অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন পরবর্তী ৪০ দিনের সকল সৎকর্ম তার প্রতি উৎসর্গ করছে।



১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে শিথিলায়ন ক্যাসেটের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন প্রধান অতিথি জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। মঞ্চে উপবিষ্ট প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এবং দৈনিক ইত্তেফাকের তৎকালীন সম্পাদক ও বিশিষ্ট কথাশিল্পী রাহাত খান



জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম ॥

কর্মময় জীবনের প্রতিচ্ছবি

সাধারণ পরিবারে জন্ম নিয়ে অসাধারণ

১৯২৮ সালের ১ এপ্রিল। চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থানার মোহাম্মদপুর গ্রামে এক অতি সাধারণ পরিবারে তার জন্ম। বাড়ি বলতে ছিলো একটা মাটির ঘর। বাবা সৈয়দুর রহমান ছিলেন স্কুল-শিক্ষক। চার বছর বয়সে নুরুল ইসলাম বাবাকে হারান। বাবাকে নিয়ে তার স্মৃতি ছিলো কেবল একটাই–শেষবারের মতো তিনি বাবার মুখে পানি তুলে দিচ্ছেন। তিন ভাই পাঁচ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট।

গ্রামেই কেটেছে নুরুল ইসলামের শৈশব-কৈশোর। বাবার মৃত্যুর পর মা গুলমেহের-এর একান্ত সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠেন তিনি। তার সামগ্রিক জীবনে ও সাফল্যের ধারায় এই মহিয়সী মহিলার প্রভাব অপরিসীম। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে মায়ের দোয়া ও শুভকামনা তিনি অনুভব করেছেন বার বার।

কৃতি শিক্ষার্থী ॥ সফল শিক্ষাজীবন

বাড়ি থেকে আধমাইল দূরের একটি প্রাইমারি স্কুলে শুরু হয় নুরুল ইসলামের শিক্ষাজীবন। পরে গাছবাড়িয়া নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র ইংলিশ হাই স্কুল থেকে ১৯৪৩ সালে তিনি মেট্রিক পরীক্ষা দেন। তারপর পিতৃতুল্য বড় ভাইয়ের সহযোগিতায় ভর্তি হন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে। সেখান থেকে আইএসসি-তে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

ছোটবেলা থেকেই তার ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে ছিলো বলে ভর্তি হন কলকাতা মেডিকেল কলেজে। মেডিকেলের বই কেনা আর কলেজের হোস্টেলে থাকার আর্থিক সঙ্গতি তার ছিলো না, পরে স্যার আদমজীর সাথে দেখা করে মাসিক পঁয়ষট্টি টাকা হারে বৃত্তি লাভ করেন। এতে তার মেডিকেলে পড়াশোনার পথ সুগম হয়। ইন্টার্নশিপসহ ১৯৫১ সালে তিনি গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন।

বিরল সৌভাগ্যবান চিকিৎসক

যখন ডাক্তারি পাশ করলেন ততদিনে দেশভাগ হয়ে গেছে, তাই ঢাকায় ফিরে এলেন। পরদিনই গ্রাম থেকে ভাইয়ের জরুরি টেলিগ্রাম–মা অসুস্থ, বাঁচার আশা নেই। রাতের ট্রেনেই চট্টগ্রাম রওনা দিলেন ডা. নুরুল ইসলাম। সকালে বাড়ি পৌঁছে দেখেন, মা অজ্ঞান। আর চারপাশে বসে সবাই দোয়া-দরুদ পড়ছে। রোগের ইতিহাস শুনে বুঝলেন–টাইফয়েড। এর একমাত্র ওষুধ তখন ছিলো ক্লোরোমাইসেটিন। কিন্তু মুখ দিয়ে খাওয়াবেন কী করে, মা যে অজ্ঞান!

অগত্যা এক বুদ্ধি বের করলেন। চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল থেকে রাইল্‌স টিউব ধার করে আনালেন। তারপর ক্যাপসুল ভেঙে দুধের সাথে মিশিয়ে টিউবের মাধ্যমে সেটি রোগীর পেটে প্রবেশ করালেন। সবার আশঙ্কা আর চরম আপত্তির মুখেও, মা-কে সুস্থ করে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ডা. ইসলাম সেদিন দারুণ সাহসিকতায় এ চিকিৎসা দিয়েছিলেন।

একপর্যায়ে মা সুস্থ হয়ে উঠলেন। পেশাগত জীবনের শুরুতেই মৃত্যুপথযাত্রী মা-কে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলা সত্যিই সদ্য পাশ করা একজন চিকিৎসকের জীবনে এক বিরল সৌভাগ্য।

বর্ণাঢ্য পেশাজীবন ॥ সেবাই যার মূল শক্তি

১৯৫২ সালে পিএসসি-তে ইন্টারভিউ দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে বক্ষব্যাধি বিভাগে নিয়োগ পান। ১৯৫৪ সালে সরকারি খরচে ইংল্যান্ডে যান এবং লন্ডনের হুইটিংটন হাসপাতালে এমআরসিপি কোর্স শুরু করেন। ১৯৫৫ সালে ওয়েল্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ে টিডিডি কোর্সে যোগ দেন এবং এতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

সে সময়ে প্রথমবার পরীক্ষা দিয়েই এমআরসিপি পাশ করতো মাত্র ১০/১৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। ডা. নুরুল ইসলাম তাদেরই একজন। আর এ আনন্দ তিনি উদযাপন করেছিলেন তৎক্ষণাৎ দেশে পঞ্চাশ পাউন্ড পাঠিয়ে দিয়ে–তার শৈশবের স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগের যন্ত্রপাতি কেনার জন্যে।

> জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলামের ডায়েরি থেকে–
> "বিশ্বাস আর আশা যার নাই, যেও না তাহার কাছে
> নড়াচড়া করে, তবুও সে মড়া, জ্যান্ত সে মরিয়াছে।
> শয়তান তারে শেষ করিয়াছে, ঈমান লয়েছে কেড়ে,
> পরাণ গিয়াছে মৃত্যুপুরীতে ভয়ে তার দেহ ছেড়ে।"
> –কাজী নজরুল ইসলাম

১৯৫৬ সালে ডা. নুরুল ইসলাম দেশে ফিরে আসেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তিনিই ছিলেন একমাত্র এমআরসিপি টিডিডি। স্বাভাবিকভাবেই তিনি এসোসিয়েট প্রফেসর এমনকি সরাসরি প্রফেসর হিসেবে মেডিকেল কলেজে যোগ দিতে পারতেন; কিন্তু তার ইচ্ছা ছিলো, ধাপে ধাপে সামনের দিকে এগোবেন। তাই সার্জন জেনারেলের সাথে দেখা করে স্বেচ্ছায় তিনি মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলে মেডিসিনের লেকচারার হিসেবে কাজ শুরু করেন।

পরবর্তীতে তিনি ১৯৫৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে মেডিসিন বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর ও ১৯৬২ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তিনিই প্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'নাফিল্ড স্কলারশিপ' পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন ১৯৬৩ সালে। ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দুবছর ইংল্যান্ডে অধ্যাপনা করেন।

পুনরায় দেশে ফিরে ১৯৬৫ সালে প্রফেসর ডা. নুরুল ইসলাম ঢাকার সদ্যপ্রতিষ্ঠিত (১৯৬৪) পোস্ট গ্রাজুয়েট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের যুগ্ম পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৮৭ সালে পরিচালক হিসেবে এ প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর নেয়ার আগে প্রফেসর নুরুল ইসলাম সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে নিজের মেধা, মনন ও শ্রম দিয়ে একে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রশংসিত একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ দেন। দুটি টিনশেড ঘরের গণ্ডি থেকে একটি বহুমাত্রিক ও সুবিশাল প্রতিষ্ঠানে (আইপিজিএমআর, বর্তমানে বিএসএমএমইউ) রূপ দেয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ লন্ডনের রয়েল সোসাইটি অব মেডিসিন থেকে প্রকাশিত সাময়িকীতে ডা. ইসলামকে এর ফাউন্ডিং ফাদার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

একাধিক অনন্য প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নদ্রষ্টা

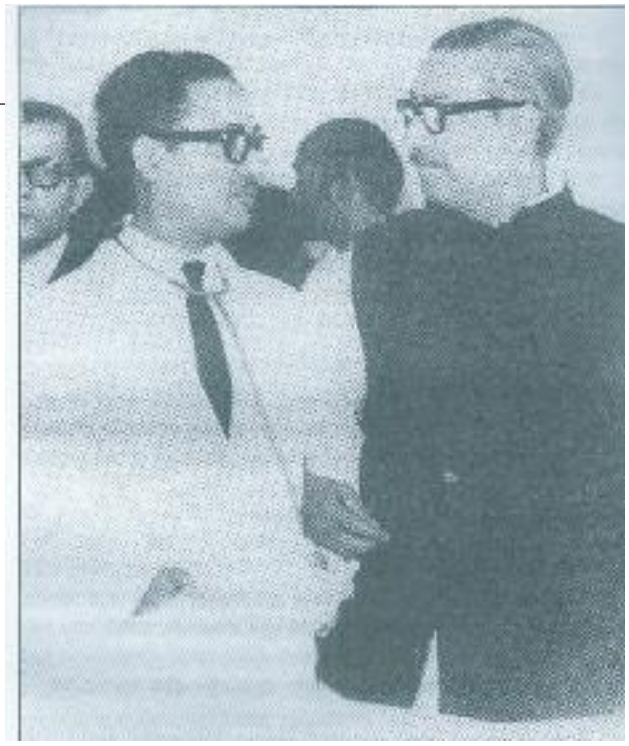
কর্মজীবনের শুরু থেকেই ডা. ইসলাম গড়ে তুলেছেন জাতীয় জীবনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী প্রতিষ্ঠান। যক্ষ্মা রোগীদের দুর্ভোগ প্রত্যক্ষ করে ১৯৫৭ সালে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে তিনি একটি সমিতি গঠনে উদ্যোগী হন। এর ফলশ্রুতিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমানকে সভাপতি ও তাকে সাধারণ সম্পাদক করে যে সমিতি গঠিত হয় তা পরবর্তীতে দেশে যক্ষ্মার প্রকোপ কমানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

জাতীয় ওষুধ নীতি তৈরির লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে তৎকালীন সরকার প্রফেসর নুরুল ইসলামকে চেয়ারম্যান করে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে, তার সুপারিশক্রমে সমস্ত অপ্রয়োজনীয় ওষুধ ও মাদক-মিশ্রিত টনিক বাদ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। স্বার্থান্বেষীদের নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ১৯৮২ সালে এ ওষুধ নীতি গৃহীত হয়, দেশে-বিদেশে যা ব্যাপক প্রশংসিত ও আলোচিত হয়েছিলো।

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝিতে পাশ্চাত্যে তামাক বিরোধী প্রচারণার সূচনা ঘটে। এর প্রভাবে ডা. ইসলাম শুধু নিজে ধূমপান বর্জন করেই ক্ষান্ত হন নি, সমাজের সব শ্রেণী-পেশার মানুষকে সাথে নিয়ে গড়ে তুলেছেন 'আধূনিক' (আমরা ধূমপান নিবারণ করি), যা দেশে প্রথবারের মতো ধূমপানবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত করে।

ইউএসটিসি (চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের জীবনের অন্যতম কীর্তি। ১৯৮৯ সালে মাত্র ৪২ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে এটি বেসরকারি পর্যায়ে দেশের প্রথমসারির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ছাড়াও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, মেডিকেল কাউন্সিল অব গ্রেট ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড মেডিকেল কাউন্সিল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এটি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।

এক জীবনের কীর্তি যত



জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে, পিজির বারান্দায়



খ্যাতিমান চিকিৎসাবিজ্ঞানী এডিনবার্গ রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস-এর প্রেসিডেন্ট স্যার জেমস ক্যামেরন ও আইপিজিএমআর-এর প্রথম ব্যাচের চারজন সফল ছাত্রের সঙ্গে ডা. নুরুল ইসলাম (ডান দিক থেকে প্রথম, বসা)



মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সাথে তাদের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. নুরুল ইসলাম

কর্মীপুরুষ জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম তার অক্লান্ত কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা এবং সেইসাথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসংখ্য সম্মাননা ও পুরস্কার।

এর মধ্যে ১৯৬৩ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রেসিডেন্ট'স গোল্ড মেডেল, ১৯৭০-এ ভূষিত হন সিতারা-ই-ইমতিয়াজ পদক, ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্স-এর স্বর্ণপদক, ১৯৮৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্বর্ণপদক, ১৯৮৭ সালে জাতীয় অধ্যাপকের সম্মান, ১৯৯০ সালে আমেরিকান বায়োগ্রাফিকেল হেল্‌থ কর্তৃক কমেমোরেটিভ মেডেল অব অনার, একই বছরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র অ্যাওয়ার্ড ফর টোবাকো কন্ট্রোল, ১৯৯৩ সালে ভাসানী স্মৃতি স্বর্ণপদক, ১৯৯৬ সালে স্বাধীনতা পদক, এডিনবার্গ রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস-এর গোল্ড মেডেল এবং ২০০৩ সালে চিকিৎসারত্ন হিসেবে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ডা. বিধান চন্দ্র রায় স্বর্ণপদক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।



জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নিরন্তর অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস মা গুলমেহের-এর সাথে সস্ত্রীক ডা. নুরুল ইসলাম



পিজিতে চিকিৎসাধীন মাওলানা ভাসানীর সাথে



পিজিতে চিকিৎসাধীন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বাঁ থেকে সাংবাদিক আবদুল গণি হাজারী, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, ডা. নুরুল ইসলাম ও পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন

একজন চিকিৎসক হিসেবে পেশাগত ব্যস্ততার পাশাপাশি চিকিৎসা শিক্ষা ও ওষুধ নীতি নিয়ে গবেষণাও করেছেন জীবনভর। আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রফেসর ডা. ইসলামের শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৩০টি।

তার প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে 'মেডিকেল ডায়াগনোসিস এন্ড ট্রিটমেন্ট', 'হিসট্রি অব আইপিজিএমআর', বহুল প্রশংসিত বই 'প্রেসক্রিপশন', আত্মজীবনী 'জীবনস্রোতে', কিছু ভাবনা, বঙ্গবন্ধু : ব্যক্তিগত চিকিৎসকের দৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য।



শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে চিকিৎসা দিচ্ছেন প্রফেসর ডা. নুরুল ইসলাম

৩৩১ তম ব্যাচের প্রত্যয়নে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

কোয়ান্টাম মেথডের কার্যকারিতা এখন প্রমাণিত সত্য



কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের প্রত্যয়নে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

আজ থেকে ১৯ বছর আগে কোয়ান্টামের যাত্রা শুরুর দিনটিতে আমি যে কথাটি বলেছিলাম, আজো সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলতে চাই– কোয়ান্টাম মেথড আধুনিক চিকিৎসার পরিপূরক। আমরা একে যত সহজে গ্রহণ করতে পারবো, এর সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারবো আমাদের জীবন তত প্রশান্তিময় হবে এবং রোগমুক্তি হবে সহজ। আমি মনে করি, এটাই আমাদের সবার প্রত্যাশা হওয়া উচিত।

১০, ১১, ১২ ও ১৩ জুন ২০১১–কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৩৩১ তম ব্যাচের প্রত্যয়নে কথাগুলো বলেন দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে 'টেনশন মুক্তির জন্যে শিথিলায়ন' শীর্ষক সেমিনার ও শিথিলায়ন ক্যাসেটের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে ডা. নুরুল ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কোয়ান্টাম মেথডকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূরক হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তিনি সেদিন বলেছিলেন, আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি কোয়ান্টাম মেথড চর্চার মাধ্যমে রোগমুক্তি ও প্রশান্তি অর্জন সহজ হবে।

এর দেড় যুগ পর কোর্সে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম মেথডকে সার্বিকভাবে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ডা. নুরুল ইসলাম বলেন, পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করা যেমন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার সমান অপরাধ, তেমনি একজন মানুষের জীবন রক্ষা করাও সমগ্র মানবজাতির জীবন রক্ষার মতো মহান কাজ। এখানে এসে আমি দেখলাম, বহু মানুষ এ কোর্সের মাধ্যমে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। সুস্থতা ও প্রশান্তির পথে যাত্রা শুরু করেছেন।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ–রোগমুক্তি ও নিরাময়ের এ অনুভূতিগুলো সংকলিত করে আপনারা বই আকারে প্রকাশ করুন। প্রয়োজনে আমাদেরকে দিন, আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করবো। কারণ, চারপাশের মানুষকে এ সংবাদ জানানো অত্যন্ত জরুরি। এর মাধ্যমে আরো মানুষ উপকৃত হবে এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যেও এটি



গভীর ধ্যানে নিমগ্ন..

হবে একটি গৌরবের বিষয়।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আমি দেখেছি, মহাজাতকের কথায় প্রত্যেকটি মানুষ প্রাণ খুলে হাসেন। তার চমৎকার উপস্থাপনাশৈলী আমাকে মুগ্ধ করেছে। এমনিতে তিনি কম কথা বললেও আমি লক্ষ্য করেছি, মঞ্চে দাঁড়িয়ে এক অদৃশ্য প্রাণশক্তিতে তিনি সবাইকে হাসান, আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যান।

আমি বিশ্বাস করি, কোয়ান্টামের এ শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। কারণ এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সুখী জীবনের পথ দেখানো। তাই কোয়ান্টামের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ক্রমাগত এর ব্যাপকতা বাড়তে থাকবে, অসংখ্য মানুষ উপকৃত হবে। একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি বলতে পারি, কোয়ান্টামের কার্যকারিতা এখন একটি প্রমাণিত সত্য যা সমস্ত বিতর্কের উর্ধ্বে।



প্রথিতযশা চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম জ্ঞানপিপাসুর তৃষ্ণা নিয়ে গভীর মনোযোগে শুনছেন কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা

প্রথম সহস্র আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে ডা. নুরুল ইসলাম

রক্তদান পারলৌকিক মুক্তির পথ সুগম করবে

৬ জুলাই ২০০৩, ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সহস্র আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে ঢাকাসহ সারা দেশের স্বেচ্ছা রক্তদাতারা ছাড়াও ছিলেন চিকিৎসাসেবার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিগণ এবং রক্তদান সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীবৃন্দ। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম।

রক্তদাতাদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথি বলেন, মুমূর্ষু মানুষকে বাঁচাতে কোনো প্রতিদানের আশা না করেই স্বেচ্ছা রক্ত দিচ্ছেন, বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চালনকে নিশ্চিত করতে আন্তরিকভাবে কাজ করছেন রক্তদাতারা। এ কাজের উত্তম প্রতিদান নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের দেবেন। আমি বিশ্বাস করি, স্বেচ্ছা রক্তদান তাদের পারলৌকিক মুক্তির পথ সুগম করবে। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম নিরাপদ রক্ত নিশ্চিত করতে স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের সংগঠিত করাসহ রক্তের বিভিন্ন সংক্রামক রোগ-ব্যাধির পরীক্ষা কম খরচে করিয়ে মানবতার সেবায় নিজেদের নিবেদিত করেছে। এজন্যে তারা নিজেদের অর্থে মূল্যবান যন্ত্রপাতি কিনেছে, যা দিয়ে রক্তের উপাদান পৃথক করে বহুমুখী সেবা দেয়া সম্ভব হবে। দেশ ও মানুষের কল্যাণে অত্যন্ত উপকারী এ পদক্ষেপের জন্যে আমি তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং প্রার্থনা করি পরম করুণাময় উত্তরোত্তর এ কাজের প্রবৃদ্ধি দিন।



সহস্র আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট (বাম থেকে) কোয়ান্টাম ল্যাবের অনারারি পরিচালক প্রফেসর ডা. এ.বি.এম ইউনুস, বিশেষ অতিথি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, প্রধান অতিথি সদ্যপ্রয়াত ডা. নুরুল ইসলাম, সভাপতি গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক, বিশেষ অতিথি প্রফেসর ডা. মুজিবুর রহমান, স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মা-জী নাহার আল বোখারী, পরিচালক মোটিভেশন কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমদ-এর সঙ্গে ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম ও কোয়ান্টাম ল্যাব সেবার ১৩ তম বছর



স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম কোয়ান্টাম ল্যাবের ১৩ তম বছর ২০১২ সার্বিকভাবে সেবাদানের ক্ষেত্রে ছিলো সফল একটি বছর। এ বছর রক্ত সংগ্রহ, সরবরাহ ও ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনে বিগত বছরের তুলনায় পেয়েছে দারুণ গতি।

২০১২-তে অনুষ্ঠিত হয়েছে সর্বাধিক ৩০৯টি ক্যাম্প, যা ১৮.৮৫% বেশি। রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ বেড়েছে ১৩.৭৩%। ল্যাব ও ক্যাম্প মিলিয়ে রক্ত সংগৃহীত হয়েছে মোট ৪,৮৮৮ ইউনিট, প্রবৃদ্ধি বেড়েছে ১০.৬৩%। ডোনারদের উপহার ও সামর্থ্যহীন রোগীদের সেবায় অনুদান হিসেবে রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ বেড়েছে ৪৯.০৯%। ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে নতুন সংযোজন হয়েছে মোবাইল ব্লাড ক্যাম্প এবং ঢাকার মিরপুরে রূপনগর অফিসে মিনি ব্লাড কালেকশন বুথ।

একনজরে ১৩ বছর

- মোট সরবরাহ চার লক্ষ ৭৩ হাজার ৪২৩ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান।
- মোট রক্তদাতার সংখ্যা এক লক্ষ ৮০ হাজার ৫২৯ জন।
- আজীবন রক্তদাতা (২০০০ সাল থেকে) ২৩,১২৭ জন, সিলভার ক্লাব ডোনার (২০০৬ সাল থেকে) ৪,১০৩ ও গোল্ডেন ক্লাব ডোনার (২০০৮ সাল থেকে) ১৬৭ জন।
- আয়োজিত ব্লাড ক্যাম্প সংখ্যা এক হাজার ৭৮৪টি।
- ডোনারদের উপহার ও সামর্থ্যহীন রোগীদের অনুদান হিসেবে প্রসেসিং খরচ ছাড়া সরবরাহ করা হয় ১৬,৪৮৯ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান।
- ডোনারের নিকটাত্মীয় ও সীমিত সামর্থ্যবানদের ন্যূনতম প্রসেসিং খরচে সরবরাহ করা হয় ৩৩,০২৫ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান।

রক্ত সংগ্রহ ও সরবরাহ

- ল্যাব ও ক্যাম্প থেকে মোট সংগ্রহ ৫০,৮৯০ ইউনিট রক্ত। ল্যাব সংগ্রহ ৩৩,০৩৮ ইউনিট, ক্যাম্প সংগ্রহ ১৭,৮৫২ ইউনিট। গত বছরের তুলনায় ল্যাব সংগ্রহ কমেছে, বেড়েছে ক্যাম্প সংগ্রহ (৬,২৭২ ইউনিট বা ৫৪.১৬%)। মোট সংগ্রহ ৪,৮৮৮ ইউনিট বা ১০.৬৩% বেড়েছে।
- রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ ৭৮,১৬৫ ইউনিট। মাসিক গড় বেড়েছে ১৩.৭৩%। এ বছর মাসিক গড় ছিলো ৬,৫১৩.৭৫ ইউনিট, গত বছর ৫,৭২৭.৫ ইউনিট।
- হোল ব্লাডের চেয়ে রক্ত উপাদান সরবরাহ হয়েছে বেশি। বছরে ৪৫,১৯৩ ইউনিট রক্ত উপাদান সরবরাহ করা হয় যা গত বছরের (৩৮,১০৭ ইউনিট) তুলনায় ৭,০৮৬ ইউনিট বা ১৮.৬০% বেশি।
- দুই ঈদে ল্যাবের জন্যে নির্ধারিত ১২ দিনের ছুটিতেও (১৮-২৩ আগস্ট ও ২৫-৩০ অক্টোবর) কার্যক্রম চালু রাখায় সরবরাহ হয় ১,১৫০ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান। আর সংগৃহীত হয় ৫৬০ ইউনিট রক্ত।
- ডোনারদের উপহার ও তাদের নিকটাত্মীয়দের ন্যূনতম প্রসেসিং খরচে সরবরাহ করা হয় যথাক্রমে ৯৫ ও ১,৭৫১ ইউনিট।

কোয়ান্টামমে ডা. নুরুল ইসলাম ও কিছু স্মৃতিময় মুহূর্ত



লামার কোয়ান্টামম-এর মূল প্রবেশ পথে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম ও তার সফরসঙ্গীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন গুরুজী, মা-জী ও কোয়ান্টামমের কর্মীরা

৫ মার্চ, ২০১১ কোয়ান্টামমের ইতিহাসে ছিলো একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। এদিন কোয়ান্টামম পরিদর্শন করেন প্রখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী, বাংলাদেশে ধূমপান বিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ ও ইউএসটিসি-র প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। গুরুজী, মা-জী এবং কোয়ান্টামমের সর্বস্তরের কর্মী ও শিক্ষার্থীরা গভীর আন্তরিকতায় স্বাগত জানান তাকে।

সেদিন তার সফরসঙ্গী হিসেবে ইউএসটিসি-র রেজিস্ট্রার, সহকারী রেজিস্ট্রার, মেডিসিন বিভাগের প্রধান প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ ইসহাকসহ ১৬ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং ইউএসটিসি-র মেডিসিন ফ্যাকাল্টিতে অধ্যয়নরত নেপাল, কাশ্মীর, শ্রীলংকাসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা ছিলেন।

ডা. নুরুল ইসলাম ও তার সফরসঙ্গীরা সেখানে পৌছলে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীরা দৃষ্টিনন্দন প্যারেড ও ব্যান্ডবাদন পরিবেশন এবং তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করে।

সেখানে তিনি বলেন, বান্দরবানের লামার এ প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে যে অভিজ্ঞতা আমার হলো তা ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সবাইকে আমি অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা এই বঞ্চিত জনপদকে আলোকিত করে তুলতে ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এখানকার সবার অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও কাজের ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে।

একই দিনে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম কোয়ান্টামমে দিনব্যাপী কোয়ান্টাম চিকিৎসা ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। এতে তার সাথে আগত চিকিৎসকবৃন্দ স্থানীয় পাহাড়ি বাঙালি অধিবাসী ও কোয়ান্টামমের শিক্ষার্থী, কর্মচারীসহ পাঁচ শতাধিক রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। ডা. নুরুল ইসলাম নিজেও অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। এর আগে তিনি তার নামে নামকরণকৃত কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীদের আবাসন 'নুর হল'- এর নামফলক উন্মোচন করেন।



কোয়ান্টামমে আয়োজিত চিকিৎসাসেবা ক্যাম্পে রোগী দেখছেন ডা. নুরুল ইসলাম



কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীদের আবাসন 'নুর হল'-এর নামফলক উন্মোচন করছেন



একজন কোয়ান্টা-কে চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন ডা. নুরুল ইসলামের সফরসঙ্গী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক



চিকিৎসাসেবা ক্যাম্পে আগত একজন পাহাড়ি মহিলা লাউ উপহার দেন ডা. নুরুল ইসলামকে



ইউএসটিসি-র কয়েকজন বিদেশী শিক্ষার্থীর সাথে কোয়ান্টামমে ডা. নুরুল ইসলাম। দেশের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা, ভারত, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ফিলিস্তিন, মালয়েশিয়া ও জর্ডানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে আন্তর্জাতিকমানের উচ্চতর শিক্ষালাভের প্রত্যাশায়



কোয়ান্টাম পরিবারের পক্ষ থেকে মা-জী নাহার আল বোখারী ডা. নুরুল ইসলামকে স্মারক উপহার হিসেবে তুলে দেন পাহাড়ি প্রকৃতির নিদর্শন হাতির প্রতিকৃতি





এ তো সবে শুরু, এর মৃত্যু নেই ... আছে কেবল বিস্তৃতি আর প্রগতি

ওপরের ছবি দুটিতে দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্ব ডা. নুরুল ইসলামের সাথে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের কোয়ান্টারা। এই ক্ষুদে কোয়ান্টারাই অপূর্ব ব্যান্ডবাদন পরিবেশন করে তাকে স্বাগত জানায় কোয়ান্টামমে। তাদের মনোমুগ্ধকর ব্যান্ডবাদন উপভোগ করে কোয়ান্টাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আজকে আমার যে অভিজ্ঞতা তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। কথায় বলে, ভাব যেখানে গভীর, ভাষা সেখানে দুর্বল। মনের ভাব মুখের ভাষায় সবসময় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এটা অনুভূতির ব্যাপার।

এই জঙ্গলে এসে এমন একটা পরিচ্ছন্ন পরিবেশে শিশু-কিশোররা তাদের যে নৈপুণ্য উপস্থাপন করলো, আমি অভিভূত! আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। কৃতজ্ঞতা আমার প্রাপ্য নয়, বরং এত সুন্দর জায়গায় আসতে পারার জন্যে কৃতজ্ঞতা তাদের জানাই–যারা জঙ্গলের ভেতর এই কানন সৃষ্টি করেছেন, যে কানন হলো শিশুদের। কোয়ান্টাদের উদ্দেশ্যে তিনি আরো বলেন, তোমরা সবাই ভাগ্যবান যে, এমন একটি প্রতিষ্ঠানে বেড়ে ওঠার, মেধার বিকাশ ঘটানোর, আলোকিত হওয়ার সুযোগ তোমরা পেয়েছো।

তিনি আরো বলেন, এ প্রতিষ্ঠানকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে, এমন একটি দুর্গম জায়গা যেখানে কেউ যায় না, সেখানে তারা কাজ করছেন। সব মুনি-ঋষিদের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, সবচেয়ে অবহেলিত দুর্গত জায়গায় তাদের খানকা, দরগাগুলো গড়ে উঠেছে। তারা সেসব জায়গায় গিয়েছেন মানবতার উন্নয়নের জন্যে, সেখানকার মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে। শহরের আলোকিত স্থানে আলো দিতে গেলে সেখানে কাজ হয় না। সেখানে অনেক আলো নিয়ে গেলেও তা স্তিমিত হয়ে যায়। অন্ধকার যেখানে থাকে একটি মোমবাতিই যথেষ্ট সে স্থানটিকে আলোকিত করার জন্যে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনও তেমনি সাড়ে চারশ শিশুর মাঝে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলো জ্বালিয়ে সুবিধাবঞ্চিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন এ জনপদকে আলোকিত করে তুলছে।

কোয়ান্টামের এ মহৎ উদ্যোগ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সদিচ্ছা, সৎপ্রচেষ্টা এবং সেইসাথে সৎ সহকর্মীরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয় তাহলে অসম্ভব বলে কিছু থাকে না। পৃথিবীর ইতিহাসে কোয়ান্টাম তাই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে টিকে থাকবে। কোয়ান্টামের কার্যক্রম দেখে আমার শুধু মনে হচ্ছে–এ তো সবে শুরু, এর মৃত্যু নেই... আছে কেবল বিস্তৃতি আর প্রগতি। ক্রমাগত সাফল্য ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে এ প্রতিষ্ঠান–পরম করুণাময়ের কাছে আমি এ প্রার্থনাই করি।

ডা. নুরুল ইসলাম স্মরণে পাহাড়ি জনপদে সবচেয়ে বড় মেডিকেল ক্যাম্প

তিন হাজার রোগী পেলো চিকিৎসা-পরামর্শ ও ওষুধ



চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত কোয়ান্টাম পরিবারের চিকিৎসকবৃন্দ

২৫ জানুয়ারি লামার কোয়ান্টামমে অনুষ্ঠিত হয় একটি চিকিৎসাসেবা ক্যাম্প। দিনব্যাপী এ ক্যাম্পে সারাদেশ থেকে আগত কোয়ান্টাম পরিবারের ১৩২ জন চিকিৎসকের অংশগ্রহণে ২,৯০৫ জন রোগীকে চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করা হয়।

সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এ চিকিৎসাসেবা ক্যাম্পে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার-এর পরিচালক অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ, সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. ইসমাইল পাটোয়ারিসহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরাও চিকিৎসা-পরামর্শ দেন।

চিকিৎসা নিতে দূর-দূরান্ত থেকে নারী-পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধরা আসেন। কেউ কেউ তিন/ চার ঘণ্টার হাঁটা পথ পাড়ি দিয়ে, অনেকে ৩০-৩৫ কিলোমিটার দূর থেকেও এসেছেন। মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, অর্থোপেডিক, চক্ষুরোগ, দন্তরোগ, শিশুরোগ, হৃদরোগসহ বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে চিকিৎসাসেবা পান রোগীরা।



বাঁশ আর কম্বল দিয়ে তৈরি ঝোলায় করে এক মুমূর্ষু রোগীকে নিয়ে তার স্বজনরা এসেছেন চিকিৎসাসেবা ক্যাম্পে

এদিন লামার কোয়ান্টামম মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের গায়েবানা জানাজা এবং দোয়া। এই জানাজায় শরিক হন সারাদেশ থেকে চিকিৎসাসেবা ক্যাম্পে আগত কোয়ান্টাম পরিবারের চিকিৎসকগণ এবং কোয়ান্টামমের সকল স্তরের কর্মী। উল্লেখ্য, দিনব্যাপী এ চিকিৎসাসেবা ক্যাম্পটি উৎসর্গ করা হয় দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী সদ্যপ্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামকে স্মরণ করে।



স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হচ্ছে এক পাহাড়ি মহিলার



চিকিৎসাসেবা দেয়া হচ্ছে স্থানীয় এক অধিবাসীকে



মেডিকেল ক্যাম্পে আগত কোয়ান্টাম পরিবারের চিকিৎসকবৃন্দের একাংশ

কোয়ান্টাম বুলেটিন : ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ॥ সম্পাদক : কাজী মাহ্তাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 8319377, 8391391 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন

আমি এক অনন্য মানুষ
আমরা এক মহান জাতি

মার্চ ২০১৩

আত্মবিশ্বাসী ও কর্মোদ্যমী করে তোলে মেডিটেশন

রোকিয়া আফজাল রহমান



কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি সম্পন্ন করতে পেরে আমি খুব আনন্দ বোধ করছি। মেডিটেশন চর্চা আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসী আর কর্মোদ্যমী করে তোলে। আমি সেটা উপলব্ধি করেছি। চারদিনের এ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আমি চমৎকার কর্মব্যস্ত সময়ও অতিবাহিত করেছি। এখানে জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় শেখার সুযোগ হয়েছে আমার।

এ কোর্সের সবকিছু আরো বেশি ভালো লেগেছে কারণ আমার ব্যক্তিগত দর্শনের সাথে এর অনেক মিল রয়েছে। আমি মনে করি, নিজের ওপর যখন বিশ্বাস দৃঢ় হবে তখন নিজের উন্নয়নের সাথে সাথে অন্যের জন্যেও আমরা কাজ করতে পারবো।

বান্দরবানের কসমো স্কুল আমাদের সবাইকে অভিভূত করেছে। আমরা জানি, প্রতিটি ধর্মে শিশু আর শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর এ প্রতিষ্ঠান এ দুটো বিষয়েই কাজ করছে বেশ গুরুত্বের সাথে। এ উদ্যোগকে আমি অভিনন্দন জানাই।

[রোকিয়া আফজাল রহমান, শিল্প উদ্যোক্তা ও সমাজসেবী। সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৩৫৪ ব্যাচে অংশগ্রহণ করে প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথাগুলো বলেন]

২২ ও ২৩ মার্চ প্রো-মাস্টার্স ওয়ার্কশপ

২২ ও ২৩ মার্চ ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তনে গুরুজীর পরিচালনায় দিনব্যাপী প্রো-মাস্টার্স ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হবে। পায়োনিয়ার থেকে ১৮ ব্যাচ পর্যন্ত সকল প্রো-মাস্টার এতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হবে প্রথমদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা এবং দ্বিতীয় দিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

আসন সীমিত। দ্রুত আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করুন।

সংযোগায়ন চারপাশে ৪০ ঘরে
একাত্ম হোন প্রতিবেশীর সাথে

আপনার চারপাশে ৪০ ঘরে প্রতিবেশীদের সাথে মমতাপূর্ণ আন্তরিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন। সুখে-দুঃখে আপনার প্রতিবেশীর পাশে থাকুন। জড়তা, সংকোচের বৃত্ত ভেঙে তাদের সাথে একাত্ম হোন। সংযোগায়ন কার্যক্রমে অংশ নিয়ে নিজেকে পরিণত করুন চারপাশের মানুষের আত্মিক আশ্রয় ও ভরসাস্থলে।

একটা সময় ছিলো–যখন প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক ছিলো সামাজিক আচারের একটি অন্যতম ভিত্তি। প্রতিটি পাড়ায় মহল্লায় সবাই মিলে ছিলো একটি বৃহত্তর পরিবার। সুখে দুঃখে আনন্দে শোকে সবাই ছিলো সবার নিঃস্বার্থ আর আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু বর্তমানে ব্যস্ততাপূর্ণ নাগরিক জীবনের দায় মেটাতে গিয়ে সামাজিকভাবে আমরা দিন দিন হয়ে পড়ছি রীতিমতো একা এবং নিঃসঙ্গ। নিজের বাসা, কর্মস্থল আর অবসর সময়ে কম্পিউটার-ফেসবুক-টিভিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে অধিকাংশ মানুষের জীবন। কিন্তু একটি সুস্থ ও সমমর্মী সমাজের জন্যে এ থেকে বেরিয়ে আসা চাই আমাদের।

আর এ লক্ষ্যে সংযোগায়ন কার্যক্রম হতে পারে একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন প্রতিবেশীদের সাথে একাত্ম হতে পারবো, তেমনি সম্ভব হবে আমাদের অকারণ জড়তার বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসা। তাই নিজের বাসা কিংবা কর্মস্থলের চারপাশে ৪০ ঘর/ ৪০ জন মানুষের সাথে সামাজিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন। সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনায় তাদের পাশে দাঁড়ান। বাসা ও কর্মস্থলের চারপাশে চলতে ফিরতে সবাইকে আগে সালাম দিন। সবার সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বলুন ও সদাচরণ করুন। সবার সংযোগায়ন শুভ ও বরকতময় হোক।

নিজের কম্পিউটার নিজেই ঠিক করার কার্যক্রম শুরু



নিজের কম্পিউটার নিজেই এসেম্বল করা এবং নিজেই এর সমস্যা সমাধান করা–এ লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনে শুরু হয়েছে কোয়ান্টাম বেসিক হার্ডওয়্যার প্রোগ্রাম। চার দিনব্যাপী এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের প্রথম ধাপের বিষয়গুলো জানা ও সমস্যাগুলো নিজে নিজেই সমাধান করা–এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের জন্যে এখন অনেক সহজ।

এ প্রোগ্রামে দৈনন্দিন ব্যবহার্য বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস, সফটওয়্যার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ওয়েব ক্যাম, মোবাইল ফোন, ল্যান্ড কার্ড-এর ড্রাইভার ইন্সটল ও কনফিগার করা, ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক কানেকশন, কম্পিউটার ট্রাবলশুটিং ইত্যাদি বিষয়ে অডিও ভিজুয়াল পদ্ধতিতে এ প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। ফলে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও ট্রাবলশুটিং সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ে সঠিক ধারণা অর্জন ও এগুলোর ব্যবহার হচ্ছে আরো স্বতঃস্ফূর্ত।

১৮ বছরের ব্যাকপেইন মুক্ত হয়েছি

ডা. জহিরুল হক তালুকদার



অনেক বছর ধরে আমি আমেরিকার মিশিগানে চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত আছি। দীর্ঘ ১৮ বছর আমি লাম্বার স্পাইনাল স্টেনোসিস-এ ভুগছি। এজন্যে পিঠে ভীষণ ব্যথা হয়। গত ১০ বছর প্রতিদিন চারটি করে ট্যাবলেট খেয়ে যাচ্ছি।

সম্প্রতি দেশ থেকে এক আত্মীয় আমেরিকায় আমার কাছে বেড়াতে যায়। আমার সমস্যা শুনে সে আমাকে কোয়ান্টাম সম্পর্কে অনেক তথ্য দিলো। কোর্স করে মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে রোগমুক্তির অনেক ঘটনা বর্ণনা করলো। সবকিছু শুনে আমি বেশ উৎসাহী হয়ে উঠলাম কোয়ান্টাম কোর্সে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে। দুমাসের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে শুধুমাত্র এ কোর্সটি করার জন্যে সুদূর আমেরিকা থেকে আমি দেশে এসেছি।

এ কোর্সে অংশ নিতে পেরে আল্লাহর নিকট গভীরভাবে শুকরিয়া এবং গুরুজীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কোর্সটি শুরু করার পর থেকে গত ১০ বছরের মধ্যে এই প্রথম আমি কোনো ওষুধ খাই নি। এখন আমি ব্যথামুক্ত। এ নিরাময়কে স্থায়ী করার জন্যে আমি এখন থেকে নিয়মিত মেডিটেশন করবো এবং কোর্সের যাবতীয় দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে চলবো।

[ডা. জহিরুল হক তালুকদার এমডি, ইমার্জেন্সি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, মিডওয়েস্ট হেলথ সেন্টার, মিশিগান, আমেরিকা। ৩৫৩ ব্যাচে অংশগ্রহণ করে প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথাগুলো বলেন]

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৩৫৭ ও ৩৫৮ তম ব্যাচ

ঢাকা : ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ মার্চ

ভেন্যু : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা।

সিলেট : ২৯, ৩০, ৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিল

ভেন্যু : সানরাইজ কমিউনিটি সেন্টার, পাঠানটুলা, সিলেট।

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক। শিশুতোষ গ্রন্থ, ছোটগল্প, উপন্যাস, আত্মজৈবনিক রচনা–সব মিলিয়ে বৈচিত্রময় তার সাহিত্যকর্ম। সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কারসহ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। একজন সমাজ সচেতন লেখকের পাশাপাশি তিনি পেশায় একজন প্রথিতযশা চিকিৎসক। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাইকিয়াট্রি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ডা. আনোয়ারা সৈয়দ হক ব্রিটেনের রয়েল কলেজ অব সাইকিয়াট্রির একমাত্র বাংলাদেশি মহিলা সদস্য। বর্তমানে তিনি ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজের (বারডেম) সাইকিয়াট্রি বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৩৪ ব্যাচে অংশ নিয়েছেন। কোয়ান্টাম বুলেটিনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন তার লেখালেখি, ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক পর্যবেক্ষণের নানা দিক এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন নিয়ে তার আশা ও উপলব্ধির কথা।

মমতাপূর্ণ পারিবারিক বন্ধন জীবনকে সুখী করে

আনোয়ারা সৈয়দ হক



১৯৫৭ সালের কথা। তখন সবে মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি। একদিন দুপুরবেলা বাবা বাড়িতে ভাত খাচ্ছিলেন, আমি সামনে বসে আছি। এমন সময় খবর এলো, আমি ফার্স্ট ডিভিশনে মেট্রিক পাশ করেছি। খবরটা শুনে বাবা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন; মা-র দিকে তাকিয়ে কেবল একটা কথাই বললেন–'আমি খুশিতে ভাত খেতে পারছি না'।

আমার বাবা ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। বেশ ভয় পেতাম আমরা তাকে। তাই সেদিন বাবার খুশি দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছিলো। আমার সাফল্যে বাবা খুশি হয়েছেন! এটি আমার জীবনের একটি অন্যতম সুখস্মৃতি।

আমার ইচ্ছে ছিলো, সাহিত্য নিয়ে পড়বো। কিন্তু বাবা বললেন, তোমাকে ডাক্তারি পড়তে হবে। ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলাম। সেই প্রথম আমার ঢাকায় আসা, এমনকি প্রথম বাড়ির বাইরে বের হওয়া। কলেজের হোস্টেলে উঠলাম। জীবনে প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ পেলাম যেন। সেইসাথে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ। কিন্তু মজার কথা হলো, যে-ই ছাড়া পেলাম, ঠিক তখনই আমি পুরোপুরি নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাপন শুরু করলাম। আমার মনে হলো, এখন আমাকে ভালোভাবে পড়াশোনা করতে হবে, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একজন মানুষ হতে হবে। ভাবলাম, স্বাধীনতার অপব্যবহার করলে চলবে না, বরং জীবনকে একটু একটু করে গুছিয়ে নেয়া চাই।

ডাক্তারি পাশ করে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোর-এ ক্যাপ্টেন হিসেবে কর্মজীবন শুরু করি। পরে সেখান থেকে এয়ারফোর্সে। আমি ছিলাম এয়ারফোর্সের প্রথম মহিলা অফিসার। এমন সময় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো।

নিজেকে সত্যিই ভাগ্যবান মনে করি, মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি মহান ঘটনা আমার জীবদ্দশায় ঘটেছে। স্বাধীনতা দেখাটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন, সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য। শত শত বছর ধরে নিপীড়িত বঞ্চিত হীনম্মন্য বাঙালি জাতি কী প্রচণ্ড উদ্দামতায় সেদিন জেগে উঠেছিলো! এদেশে এর আগেও তো অনেক বড় বড় নেতা ছিলেন; কিন্তু বঙ্গবন্ধু এসে একটা ঝড় তুলে দিলেন যেন! পুরো জাতির মধ্যে একটা জাগরণ ঘটিয়ে দিলেন। সারাদেশ টালমাটাল হয়ে উঠলো। এদেশের সবচেয়ে দুর্বল মানুষটিও সেদিন ভেবেছিলো, আমার একখান দা আছে, এটা নিয়েই আমি যুদ্ধ করবো। কী অভূতপূর্ব জাগরণ! সেই সময়টাতে কিছু কথা ডায়রিতে লিখে রেখেছিলাম। সেগুলো নিয়ে পরে লিখেছি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণা–'অবরুদ্ধ'।

আমি মূলত প্রাণের টানে, মনের আনন্দে লিখি। একটা সময় যখন দেখলাম, দেশজুড়ে এক সর্বগ্রাসী অসচেতনতার ফলে আমাদের কিশোর-তরুণরা দিকভ্রান্ত হচ্ছে, মাদক আর নানা সামাজিক অস্থিরতা-অনাচার তাদের সুকুমার জীবনবোধকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তখন আমি আমার লেখার মধ্য দিয়ে ওদের সচেতন করে তুলতে চেয়েছি।

কিশোর-কিশোরীদের জন্যে লেখা আমার একটা বই আছে–'তুমি এখন বড় হচ্ছো'। বইটিতে গল্পের ভেতর দিয়ে সহজভাবে আমি ওদের বলেছি–নিজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া চাই, বাবা-মায়ের প্রতি আচরণ কেমন হওয়া উচিত। তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, নিজের ও পরিবারের পাশাপাশি সমাজ ও দেশের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের বিষয়টিও। বলেছি, দেশ এখন তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তুমি দেশকে কী দেবে?

বইটি পড়ে অনেকেই আমাকে বলেছেন, তারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন–আমি তো ক্ষুদ্র নই! আসলেই তাই। মানুষ হিসেবে আমরা কেউ-ই ক্ষুদ্র তুচ্ছ নই। যে যেমনই হই, যে অবস্থানেই থাকি, প্রত্যেকেই আমরা সমাজের জন্যে কাজ করতে পারি। মানুষের সেবা করতে পারি, দেশকে কিছু দিতে পারি।

আমি মনে করি, একজন লেখকের কাজ তো এটাই–মানুষকে উদ্দীপ্ত করা, তার ভেতরের শুভবোধটিকে জাগিয়ে তোলা। তাই আমার অন্যান্য পরিচয়গুলোর চেয়ে আমি আমার লেখক সত্তাটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। কেউ কেউ আমাকে বলেন–আপনি একদিকে লেখক, আবার পেশায় চিকিৎসক–কীভাবে সবকিছু সমন্বয় করেন? আমি বলি, সবই সম্ভব, যদি আমরা সময় নষ্ট না করি।

শুধু তা-ই নয়, আমার লেখক সত্তা আর চিকিৎসা পেশার বাইরেও আমি একজন মা, একজন গৃহিণী। সংসারের প্রতিও আমার কিছু দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্বটুকু আমি কোনোভাবেই অবজ্ঞা করতে পারি না। পরিবারকে সময় দেয়া, পরিবারের সবার প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেয়া আমাদের নৈতিক কর্তব্যগুলোর একটি। কারণ, সুখী জীবনের জন্যে পারিবারিক বন্ধনটা খুব জরুরি। অথচ হরেক রকম বিনোদন আর প্রযুক্তির আগ্রাসনে এই পারিবারিক বন্ধনটাই আজ একটু একটু করে দুর্বল হয়ে পড়ছে।

একটা সময় ছিলো যখন দিনশেষে বাড়ি ফিরে পরিবারের সবাই একসাথে বসতো, স্কুলে কিংবা অফিসে সারাদিন কী হয়েছে, না হয়েছে সেসব গল্প হতো। আর এখন? সন্ধ্যার পর মা বসলেন হিন্দি সিরিয়াল দেখতে, ছেলে বসলো ফেসবুকে, বাবা ল্যাপটপ নিয়ে বসলেন, আর মেয়ে ছুটলো এসএমএস করতে। কিন্তু শেষপর্যন্ত এসবের ফলাফল কী? আমরা আসলে বুঝতেই পারছি না–কীভাবে আমরা নিজেদের জীবনকে ক্রমশ জটিল করে তুলছি।

নতুন নতুন প্রযুক্তি আমরা ব্যবহার করবো ঠিকই, কিন্তু তা যেন হয় যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকুই। কারণ, আধুনিক প্রযুক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার আমাদের নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, অশান্তি বাড়াচ্ছে। প্রযুক্তি কখনো মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। তা-ই যদি পারতো, তবে আমেরিকানরা হতো পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী জাতি–সেখানে তো ফেসবুক-ইন্টারনেটসহ সব ধরনের প্রযুক্তি আরো সহজলভ্য; কিন্তু আজকে হাজার হাজার ডলার খরচ করে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে সবচেয়ে বেশি যাচ্ছে আমেরিকানরাই।

আমার খুব ভালো লাগে যে, কোয়ান্টাম এসব ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করে তুলছে। একজন মনোচিকিৎসক হিসেবে আমি যে কাউন্সেলিং করি, গুরুজী সেটাই করছেন আরো বড় পরিসরে। অনেকেই আমাকে বলেছেন, কোয়ান্টামে গিয়ে তিনি আগের চেয়ে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন।

জীবনে চলার পথে ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন উত্থানপতন এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ, বিষণ্নতা এগুলো খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু এর মধ্যেও মানুষকে একটু শান্তি দিতে পারা, ভালো থাকার সাহস যোগানো–এ তো অনেক বড় ব্যাপার। কোয়ান্টাম সে কাজটিই সুন্দরভাবে করে যাচ্ছে। ব্যক্তিমানুষের উপকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম মানুষকে সামষ্টিক কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করছে। আমি বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতের বাংলাদেশ একদিন অবশ্যই এ কাজের মূল্যায়ন করবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

এনার্জি ড্রিংকস

সাত ধরনের পানীয়তে ক্ষতিকর উপাদান

'এনার্জি ড্রিংক' হিসেবে পরিচিত সাত ধরনের পানীয়তে জনস্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর উপাদান পাওয়া গেছে, যা ভোক্তাদের আসক্তি বৃদ্ধি, যৌনশক্তি হ্রাস ও হৃদরোগের কারণ হতে পারে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বাজার থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন পানীয়র নমুনা নিজেদের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে। পরীক্ষার ফল নিয়ে তৈরি প্রতিবেদনটি গত আগস্টে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ভিগো-বি, ম্যান পাওয়ার, হর্স ফিলিংস, রয়েল টাইগার, ব্ল্যাক হর্স ও স্পিড নামের সাতটি পানীয়তে স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর উপাদান রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম চারটিতে অপিয়াম উদ্ভূত অপিয়েট ও সিলডেনাফিল সাইট্রেট নামের রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া গেছে। এ দুটি দ্রব্য ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮২ অনুযায়ী নিষিদ্ধ। পরের তিনটি পণ্যে পাওয়া গেছে উচ্চমাত্রার ক্যাফেইন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইকবাল ক্ষতিকর উপাদান মেশানো এসব পানীয় কোম্পানির বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সরকারের কাছে জোর সুপারিশ করেছেন বলে প্রথম আলোকে জানিয়েছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অপিয়েট একধরনের নেশা বা নির্ভরতা সৃষ্টিকারী উপাদান। এমন উপাদানমিশ্রিত পানীয় পান করলে শরীরের ভেতরে এমন অবস্থা তৈরি হয়, তখন শরীর উন্মুখ হয়ে থাকে কখন ওই উপাদান পাওয়া যাবে। আর সিলডেনাফিল সাইট্রেট ধীরে ধীরে যৌনশক্তি নিঃশেষ করে ফেলতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক আ ব ম ফারুক বলেন, একপর্যায়ে আরো কড়া নেশার দিকে ধাবিত হয় এই পানীয় গ্রহণকারীরা। এমন নেশাকে বড় নেশার জগতে প্রবেশের জন্যে 'ওয়েটিং রুম' হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি।

পরীক্ষিত পানীয়গুলোর একটি 'হর্স ফিলিংস'। এর বোতলের গায়ে লেখা রয়েছে যে, এটি ঔষধি গুণসম্পন্ন। এটি যৌনশক্তি বৃদ্ধিকারক, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিরাময়ক, হৃদরোগ প্রতিরোধক। এছাড়া এতে রক্তস্বল্পতা দূর হয়, চর্মরোগের জন্যে উপকারী এবং মেদভুঁড়ি কমাতেও সহায়তা করে।

তিনি বলেন, যৌন উত্তেজক পদার্থ সিলডেনাফিল সাইট্রেট মেশানো পানীয় যৌনশক্তি বৃদ্ধি দূরে থাক, পর্যায়ক্রমে এটি পুরুষত্ব নষ্ট করে ফেলবে। হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যকৃৎ ও কিডনি। একমত পোষণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের ডীন এ বি এম আবদুল্লাহ। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, এসব পানীয় দীর্ঘদিন পান করলে ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গর্ভবতী নারীর সন্তান বিকলাঙ্গ হতে পারে।

ক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত 'হর্স ফিলিংস'-এর বোতলের মোড়কে লেখা রয়েছে, এটি 'পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরীক্ষিত ও অনুমোদিত'। তবে ইনস্টিটিউটের পরিচালক আমিনুল হক ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, এটা একেবারেই মিথ্যা। ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে এমন কোনো পণ্য পরীক্ষা বা অনুমোদন করা হয় নি। তিনি এই কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ভিগো-বি, ম্যান পাওয়ার, হর্স ফিলিংসের নমুনায় অপিয়েট ও সিলডেনাফিল সাইট্রেটের মতো ক্ষতিকর উপাদান থাকলেও এসব পানীয়ের বোতলে উৎপাদক কোম্পানির কোনো ঠিকানা উল্লেখ নেই। উচ্চমাত্রায় ক্যাফেইন পাওয়া রয়েল টাইগার, ব্ল্যাক হর্স ও স্পিড 'কার্বোনেটেড বেভারেজ' হিসেবে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বিএসটিআই অনুমোদিত। এসব পণ্য অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে চিহ্নিত। বিএসটিআইয়ের মানদণ্ড অনুযায়ী, এক কেজি পণ্যে ক্যাফেইনের সহনীয় মাত্রা ২০০ মিগ্রা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেখানে আন্তর্জাতিক পানীয়গুলোতে প্রতি লিটারে ক্যাফিনের পরিমাণ ৫০ মিগ্রা, সেখানে রয়েল টাইগারের পরিমাণ ২৩০.৪০ মিগ্রা। ব্ল্যাক হর্স ও স্পিডের ২৭০ মিলিলিটারের বোতলে ক্যাফেইনের পরিমাণ যথাক্রমে ২৩৫.৫০ ও ২২৮.৫০ মিগ্রা।

অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারের প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষক দুলাল কৃষ্ণ সাহা বলেন, 'বিএসটিআইয়ের মানদণ্ড অনুযায়ী ব্ল্যাক হর্স, স্পিড ও রয়েল টাইগারের নমুনায় সহনীয় মাত্রার চেয়ে পাঁচগুণ বেশি ক্যাফেইন পাওয়া গেছে। এছাড়া এসব পানীয়তে ব্যবহৃত হয় সিনথেটিক ক্যাফেইন, যা আরো ভয়াবহ। আমাদের দেশে ক্যাফেইন নিয়ন্ত্রণে কোনো আইন নেই।'

বিএসটিআই অনুমোদিত পণ্যে উচ্চমাত্রায় ক্যাফেইনের উপস্থিতি প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক কমল প্রসাদ দাস বলেন, বিএসটিআই 'কার্বোনেটেড বেভারেজ'-এর ক্যাফেইনের মাত্রা পরীক্ষা করে না। এসব পরীক্ষার ক্ষেত্রে ১২টি মানদণ্ড বিচার করা হয়। এক্ষেত্রে মোড়ক, আর্সেনিকসহ ১১ ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষা করা হয়। তিনি বলেন, 'এসব পানীয়তে অতিরিক্ত ক্যাফেইন ব্যবহারের বিষয়টি আমাদের জানা ছিলো না। আমরা দ্রুত বাজার থেকে এসব পণ্য কিনে তা পরীক্ষা করে দেখবো। প্রমাণিত হলে এসব কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

পানীয়তে ক্যাফেইনের মতো উত্তেজক পদার্থের অস্বাভাবিক উপস্থিতি সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। অধ্যাপক আবদুল্লাহ বলেন, এই পানীয় রুচি নষ্ট ও মেজাজ খিটখিটে করে দিতে পারে। শিশুদের জন্যে এগুলো খুবই ক্ষতিকর, যকৃৎ ও কিডনির ক্ষতি হতে পারে।

অধিক ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় রয়েল টাইগার ও ব্ল্যাক হর্সের উৎপাদক প্রতিষ্ঠান এএসটি বেভারেজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক মো. শাহনেওয়াজ মানতে রাজি নন যে, তাদের পণ্যে সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি ক্যাফেইন আছে। তিনি বলেন, 'পরিমাণ ঠিক না থাকলে আমরা অনুমোদন পেলাম কী করে?'

সহনীয় মাত্রার চেয়ে কোনোক্রমে বেশি ক্যাফেইন থাকতে পারে না বলে দাবি করেছেন স্পিড পানীয়টির উৎপাদক আকিজ ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেডের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপক সাইফুল ইসলাম তালুকদার। তার দাবি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরীক্ষাটি সঠিক হয় নি।

সৌজন্যে – দৈনিক প্রথম আলো (৮ জানুয়ারি ২০১৩)

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আসসালামু আলাইকুম। আমি মো. সানোয়ার হোসেন, ৩৫২ তম ব্যাচে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণ করেছি। আমি ১৯৯৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা সম্পন্ন করি। ১৯৯৮ থেকে ২০১২ পর্যন্ত আমি মোট আটটি চাকরি পরিবর্তন করেছি। কারণ, আমি দীর্ঘদিন কোথাও মনোযোগ ধরে রাখতে পারি না। অল্পতেই রেগে যাই। সহকর্মী ও বসের সাথেও সবসময় বিরোধে জড়িয়ে পড়ি।

আমার স্ত্রী প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার। তিনি ১৫৮ তম ব্যাচে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি সম্পন্ন করেন। তখন থেকেই তিনি আমাকে উদ্বুদ্ধ করে এসেছেন এ কোর্সটি করার জন্যে। কিন্তু সবসময়ই আমি তার অনুপ্রেরণাকে এড়িয়ে গেছি।

এপ্রিল ২০১২-তে আমি আমার ৮ম চাকরি–একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির এসিসটেন্ট ম্যানেজার পদ থেকে রিজাইন দিয়ে চলে আসি। পরের মাস থেকেই আবার প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করি ভালো একটি চাকরির জন্যে।

অনেক চেষ্টা করেও কাঙ্ক্ষিত চাকরি না পেয়ে অবশেষে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কোর্সের চারদিন পর নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম। আপনার আলোচনা শুনে মনে হলো, আমি এতদিন সম্পূর্ণ ভুল পথে চলছিলাম।

তারপর প্রতিদিন দুবার মেডিটেশন অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে শোধরানোর চেষ্টা করেছি। কোর্স শেষে আপনার দেয়া এসাইনমেন্ট অনুযায়ী কোনো বিরতি ছাড়া টানা ৪০ দিন দুবেলা মেডিটেশন করেছি। মাটির ব্যাংকেও নিয়মিত দান করেছি।

এবার আপনাকে আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সংবাদটি দিচ্ছি। মেডিটেশন অনুশীলনের ৪১ তম দিনে ঠিক আমার পছন্দমতো একটি চাকরি পাই। পদবী একই হলেও আরো ভালো একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে আমার চাকরি হয়। সেখানে 'এক্সিকিউটিভ' পদে আবেদন করলেও আমি সবসময় মনছবি দেখতাম, সে প্রতিষ্ঠানে একজন এসিসটেন্ট ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করছি। ভাইভায় আমি বেশ আত্মপ্রত্যয়ী ছিলাম এবং প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্টও সন্তুষ্ট ছিলো। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! ভাইভার পর দিনই ম্যানেজমেন্ট আমাকে ফোন করে অভিনন্দন জানায় যে, তারা আমাকে এসিসটেন্ট ম্যানেজার হিসেবে চাকরিতে নিয়োগদান করছে। আনন্দে আর শুকরিয়ায় আমি তখন ভাষাহারা হয়ে গিয়েছিলাম।

মেডিটেশনের মাধ্যমে মনছবি করতে শেখানোর জন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের জন্যে দোয়া করবেন। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।

মো. সানোয়ার হোসেন

ধ্যান দোয়া দাওয়া ও দান-এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছি

ব্যারিস্টার ফিদা এম কামাল



কোর্সে গুরুজী চমৎকার গুছিয়ে ও অত্যন্ত সাবলীলভাবে চারদিন বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি জীবনকে ভিন্ন আঙ্গিক থেকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে শিখিয়েছেন। দার্শনিকদের, জ্ঞানীদের যুগ যুগ ধরে পুঞ্জীভূত যে জ্ঞান, তার নির্যাসটা আমরা পেয়েছি। ধ্যান দোয়া দাওয়া ও দান–এই বিষয়গুলো আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে উপলব্ধি করিয়েছেন। কোর্সে উপস্থিত তরুণরা এবং আমরা যারা জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি–প্রত্যেকে জীবনের অগণিত ক্ষেত্রে এ কোর্স থেকে উপকৃত হবো।

এ কোর্সে অংশ নিতে যিনি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তার কাছে সত্যি আমি কৃতজ্ঞ। এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আমি বিশ্বাস করি, এর মধ্য দিয়ে আমি আমার জীবনকে বদলে দিতে পারবো।

[ব্যারিস্টার ফিদা এম কামাল, সাবেক এটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ। সিনিয়র এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট। ৩৫৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছি

মো. তানভীর কাদের



ছোটবেলা থেকেই অন্যায় অপরাধ আর দুষ্টামি করে আমি খুব এডভেনচার করতাম। নিজের আনন্দের জন্যে এ বয়সে অনেক দুষ্টামি করেছি। যার ফলে মা-বাবাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। প্রচণ্ড অলস ছিলাম, দিনের প্রায় বেশিরভাগ সময় আমি শুয়ে বসে কাটাতাম। জীবনে কোনো লক্ষ্যও ছিলো না। এ পর্যন্ত চারবার কলেজ পরিবর্তন করেছি।

এসব কারণে মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আমাকে অপছন্দ করা শুরু করে। সবাই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো। একসময় প্রচণ্ড একাকিত্ব অনুভব করতাম। কিন্তু কোর্সে এসে গুরুজীর আলোচনা আর বিভিন্ন দিকনির্দেশনা শোনার পর থেকে আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছি। নিজের ভেতরে এক আমূল পরিবর্তন অনুভব করছি। এখন আমি অনেক গোছানো একজন মানুষ। নিয়মিত মেডিটেশন করি, নামাজ পড়ি, পড়াশোনায় পরিপূর্ণ মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করছি।

[মো. তানভীর কাদের, এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন, কলেজ এব এভিয়েশন টেকনোলজি, উত্তরা। ৩৫৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নামাজে এতটা তৃপ্তি কোনো দিন পাই নি

ড. মো. নিজামুল করিম



আমরা যারা ধর্মে বিশ্বাস করি; প্রার্থনা আমাদের জীবনের অংশ। আগে নামাজে, প্রার্থনায় ঠিকভাবে মনোনিবেশ করা আমার জন্যে বেশ কষ্টসাধ্য ছিলো। এই মেডিটেশন কোর্সে অংশ নেয়ার পর থেকে নামাজে আমার যে মনোযোগ তা অসাধারণ এবং এতটা তৃপ্তি আমি কোনোদিন পাই নি।

আমি নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে বিপন্ন বোধ করতাম। এ কোর্সে এসে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমার চারপাশে অনেক ভালো মানুষ আছে এবং তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভালো কাজ করছে। আমি পৃথিবীর অনেক দেশে গিয়েছি, অনেক প্রশিক্ষণ নিয়েছি। কিন্তু এই প্রশিক্ষণটি মনে হয়েছে আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান।

[ড. মো. নিজামুল করিম, কলেজ পরিদর্শক, কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড। ৩৫২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

অন্তর্দ্বন্দ্ব আর মনের দুর্বলতাই ছিলো রোগের মূল কারণ

ফারিন ফাইরোজ



ছোটবেলা থেকেই আমি বেশ কল্পনাপ্রবণ। তবে আমার স্বপ্ন, কল্পনা, অনুভূতিগুলো ছিলো বিক্ষিপ্ত আর খণ্ড খণ্ড। কিন্তু কোর্সে আসার পর গুরুজীর আলোচনা শুনতে শুনতে নিজের ভেতরে সব কিছু গোছাতে শুরু করলাম। মেডিটেশনেও কল্পনাগুলো সব গোছানো অবস্থায় আসছিলো।

সম্প্রতি আমি একটি সমস্যায় ভুগছিলাম। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর হঠাৎ উঠতে গেলে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম। এখানে মেডিটেশন করার পর থেকে একবারের জন্যেও আমার এরকম কিছু আর হয় নি।

অল্পতেই আমি অসুস্থ হয়ে যেতাম। কিন্তু কোর্সে মেডিটেশনে নিরাময় কক্ষে যখন নিজেকে অবলোকন করলাম, উপলব্ধি করলাম, আসলে আমি কত সুস্থ! কত সুন্দর একজন মানুষ! অন্তর্দ্বন্দ্ব আর মানসিক দুর্বলতাই ছিলো আমার অসুস্থতার মূল কারণ। এখন থেকে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, নিজেকে আর কখনো দুর্বল ভাববো না। প্রো-একটিভ হয়ে নিজের এবং মানবতার জন্যে কাজ করে যাবো।

[ফারিন ফাইরোজ, ১ম বর্ষ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ। ৩৫৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ

অনেজা বেগম জলি



আমি বরাবরই আশাবাদী। কিন্তু এখানে এসে যেটা বুঝলাম যে, এতদিন অগোছালো ছিলাম। সন্তানদের লালনপালন করতে গিয়ে যে আচরণ আমি করেছি–এখন মনে হয় সেটা অত্যাচারের পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো। আমি যদি প্রো-একটিভ হতাম তাহলে ওরা আরো শান্তি পেতো।

আমরা আসলে সবই জানি। কিন্তু সে জানা বিষয়গুলো এলোমেলো হয়ে গিয়েছিলো। কোর্সে গুরুজী আমাদের জানা বিষয়গুলোকে সচল করে দিয়েছেন। আমি মনে করি, এটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ। এখন অনেক বড় স্বপ্ন দেখি।

[অনেজা বেগম জলি, প্রাক্তন কর্মকর্তা, বিপিএমএসজি, ইউএনডিপি। ৩৫৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সুস্থ হওয়ার বিশ্বাস পেয়েছি

মো. নিজাম উদ্দিন



১৯৯৬ সালে আমার মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন হয়, হার্টে দুটো ব্লক ধরা পড়ে। কিছুক্ষণ হাঁটলেই বসে পড়তে হতো, বুকে চাপ অনুভব করতাম। দেশে এ অসুখের চিকিৎসা ছিলো না। ভারতে গিয়ে বাইপাস করিয়েছি।

২০০২ সালে আমার এপেন্ডিসাইট এবং গলব্লাডার অপারেশন হয়। ২০০৫ সালে আমার হার্টের একটা ভাল্‌ভ ড্যামেজ হয়ে যায়। এ সময় দেশের চিকিৎসকরা কোনো ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। তাদের পরামর্শে দেশের বাইরে থেকে ভাল্‌ভ রিপ্লেস করে এলাম। এরপর থেকে শারীরিক মানসিকভাবে অনেকটা পঙ্গু হয়ে গেলাম।

হার্টের রোগী হওয়ায় সবসময় বুকে একটা চাপা অস্বস্তি বোধ করতাম। আর নাকে সবসময় শ্লেষ্মা জমে থাকতো, নাক দিয়ে কখনো শ্বাস নিতে পারতাম না। মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হতো। আল্লাহর রহমতে আমার বুকের সে চাপা যন্ত্রণাটা আর নেই, নাকেও এখন শ্লেষ্মা জমে না। নাক দিয়েই শ্বাস নিতে পারি।

গত ৫/৬ মাস যাবত গোড়ালির ব্যথায় ডাক্তারের পরামর্শে পায়ে এঙ্কলেট ব্যবহার করতাম। কোর্সের ৩য় দিন থেকে আমি এঙ্কলেট খুলে ফেলেছি, পায়ে এখন কোনো ব্যথা নেই।

ডাক্তাররা বলতো, আমি গ্রেস টাইমে আছি। আর কয়েকদিন হয়তো বেঁচে থাকবো। কিন্তু কোর্স করার পর আমি আশাবাদী, আল্লাহ চান তো সুস্থভাবে আমি আরো বহুদিন বেঁচে থাকবো। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সেবক হিসেবে বেঁচে থাকতে চাই।

[মো. নিজাম উদ্দিন, সিনিয়র অফিসার, সোনালী ব্যাংক লি.। ৩৫৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

শপথের দৃপ্ততায় বর্ষায়ন আনন্দ



ধানমণ্ডি রবীন্দ্র সরোবরে বর্ষায়নে প্রায় দুই সহস্র মানুষ সমবেত হন

২০১৩। শপথের বছর। বিশ্বাসের আলোকে নিজেকে বদলানোর বছর। উৎসবমুখর আনন্দময় পরিবেশে এ বছরটিকে স্বাগত জানিয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। দেশে ও দেশের বাইরে বিভিন্ন সেন্টার শাখা সেলে বছরের প্রথম শুক্রবার ৪ জানুয়ারি উদযাপিত হয়েছে কোয়ান্টাম বর্ষায়ন।

পরিবারের সবাইকে নিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর লক্ষ্যেই এ আয়োজন। কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা আত্মীয় পরিজন নিয়ে অংশ নেন বর্ষায়নে। বিশ্বাসের আলোকে বদলাবো নিজেকে–এই বার্তা নিয়ে চারপাশের মানুষের মাঝে মিশে যাওয়াই ছিলো এবারের বর্ষায়নের মূল উপজীব্য।

এ বছর সবচেয়ে বড় আয়োজন ছিলো ধানমণ্ডি লেক প্রি-সেল এর উদ্যোগে ধানমণ্ডি রবীন্দ্র সরোবরে বর্ষায়ন। প্রায় দুই সহস্র মানুষ সমবেত হন এই অনুষ্ঠানে। বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই বর্ষায়ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। কোয়ান্টামের ২১ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে গুরুজীর শুভেচ্ছাবাণী এবং 'বর্ষায়ন ২০১৩' মেডিটেশনের অনুরণন ছড়িয়ে পড়ে আগত সবার মাঝে। বর্ষায়ন ভিন্ন মাত্রা পায় যখন সবাই একসাথে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করে নতুন বছরের শপথ–'আমি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলবো। অশ্লীল ও ব্যাঙ্গাত্মক শব্দ বর্জন করবো। সবার সাথে সদাচরণ করবো।'

দেশের বিভিন্ন সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেল ও প্রবাসে বসবাসরত কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা সম্ভাব্য সব জায়গায় বর্ষায়ন আয়োজন করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম রাজশাহী, সিলেট, খুলনা, যশোর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, কক্সবাজার, ফেনী, খাগড়াছড়ি, বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে উৎসবমুখর পরিবেশে বর্ষায়ন উদযাপন করা হয়।

কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি লন্ডন, আমেরিকায় ভার্চুয়াল সেল-এর আয়োজনে ইউএসএ-এর পাঁচটি স্টেটসহ কানাডা, সুইজারল্যান্ড এবং কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি ইউএসএ-এর উদ্যোগে নিউইয়র্কে বর্ষায়নের আয়োজন করা হয়। এছাড়া সুইডেন, অটোয়া, সিডনি, মেলবোর্নেও বর্ণাঢ্য আয়োজনে স্বাগত জানানো হয় নতুন বছরকে।



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারের উদ্যোগে ডিসি হিল-এ কোয়ান্টাম বর্ষায়ন



কোয়ান্টামম আরোগ্যশালায় বর্ষায়নে অংশ নেন প্রায় ১৩০০ মানুষ



কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি সিডনিতে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয় শপথের মধ্য দিয়ে



যশোর শাখার উদ্যোগে কালেক্টরেট চত্বরে শতাধিক অংশগ্রহণকারী নিয়ে বর্ষায়ন



বনশ্রী আফতাবনগরে কুয়াশা মোড়ানো সকালে নতুন বছরের শপথ পাঠ করছেন অংশগ্রহণকারীরা



কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি মেলবোর্নে উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হয় বর্ষায়ন



উত্তরায় বর্ষায়নে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা



রাজশাহী বড়কুঠিতে বর্ষায়নে ধ্যানমগ্ন অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবসময় আমার মন উসখুস করে। আমি একবার এক চোরের চুরি করা প্রকাশ করে দিয়েছিলাম। এখন সে আরো কয়েকজনকে নিয়ে আমার বিরুদ্ধে নেমেছে যেন চোরের মা-র বড় গলা! আমি দান করে কোনো রকমে তাদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। আমি কি তাদের উচিত শিক্ষা দেবো নাকি ক্ষমা করে দেবো?*

উত্তর : সবসময় মনে রাখবেন যে, উচিত শিক্ষা দেয়াটা কিন্তু আপনার কাজ না। আইনকে কখনো নিজের হাতে তুলে নেবেন না। যখনই কোনো ব্যক্তি আইন নিজের হাতে তুলে নিতে যাবে, বিশৃঙ্খলা আরো বাড়বে। বিচারের দায়িত্ব বিচারকের। বিচারের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। অতএব রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে যা ব্যবস্থা নেয়ার নেবে কিন্তু কোনো ব্যক্তির অন্যকে উচিত শিক্ষা দেয়ার কোনো সুযোগ এখানে নেই। এই যে সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, আতঙ্কবাদ-এর মূল যুক্তি হলো এই 'শিক্ষা' দিতে যাওয়া। অথচ এই শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব ধর্ম বা রাষ্ট্র কখনো কোনো ব্যক্তিকে দেয় নি। 'শিক্ষা' দেয়ার দায়িত্ব সবসময় রাষ্ট্রের। শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব সবসময় রাষ্ট্রের।

প্রশ্ন : *আমার বিশ্বাস বেশি দিন স্থায়ী থাকে না। যখন আমি বিশ্বাসী হয়ে উঠি তখন আমি ভাবি যে, আমি পারবো, আমার দ্বারা সবকিছুই সম্ভব। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে যায়। কী করলে আমি বিশ্বাসে অটল থাকতে পারবো?*

উত্তর : সবসময় অটোসাজেশন দেবেন। শয়নে স্বপনে আহারে বিহারে সবসময় অটোসাজেশন দেবেন–আমি বিশ্বাসী, আমি বিশ্বাসী, আমি বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসের ওপরে আরো অনেক অটোসাজেশন রয়েছে। অটোসাজেশনগুলো আপনি সবসময় অনুশীলন করতে থাকবেন। আপনি উপলব্ধি করবেন, আপনার বিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে।

প্রশ্ন : *আমি একটা বিষয়ে টানা ৪০ দিন হিলিংয়ে নাম দিয়েছি, নিজে মেডিটেশন করেছি কিন্তু তাতে ব্যর্থ হই। তারপরও সদকা ও মাটির ব্যাংকে দান করেছি। এত মনোযোগ সহকারে সবকিছু করার পরও কেন আমি সফল হতে পারছি না? আমার সমস্যা কোথায়?*

উত্তর : আসলে কিছু কিছু জিনিসের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। সবসময় মনে রাখবেন, আপনি যা কিছু করেন না কেন, প্রত্যেকটা জিনিসের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। সে সময় পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। এজন্যে সবসময় বিশ্বাস করতে হবে, কাজ করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে, হিলিং করতে হবে, দান করতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা, লেগে থাকতে হবে। সেইসাথে সবর করতে হবে।

প্রশ্ন : *৯৭ সালে গ্রাজুয়েশন কোর্স করেছি। তারপর থেকে এই পর্যন্ত ব্যর্থতার শৃঙ্খল ভাঙতে চেষ্টা করছি, কিন্তু সফলতার দ্বারপ্রান্তে এসে বিফল হচ্ছি। এই বৃত্ত থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কী?*

উত্তর : আসলে সাফল্য গ্রহণ করার জন্যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। আপনার সে প্রস্তুতি এখনো সম্পন্ন হয় নি বলেই আপনি সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসেও আবার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছেন। আপনার মনে ব্যর্থতার চিন্তা বেশি আসে। আপনি যত বেশি ব্যর্থতার কথা চিন্তা করবেন, ব্যর্থতা আপনার দিকে তত বেশি আকৃষ্ট হবে।

এখন থেকে আপনি নিয়মিত মনছবির মেডিটেশন করবেন। মনছবি বাস্তবায়িত হওয়ার যে সময়, সেই সময়ে চলে যাবেন। অবলোকন করবেন, আপনি সফল হয়েছেন। সাফল্যের সে অনুভূতিটা নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করবেন। এভাবে নিয়মিত অনুশীলন করুন। আপনি সফল হবেন।

আর আপনাকে ব্যর্থতার বৃত্ত ভাঙতে হবে সাফল্যের মনছবি দেখে। নিজেকে সফল ভাববেন সবসময়। সাফল্যের অনুরণন শুধু মুখে না, কথায় না–সাফল্য সবসময় থাকতে হবে অন্তরে, সাফল্য থাকতে হবে মস্তিষ্কে। সাফল্যের সাথে নিজেকে সার্বক্ষণিকভাবে সংযুক্ত করে ফেলতে হবে যে–আমি সফল। আপনি দেখবেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনার সাফল্য আসবে।

প্রশ্ন : *কোর্স করার পর আমার মধ্যে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছিলো। ফাউন্ডেশনে কোয়ান্টিয়ার হিসেবে কাজ করা শুরু করলাম। নিজের ভালো ভালো গুণগুলো বিকশিত হচ্ছিলো। কিন্তু একটা সময় মনের অভ্যন্তরীণ ক্ষোভ আর ইগোর কারণে কাজ করা ছেড়ে দিলাম। শাখায় যাওয়াও অনেকটা কমিয়ে দিলাম। একটা সময় ফাউন্ডেশনে আসাই বন্ধ করে দিলাম। ফলে আমি সবক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে যেতে শুরু করলাম। আমার অনুপ্রেরণায় যারা কোর্স করেছিলো তারা আজ প্রো-মাস্টার অথচ আমি গ্রাজুয়েটই রয়ে গেলাম। এক ধরনের হতাশায় ডুবে আছি। আমি কীভাবে আবার সবকিছু শুরু করতে পারি?*

উত্তর : আসলে জীবন কিন্তু বার বার শুরু করার নাম। যেখানে পড়বেন, সেখান থেকে উঠে দাঁড়াবেন। যেখানে আছেন সেখান থেকে শুরু করবেন। আপনার ভুল হয়েছে–জীবনে ভুল হতেই পারে। কিন্তু জীবন তো ওখানেই শেষ হয়ে যায় নি। আপনি যেহেতু অনুভব করছেন, যখন ফাউন্ডেশনে জড়িত ছিলেন তখন সবদিক থেকে ভালো ছিলেন–আবার জড়িত হোন। ফাউন্ডেশন সবসময় আমাদের। সবার মঙ্গলের জন্যেই ফাউন্ডেশন।

প্রশ্ন : *আমার সিদ্ধান্ত খুব ঘন ঘন পরিবর্তন হয়, আমি অনেকটা প্রভাবিতও হই। কোনো সিদ্ধান্তে স্থির থাকতে পারি না। মনের মধ্যে অশান্তি লাগে। মেডিটেশন করছি কিন্তু এ সমস্যা থেকে বের হতে পারছি না। আমাকে পরামর্শ দিন।*

উত্তর : এর সমাধান খুব সহজ। সবসময় অটোসাজেশন চর্চা করবেন 'আমি সবসময় সঠিক সময়ে, সঠিক সিদ্ধান্ত নেবো এবং আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকবো।' আসলে এ অটোসাজেশন অনুশীলনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক অটোসাজেশনের উদ্ভাবক প্রফেসর এমিল কুয়ে, তার জন্মতারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারি। আমরা তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ১৯১০ সালে তিনি অটোসাজেশন চর্চা শুরু করেছিলেন। অটোসাজেশন চর্চার ১০০ বছর পূর্তি হলো ২০১০ সালে। অটোসাজেশন অত্যন্ত পরীক্ষিত। এটি মন্ত্রের মতো কাজ করে।

'জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন' বইটি সংগ্রহ করে নেবেন। নিজের জন্যে প্রয়োজনীয় অটোসাজেশনগুলো বাছাই করে মুখস্থ করে ফেলবেন। বিশেষ করে রাতে মেডিটেশন করে অটোসাজেশনগুলো দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়বেন। সারা রাত আপনার মস্তিষ্কে এটা অনুরণিত হবে। এখন থেকে এটা একটা নিয়মিত অনুশীলনে রূপান্তরিত করে ফেলুন। আপনি সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারবেন।

প্রশ্ন : *বিপরীত লিঙ্গের সাথে কথা বলতে জড়তা হয়। কোনো জরুরি কাজেও তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক হতে পারি না। কী করবো?*

উত্তর : আপনি মনের বাড়িতে সবসময় মনছবি দেখবেন যে, যাদের সাথে আপনার জড়তা রয়েছে তাদের সাথে আপনি খুব সহজ স্বাভাবিকভাবে কথা বলছেন। এটা অসম্ভব কোনো ব্যাপার না। প্রত্যেকটা মানুষ বিপরীত লিঙ্গের সাথে কথা বলছে। মায়ের সাথে, বোনের সাথে, সহকর্মীর সাথে কথা বলছে। অতএব আপনারও জড়তা থাকার কোনো কারণ নেই। সবসময় মনছবি দেখবেন আর অটোসাজেশন দেবেন যে, 'যেকোনো জায়গায় আমি যাই, যে কারো সাথে মিশি, সহকর্মী বা সমলিঙ্গ বা বিপরীত লিঙ্গ যে-ই হোক আমি সহজ স্বাভাবিকভাবে কথা বলবো।' এছাড়া যখনই জড়তা অনুভব করবেন, কোয়ান্টা ভঙ্গি করে কথা বলবেন। আপনি খুব সহজভাবে কথা বলতে পারবেন।

প্রশ্ন : *বিভিন্ন জায়গায় চাকরির পরীক্ষা দিতে যাওয়ার জন্যে আমার সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হয়। মাঝে মাঝে ভুল সিদ্ধান্ত নিই। এজন্যে কী করবো?*

উত্তর : নিয়মিত মেডিটেশন চর্চার সাথে সাথে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন জায়গায় চাকরির পরীক্ষা দিতে হবে কেন? চাকরির পরীক্ষা একবারই দেবেন। লক্ষ্য স্থির করবেন যে, আমি ওইখানে চাকরি করবো। একটা পরীক্ষা দেবেন এবং সেখানেই চাকরিতে জয়েন করবেন। আসলে নিজের ওপর বিশ্বাস হওয়া উচিত এইরকম। আপনার ভেতরের সেই শক্তি জাগ্রত করে তুলুন। দেখবেন, আপনার উপস্থিতিই আপনার জন্যে কাজ এনে দেবে।

পৃথিবীতে কাজের কোনো অভাব নেই, চাকরিরও কোনো অভাব নেই। কিন্তু কাজের লোকের অভাব সর্বত্র। আপনি যদি কাজ করতে চান, পৃথিবীর যেখানে যাবেন সেখানে কাজ করতে পারবেন। অতএব আপনি নিয়মিত মেডিটেশন করুন, আপনার মধ্যে এই বিশ্বাস জাগ্রত হবে যে, যেখানে যাবো আমি কাজ পাবো, মনের আনন্দে কাজ করবো এবং উপযুক্ত বেতন পাবো। আসলে চাকরি করাটা গুরুত্বপূর্ণ না, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কাজ করা।

এ মাসের অটোসাজেশন

আমি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলবো।
অশ্লীল ও ব্যঙ্গাত্মক শব্দ
বর্জন করবো।
সবার সাথে সদাচরণ করবো।

কোয়ান্টামমে আল্লামা শমশের আলী



২৬ জানুয়ারি ২০১৩ কোয়ান্টামের ধ্যানকেন্দ্র কোয়ান্টামম সফর করেন বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও লেখক আল্লামা ড. শমশের আলী। কোয়ান্টাদের পরিবেশনায় চমৎকার ব্যান্ড বাদন আর বিউগল এর সুর মূর্ছনায় স্বাগত জানানো হয় এই সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বকে।

একইদিনে তিনি কোয়ান্টামম মিলনায়তনে মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে সারাদেশ থেকে আগত প্রায় দেড়শত চিকিৎসকের সাথে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এতে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-এর সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার-এর প্রফেসর ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ।

২৭ জানুয়ারি সকালে ড. এম শমশের আলী কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ পরিদর্শন করেন। তিনি ক্লাসরুমগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং কোয়ান্টাদের সাথে বেশ আনন্দঘন কিছু সময় কাটান। নিজ হাতে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে কোয়ান্টাদের শেখান গণিতের নানা মজার কৌশল। সেখানে তিনি জাতীয় পর্যায়ে জিমন্যাস্টিকে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত কোয়ান্টাদের পারদর্শিতা উপভোগ করেন এবং কোয়ান্টাদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

সেদিন বিকেলে স্যার কসমো স্কুল আবাসিক মাঠে কোয়ান্টাদের প্যারেড ও ডিসপ্লে পরিদর্শন করেন এবং সালাম গ্রহণ করেন, কোয়ান্টামম মসজিদ ঘুরে দেখেন এবং নামাজ আদায় করেন। সন্ধ্যায় দরবারানে কোয়ান্টামমের কর্মীদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করেন 'কোরআন ও বিজ্ঞান' বিষয়ে। ২৮ জানুয়ারি সকালে তিনি কোয়ান্টামম থেকে ফেরতযাত্রা করেন।

২৮ জানুয়ারি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টার পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (স) উপলক্ষে বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ-এর শাহ আলম বীর উত্তম হলে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে আল্লামা ড. এম শমশের আলী 'মানবজাতির জন্যে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ (স)' বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেন।

কাকরাইলে কোয়ান্টাম গ্যালারির উদ্বোধন



১ জানুয়ারি ২০১৩ কাকরাইলের ওয়াইএমসিএ ভবনের ৩য় তলায় উদ্বোধন হলো মেডিটেশনভিত্তিক আলোকচিত্র ও স্লাইড এন্ড সাউন্ড শো-এর কোয়ান্টাম গ্যালারির। যা দেশে মেডিটেশনভিত্তিক একটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্যালারি।

এদিন সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক শ্রদ্ধেয়া মা-জী নাহার আল বোখারী গ্যালারিটি উদ্বোধন করেন। এ সময় ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান এবং বিভিন্ন সেন্টার ও শাখার মোমেন্টিয়ার, আর্ডেন্টিয়ার ও কোয়ান্টিয়ার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক এসোসিয়েট, গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার।

১৫০০ বর্গফুটের এ হলরুমটির চারপাশে রয়েছে ফটো গ্যালারি। গ্যালারি জুড়ে রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, সেলিব্রিটি ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের মেডিটেশনরত ছবি, যারা বিভিন্ন সময় কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। গ্যালারিতে প্রদর্শিত সব ছবি, স্লাইড শো-র ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এবং সার্বিক সাজসজ্জাসহ সবকিছুই করেছেন ফাউন্ডেশনের একদল উচ্ছল সৃজনশীল তরুণ কোয়ান্টিয়ার।

এ গ্যালারিতে প্রতিদিন আলোকচিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। এছাড়া মঙ্গলবার দিনব্যাপী স্লাইড এন্ড সাউন্ড শো এবং বিভিন্ন সময়ে ৪টি সেশনে প্রদর্শিত হচ্ছে ভিডিও ও তথ্যচিত্র। কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা সবান্ধব এ গ্যালারি ঘুরে যেতে পারেন।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ॥ জেএসসি ও পিএসসি-তে সবাই উত্তীর্ণ ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেলো ৩ জন

২০১২ শিক্ষা বছরে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল-এর পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সবাই উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে জেএসসি পরীক্ষায় ৩১ জন শিক্ষার্থীর চারজন 'এ-প্লাস', ২৪ জন 'এ', দুইজন 'এ-মাইনাস' এবং একজন 'বি' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়। পিএসসি-তে অংশগ্রহণকারী তিনজন শিক্ষার্থীর দুইজন 'এ-প্লাস' এবং একজন 'এ' পেয়ে উত্তীর্ণ হয়।

জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের তিন জন ট্যালেন্টপুলে এবং দুই জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ করে।

সুপ্রীম কোর্ট বার অডিটোরিয়ামে মেডিটেশন মেলা



১৪ জানুয়ারি সুপ্রীম কোর্ট বার অডিটোরিয়ামে ল'ইয়ার্স মেডিটেশন সোসাইটির উদ্যোগে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় মেডিটেশন মেলা। সকাল ১০টায় মেলার উদ্বোধন করেন এডভোকেট খান টিপু সুলতান এমপি। সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র এডভোকেট ব্যারিস্টার মো. আব্দুস সামাদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন এডভোকেট মো. মুনিরুজ্জামান।

মেডিটেশন শেষে আইনজীবীগণ মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং বিভিন্ন প্রকাশনা ও সিডি সংগ্রহ করেন। অনেকে ওয়েবসাইট থেকে তাৎক্ষণিক মোবাইলে মেডিটেশন ডাউনলোড করেন, মাটির ব্যাংক সংগ্রহ করেন। দিনব্যাপী প্রায় দেড় সহস্রাধিক দর্শনার্থী এ মেলা পরিদর্শন করেন।

জিমন্যাস্টিকসে কোয়ান্টাদের ১৫টি পদক জয়

১৭ জানুয়ারি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আয়োজিত তিন দিনব্যাপী 'বয়স ভিত্তিক (বালক ও বালিকা ১৪ বছর পর্যন্ত) এবং ৩২ তম জাতীয় সিনিয়র জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতা-২০১৩'য় প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল। জাতীয় জিমন্যাস্টিকস স্টেডিয়ামে এর উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সচিব নূর মোহাম্মদ। প্রতিযোগিতায় ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা ক্রীড়া সংস্থার শতাধিক প্রতিযোগী অংশ নেয়।

অনূর্ধ্ব-৮ এবং ৮-৯ বছর বয়সভিত্তিক এ দুটি দলে কোয়ান্টারা অংশগ্রহণ করে ফ্লোর ম্যাটস, প্যারালাল বারস ও ভল্টিং টেবিল ইভেন্টে। কোয়ান্টারা বয়সভিত্তিক দুটি দলের ইভেন্টগুলো শেষে অর্জন করে মোট ১৫টি পদক। এর মধ্যে পাঁচটি স্বর্ণ, সাতটি রৌপ্য ও তিনটি ব্রোঞ্জপদক। বয়সভিত্তিক অনূর্ধ্ব-৮ গ্রুপে সত্যজন ত্রিপুরা ভল্টিং টেবিল এবং নিঝুম খিসা ফ্লোর ম্যাটস ইভেন্টে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করে। ৮-৯ বছর বয়স গ্রুপে সাংখে অং খুমি কিতং ফ্লোর ম্যাটস ও প্যারালাল বারস ইভেন্টে প্রথম হয়ে অর্জন করে দুটি স্বর্ণপদক।

আবশ্যক

বান্দরবানের লামায় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ-এর জন্যে গান ও নাচের শিক্ষকসহ বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক আবশ্যক। লামা সেন্টারের জন্যে ব্রাদার, সিকিউরিটি গার্ড, পিয়ন, মাঠকর্মী, প্যারামেডিকস, সিস্টার, আয়া ও বুয়া আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে সিভি পাঠানোর জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছে। যোগাযোগ :

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

সিলভার ও গোল্ডেন ক্লাব সদস্যদের সম্মাননা অনুষ্ঠানে সৈয়দ শামসুল হক

রক্তদাতারা প্রতিনিয়ত পুণ্য অর্জন করছেন



শ্বাস গ্রহণ করাটাই কিন্তু বেঁচে থাকা নয়। বেঁচে থাকা হলো অন্যের জন্যে ভাবা, অন্যের কল্যাণে কাজ করা। পরের জন্যে যারা নিঃস্বার্থভাবে ভাবতে পারেন তারাই প্রকৃত অর্থে বেঁচে আছেন। কারণ একজন মানুষকে বাঁচাতে পারলে সমগ্র মানবজাতিকেই যেন বাঁচানো হয়। যারা রক্ত দিচ্ছেন তারা প্রতিনিয়ত এরকম পুণ্য অর্জন করছেন। আমরা যদি চেতনা দিয়ে অনুভব করতে পারি–আমার জীবন আমার কাছে যেমন মূল্যবান তেমনি অন্যের জীবনও, তাহলে স্বেচ্ছায় রক্তদানের কাজটি আমাদের করতেই হবে।

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের উদ্যোগে গত ১১ জানুয়ারি দশম সিলভার ও অষ্টম গোল্ডেন ক্লাব সদস্যদের সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক।

জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় এ সম্মাননা। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বলেন, রক্ত আমাদের শরীরের ভেতর দিয়ে অক্সিজেনকে বহন করে শরীরকে জীবিত রাখে। রক্তের মতো একটা মহামূল্যবান উপাদান কোনো শর্ত ছাড়া স্বেচ্ছা রক্তদাতারা দান করছেন মানুষের জন্যে। আমার বিশ্বাস, স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের এ দানের কল্যাণে একটা সময় আমাদের দেশ স্বেচ্ছা রক্তদানে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এবং স্বেচ্ছা রক্তদানে মানুষকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম যে কাজ করে যাচ্ছে তা সফলতার সাথে এগিয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ও কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের অনারারি পরিচালক প্রফেসর ডা. এ বি এম ইউনূস, সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারী।

এ আয়োজনে ২৫ বার রক্ত দিয়েছেন এমন ১২ জন ডোনারের প্রত্যেককে দেয়া হয় নিজ নিজ ছবি সম্বলিত সুদৃশ্য গোল্ডেন ক্রেস্ট। ১০ বা এর অধিক বার রক্ত দিয়েছেন এমন ছয়জন মহিলা ডোনারসহ মোট ১৮৭ জন সিলভার ক্লাব সদস্যকে দেয়া হয় সার্টিফিকেট, বিশেষ আইডি কার্ড ও মেডেল।

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব প্রকাশিত নতুন বই

এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ



কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে একটি নতুন বই–'এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ'। করোনারি হৃদরোগের কারণ এবং এর নিরাময় ও প্রতিরোধের বিস্তারিত উপায় নিয়ে সংকলিত এ বইটি প্রথমদিন থেকেই স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ ও সর্বস্তরের পাঠকের মাঝে দারুণ সাড়া জাগিয়েছে।

হৃদরোগ নিরাময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সংকলিত এ বইটিকে এককথায় বলা যেতে পারে, এ বিষয়ে এটি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হৃদরোগ বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ একটি বই। সদ্যপ্রকাশিত এ বইটির শুরুতেই রয়েছে করোনারি হৃদরোগ নিয়ে দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় তিনজন চিকিৎসাবিজ্ঞানীর গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা ও অভিমত, সেইসাথে দেশের একজন বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের একটি নিবন্ধে উঠে এসেছে করোনারি হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থার নানা সীমাবদ্ধতা।

গত কয়েক দশকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারায় এনজিওপ্লাস্টি, বাইপাস সার্জারি, রোবোটিক সার্জারিসহ করোনারি হৃদরোগের অনেকরকম চিকিৎসাপদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটেছে সত্যি, কিন্তু এর কোনোটিই আসলে হৃদরোগীদের স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ সমাধান দিতে পারছে না। সমস্যা শেষপর্যন্ত থেকে যাচ্ছে সমস্যার জায়গাতেই। করোনারি হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ নিয়ে তাই বিশ্বজুড়ে চলছে নানা গবেষণা। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বজুড়ে আধুনিক ধারার চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন, করোনারি হৃদরোগ নিরাময়ে চাই সঠিক জীবনদৃষ্টি ও সুস্থ জীবনাচার। আর এজন্যে প্রয়োজন সমন্বিত জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণ। মূলত সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যেই কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব এ বইটি প্রকাশ করেছে।

'এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ' বইটি সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন ডা. মনিরুজ্জামান ও ডা. আতাউর রহমান।

মার্চ ২০১৩-এর কার্যক্রম

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম
: ৮ ও ৯ মার্চ

কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রম
: ৮ ও ৯ মার্চ (পুরুষ)
: ২৯ ও ৩০ মার্চ (মহিলা)

জীবনে সফল হওয়ার পথ প্রথমায়ন
কেন্দ্র : ১৫ ও ১৬ মার্চ
উত্তরা : ২৯ ও ৩০ মার্চ

কোয়ান্টামম ধ্যানসাফারি : ১৫ ও ১৬ মার্চ

কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী কার্যক্রম
মিরপুর : ১৫ ও ১৬ মার্চ

কোয়ান্টাম বেসিক কম্পিউটিং প্রোগ্রাম
: ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ মার্চ

কোয়ান্টাম বেসিক হার্ডওয়্যার প্রোগ্রাম
: ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ মার্চ

কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি কার্যক্রম
বরিশাল : ৮ ও ৯ মার্চ
রাজশাহী : ১৫ ও ১৬ মার্চ
কেন্দ : ২৯ ও ৩০ মার্চ

কোয়ান্টাম বুলেটিন : মার্চ ২০১৩ ॥ সম্পাদক : কাজী মাহ্তাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য– ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 8319377, 8391391 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন

এপ্রিল ২০১৩

বর্ষবরণ ১৪২০

বাংলা বর্ষ ১৪২০-কে বরণ করে নিতে নব উদ্দীপনায় দেশব্যাপী কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেলগুলোয় শুরু হয়েছে বর্ষবরণের প্রস্তুতি। এদিন বাংলা বছরের প্রথম সূর্যোদয়কে স্বাগত জানানো হবে সুখী জীবন মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে। সেইসাথে থাকবে আলোচনা আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলের কার্যালয় ছাড়াও উন্মুক্ত মাঠ, পার্ক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা হবে এ বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। নতুন বছরের প্রতিটি দিন হয়ে উঠুক প্রশান্তিময়, সবার জীবনে সুস্থতা আর প্রাচুর্য আসুক সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায়–কোয়ান্টাম পরিবারের সবার প্রতি এ শুভকামনা জানান ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মা-জী নাহার আল বোখারী।

১৯ ও ২০ এপ্রিল মাটির ব্যাংক হালখাতা উৎসব

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে ১৯ ও ২০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মাটির ব্যাংক হালখাতা উৎসব। এ লক্ষ্যে সেন্টার শাখা সেলে শুরু হয়েছে ব্যাপক কর্মপ্রস্তুতি। আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিতরণকৃত মাটির ব্যাংক সংগ্রহ ও জমাদান শুরু হয়েছে এখন থেকেই।

১৯ ও ২০ এপ্রিল ছাড়াও মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে মাটির ব্যাংক সংগ্রহের এ উৎসব। আশেপাশের সবাইকে দানের এ কল্যাণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে এবং বঞ্চিতের সেবায় প্রতিটি ঘরে ঘরে মাটির ব্যাংক পৌঁছে দেয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কোর্স

ঢাকা : ৩৫৯ তম ব্যাচ
১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ এপ্রিল
চট্টগ্রাম : শোকরান শোকরান ৩৬০
২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯ এপ্রিল
ভেন্যু : ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট
মিলনায়তন, চট্টগ্রাম

এপ্রিলের কর্মসূচি

কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ
: ৫ এপ্রিল
কোয়ান্টামম প্রো-মাস্টার্স কোয়ান্টায়ন
: ৪, ৫ ও ৬ এপ্রিল
: ১২, ১৩ ও ১৪ এপ্রিল
কোয়ান্টামম ধ্যানসাফারি
: ১৯ ও ২০ এপ্রিল

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান

মানুষকে ভালো না বাসলে দেশকে ভালবাসা যায় না



রক্তদাতাদের উদ্দেশ্যে তিনি আরো বলেন, আপনারা রক্ত দিয়ে মানুষের জীবন বাঁচিয়েছেন। তাই বলা যায়, আপনাদের অবস্থান জীবনের সপক্ষে, মানবতার সপক্ষে। আপনাদের দেখে মনে আশা জাগে–এ দেশেও মানুষ আছে, যারা জীবনকে ভালবাসে, মানুষকে ভালবাসে এবং প্রকৃত অর্থেই দেশকে ভালবাসে।

আর এরকম একটি মহৎ কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে আমি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই।

বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. এমরান কবির চৌধুরী বলেন, নৈতিকতার উন্নত স্তরে পৌঁছালেই কেবল একজন মানুষ অন্যের জন্যে এতবার রক্তদান করতে পারে। আমি আশা করি, আজ এখানে উপস্থিত তিনশ মানুষের এই ভালো কাজ একদিন তিন কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন আচার্য ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল। এতে সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারী।

আমরা যদি মানুষকে ভালবাসতে না পারি, জীবনকে ভালবাসতে না পারি তাহলে দেশকেও ভালবাসতে পারবো না। তখন আমাদের দেশপ্রেম একটা মিথ্যাচারে পরিণত হয়ে যাবে। মানুষকে ভালবেসে মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাওয়াই সত্যিকার দেশপ্রেম। মানুষকে ভালো না বাসলে কখনো দেশকে ভালবাসা যায় না।

১৬ মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান। এতে ১০ বার রক্তদান করেছেন এমন ২২০ জন সিলভার ক্লাব ডোনার ও ২৫ বার রক্তদান করেছেন এমন ছয়জন গোল্ডেন ক্লাব ডোনারকে সম্মাননা জানানো হয়।

প্রধান অতিথি ড. মিজানুর রহমান বলেন, আজকের বাংলাদেশে রক্ত দেয়ার দুটো ধারা প্রবহমান। একটি হলো, মানব কল্যাণে স্বেচ্ছায় রক্তদান আর অন্য ধারাটি হলো সহিংসতার। স্বভাবতই আমরা প্রথম ধারার পক্ষে। কারণ, পরার্থে রক্তদান করছেন যারা, তারা সত্যিকার অর্থেই সমাজের জন্যে, দেশের জন্যে কাজ করছেন।

অনুষ্ঠানে সম্মাননা প্রাপ্ত স্বেচ্ছা

সম্মিলিত চাওয়ার শক্তি অনেক

খালেদ খান



কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে একটা বোধোদয় হয়েছে আমার। সেটা হলো এনার্জি লেভেল। সম্মিলিতভাবে অনেক মানুষ যখন কিছু চায়, তা কত শক্তিশালী হতে পারে সেটা আন্দাজ করে গেলাম আমি এখানে এসে।

আমাদের চারপাশে শিক্ষক অনেক কিন্তু 'মাস্টার' পাওয়া যায় খুব কম। গুরুজী এ কোর্সের মাধ্যমে বহু বছর ধরে অনেককে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। ইতিবাচকভাবে আমরা কতটা পরিবর্তিত হতে পারলাম সে দায়ভারটা আমাদেরই। কারণ মেডিটেটিভ মানুষের শক্তি অনেক বেশি।

এ কোর্সে আমরা যতজন মানুষ আছি, তারা প্রত্যেকে যদি জীবনযাপনের মধ্যে সেই ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারি, সেটার শক্তি হবে অনেক। আমরা যারা এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে যাচ্ছি আমাদের অযোগ্যতাটাকে যাতে আরো সক্ষমতার জায়গায় তুলে দেন–এই আবেদন করছি গুরুজীর কাছে।

[বিশিষ্ট নাট্যজন ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব খালেদ খান। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৩৫৭ ব্যাচে অংশগ্রহণ করে প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথাগুলো বলেন]

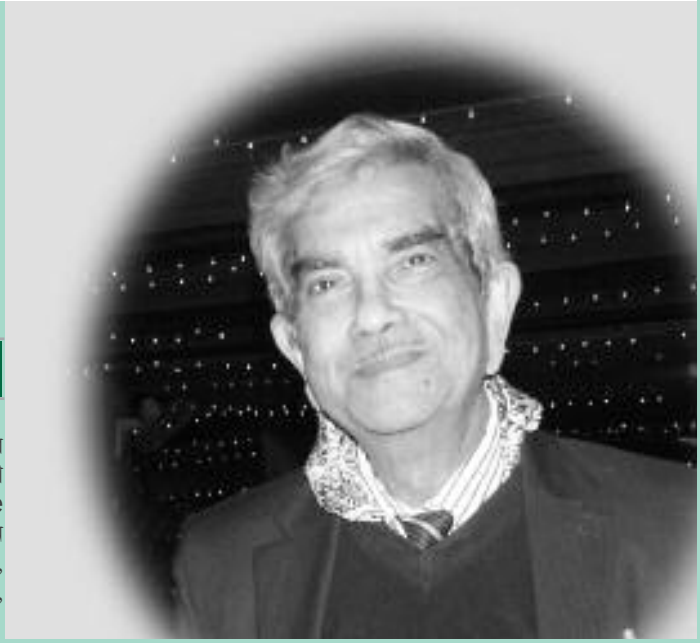
এপ্রিলের কার্যক্রম

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম
বনানী : ৫ ও ৬ এপ্রিল
কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি কার্যক্রম
কোয়ান্টামম : ৫ ও ৬ এপ্রিল
কুমিল্লা : ১২ ও ১৩ এপ্রিল
কেন্দ্র : ১৯ ও ২০ এপ্রিল
জীবনে সফল হওয়ার পথ প্রথমায়ন
গাজীপুর : ১২ ও ১৩ এপ্রিল
বনশ্রী : ১৯ ও ২০ এপ্রিল
কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রম
পুরুষ : ১৯ ও ২০ এপ্রিল
মহিলা : ২৬ ও ২৭ এপ্রিল
কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী কার্যক্রম
কেন্দ্র : ২৬ ও ২৭ এপ্রিল
কোয়ান্টাম বেসিক কম্পিউটিং প্রোগ্রাম
কোয়ান্টাম বেসিক হার্ডওয়্যার প্রোগ্রাম
: প্রতি শুক্র - সোমবার

প্রফেসর ড. জামাল নজরুল ইসলাম। সদ্যপ্রয়াত এই গাণিতিক-পদার্থবিজ্ঞানী মহাবিশ্বের উদ্ভব ও পরিণতি নিয়ে মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে ছিলেন বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি গবেষণা ও শিক্ষকতা করেছেন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি, ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ও ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলোতে। ১৯৮৩ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত ও বিজ্ঞানের জগতে বহুল সমাদৃত তার 'দি আলটিমেট ফেট অব দি ইউনিভার্স' বইটি অনূদিত হয় একাধিক ভাষায়। জে এন ইসলাম নামে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান এই বিজ্ঞানীর চিন্তা আর ভালবাসার অনেকটা জুড়ে ছিলো বাংলাদেশ। তাই বিশ্বমানের সব গবেষণাগারে কাজ করার হাতছানি পেছনে ফেলে দেশে ফিরে আসেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে তোলেন 'গণিত ও ভৌতবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র'। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও তিনি রেখেছেন অনন্য সাধারণ ভূমিকা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমিরেটাস ও একুশে পদকে ভূষিত ড. ইসলাম ২০০৯ সালের ৬ মে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারে আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন। সে অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ ও পরবর্তীতে নেয়া সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আমাদের এবারের প্রতিবেদন। আমরা তার অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

ধ্যান ও শান্তির বাণী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হবে

বিজ্ঞানী ড. জামাল নজরুল ইসলাম



কারো কারো মধ্যে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, বিজ্ঞানীরা বুঝি ধর্মের বিরোধিতা করেন। এ ধারণার পেছনে কী যুক্তি আছে জানি না, তবে কথাটা কিন্তু সঠিক নয়। খোদ আইনস্টাইন বলেছেন–Religion without science is blind and science without religion is lame. অর্থাৎ বিজ্ঞান ব্যতীত ধর্ম অন্ধ আর ধর্ম ব্যতীত বিজ্ঞান পঙ্গু। আমি বিশ্বাস করি না যে, আইনস্টাইন কেবল ভদ্রতার খাতিরে ধর্মের প্রশংসা করেছেন; বরং বলা যায়, তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি থেকেই তিনি এমনটি বলেছেন।

বিশ্বজুড়ে সমসাময়িক ঘটনাবলি দেখে একটি কথাই মনে হয় যে, মানুষ এখন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দৈত্য কিন্তু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বামন। মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালনা ও সুদূরপ্রসারী প্রয়োজনের তাগিদে একটি ব্যাপক আত্মিক ও ধর্মীয় মনোভাবের সূত্রপাত ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু যথেষ্ট কার্যকরভাবে আমরা এর বিকাশ ঘটাতে পারি নি। যার ফলাফল হলো পৃথিবীজুড়ে আজকের এত সহিংসতা। আমি নিজে বিশ্বাস করি–ধর্ম এমন একটি চমৎকার কাঠামো ও ব্যবস্থা, যা মানুষের নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নের দিকে নিয়ে যায়।

পবিত্র হাদীসের বাণীগুলো আমার খুব ভালো লাগে। যার মধ্যে একটি হলো–'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর'। এছাড়াও বলা হয়েছে, 'জ্ঞান অর্জনের জন্যে প্রয়োজনে চীন দেশে যাও'। তৎকালীন চীনের ধর্ম, জীবনধারা ও সংস্কৃতি ছিলো আরবের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবু জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে চীনে যাওয়ার আহ্বান নিঃসন্দেহে নবীজী (স)-এর উদার মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটায়। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমানরা সেই উদার মনোভাবের অনেকটাই হারিয়ে ফেলে।

একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে/ হেনেছে নিঃসহায়ে'। এই 'গোপন হিংসা' অতীতে এবং বর্তমানে বহু দেশে, বহু জনপদে মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে অশান্তি, বর্বরতা। শুধু বিংশ শতাব্দীতেই সংঘটিত দুই মহাযুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রায় পাঁচ কোটি নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। যার মধ্যে আড়াই কোটিই ছিলো নারী ও শিশু, এরা কোনোভাবেই যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো না।

পবিত্র কোরআনে বার বার বলা হয়েছে, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। কিন্তু আমরা প্রায় সব দিকেই যথেষ্ট সীমালঙ্ঘন করেছি এবং করছি। বিশ্বব্যাপী অস্ত্র বিক্রির জন্যে তথাকথিত উন্নত দেশগুলো আজ পাগল হয়ে উঠেছে। আর আমরা পরিণত হয়েছি তাদের নির্বোধ শিকারে। কিন্তু এ পরিস্থিতির পরিবর্তন দরকার। আর এজন্যে প্রয়োজন সচেতনতার।

আধুনিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এমন কিছু সমস্যা সৃষ্টি করেছে যার সমাধান শুধুমাত্র বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানীদের দ্বারা সম্ভব নয়। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে বিপুল পরিমাণে ভোগ্য ও বিলাসদ্রব্য এখন উৎপাদিত হয়, যা সমাজের চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি। এরই পরিণাম হচ্ছে মাত্রাজ্ঞানহীন অপচয় আর পরিবেশ দূষণ। ফলে আবির্ভাব ঘটেছে একটি ভোগবাদী সমাজের। শুধু তা-ই নয়, প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার এবং অত্যাচার-নিপীড়নের নানা পদ্ধতিরও উদ্ভব ঘটেছে।

এই অত্যাচার-নিপীড়ন আর শোষণের প্রক্রিয়া চলে নানান রকমে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দারিদ্র বিমোচনের নামে চলে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা। চলে বিভিন্ন এনজিও-র মাধ্যমে বৈদেশিক সাহায্যের ছড়াছড়ি। বাংলাদেশেও তা-ই। কিন্তু আমরা বিদেশি হস্তক্ষেপ চাই না। স্বাধীন দেশে মুক্তভাবে নিঃশ্বাস নিতে চাই। বিদেশি সংস্থাগুলো একদিকে সাহায্য দেয়, আবার অন্যদিকে কনসালটেন্সির নামে তারা-ই এর বিরাট অংশ ভোগ করে। এ ভিক্ষাবৃত্তিক সংস্কৃতি থেকে যেভাবেই হোক বেরিয়ে আসা চাই আমাদের।

বিদেশি মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর কথায় আসি। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্য, জাতীয় অর্থনীতি এবং সেইসাথে জাতীয় কর্মঘণ্টার ওপর চরম আঘাতকে আমরা বিনা বাধায় গ্রহণ করে নিয়েছি। এছাড়াও স্বাস্থ্যের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর বিভিন্ন খাবার ও কোমল পানীয়ের বিজ্ঞাপন আমাদের মিডিয়াগুলোতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে। আমরা প্রতিবাদ করছি না, করতে পারছি না। কিন্তু এসব বর্জন ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মানসিকতা সৃষ্টিতে আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে জনকল্যাণমূলক সচেতনতা সৃষ্টি করছে বলে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে আমি সাধুবাদ জানাই।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মেডিটেশন বা ধ্যানচর্চায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তুলছে। মেডিটেশন অত্যন্ত ইতিবাচক একটি বিষয়। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মেডিটেশনের চর্চা হয়ে আসছে। ধর্মের একটি অঙ্গ হচ্ছে এই চিন্তা বা ধ্যান। কারণ, প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে কোনো না কোনোভাবে রয়েছে ধ্যানের প্রভাব।

মেডিটেশন বা ধ্যানের গুরুত্ব রয়েছে প্রত্যেক মানুষের জীবনেই। কারণ, ধ্যানেই শক্তি, ধ্যানেই মুক্তি, ধ্যানেই মানুষের সকল অর্জন। তাই আমাদের ধ্যান ও শান্তির বাণী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হবে।

বর্তমানে দেশে-বিদেশে সর্বোপরি সারা পৃথিবীজুড়ে এত যে অবক্ষয়, সন্ত্রাস আর দুর্নীতি–এজন্যে শুধু যে খারাপ লোকেরা দায়ী তা নয়; এর অন্যতম কারণ হলো, আমরা ভালো মানুষেরা সঙ্ঘবদ্ধ নই। তাই পরস্পরকে দোষারোপ করে নয়; বরং একত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ভালো কিছু কাজ করার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলতে পারি।

পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সেবার ক্ষেত্রে চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে কোয়ান্টাম। এটি অবশ্যই সমাজে একটি ইতিবাচক প্রভাব রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। আর সে কারণেই কোয়ান্টামের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : দিলরুবা খানম

আপনার স্ট্রেস-এর শিকার হতে পারে আপনার পরবর্তী প্রজন্ম!



নিতান্তই ছোটখাটো কোনো কারণে আজ হয়তো আপনি একটু অস্থিরতায় ভুগছেন, মানসিক চাপ বোধ করছেন, সবমিলিয়ে হয়তো কিছুটা স্ট্রেস-আক্রান্ত আপনার মন। জেনে রাখুন, এ যে কেবল আপনারই ক্ষতি করছে তা নয়, এর প্রভাব হতে পারে সুদূরপ্রসারী–আপনার আজকের স্ট্রেস ভোগাতে পারে আপনার পরবর্তী প্রজন্মকেও!

ইঁদুরের ডিএনএ স্ক্যান করে সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এ তথ্য দিয়েছেন। তাদের মতে, একজন মানুষের বর্তমানের স্ট্রেস যে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও ক্ষতির কারণ হতে পারে–এ গবেষণার ফলাফল তা-ই প্রমাণ করে। শুধু তা-ই নয়, পারিপার্শ্বিক নানা বিষয়, যেমন : ধূমপান, খাদ্যাভ্যাসের ধরন ইত্যাদির পাশাপাশি শৈশবের মানসিক চাপও এক্ষেত্রে একই রকম ভূমিকা পালন করে থাকে।

স্ট্রেস বা অন্য যেকোনো কারণে ডিএনএ-তে যে কিছু চিহ্ন (Marking) থেকে যায়, তা সময়ের সাথে সাথে একসময় পুরোপুরি মুছে যায়, অর্থাৎ শুক্রাণু ও ডিম্বাণু পূর্ণবয়স্ক হতে হতে তা মোটামুটি আগের অবস্থাতেই ফিরে আসে–এতদিন জিনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিলো এটাই। আর যদি তা না-ও হয়, তবে পরবর্তীকালে ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার সময় স্ট্রেস-এর কারণে সৃষ্ট প্রভাব ঠিকই মুছে যায়। কিন্তু একাধিক গবেষণার ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা এখন তাদের ধারণা পাল্টাতে শুরু করেছেন।


Stresses in your life may affect future generation

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জেমি হ্যাকেট-এর নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী সম্প্রতি এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান করেন। জিন-এর প্রাথমিক পর্যায় থেকে পরিপূর্ণ হওয়ার প্রতিটি ধাপ তারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।

তারা বলেন, খুব অল্প সংখ্যক জিন-এ শেষপর্যন্ত কিছুটা চিহ্ন থেকেই যায়। সংখ্যাটা এমন–একটি জননকোষে থাকা ২৫,০০০ জিন-এর মধ্যে গড়ে প্রায় ২৩৩টি জিনে স্ট্রেস-এর প্রভাব রয়ে যেতে পারে। হ্যাকেট ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতে, বংশপরম্পরায় এর প্রভাব পড়তে পারে আপনার পরবর্তী প্রজন্ম অবধি।

পুরো প্রক্রিয়াটি কীভাবে ঘটে–সে বিষয়ে এখনো সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হতে না পারলেও, যেটুকু বোঝা গেছে তাতে বিজ্ঞানীরা বেশ উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। জুরিখের সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-র গবেষক ইসাবেলা ম্যানসুই এ বিষয়ে তার দীর্ঘ গবেষণার পর বলেন, স্ট্রেস-এর প্রভাব চলতে পারে এমনকি পরবর্তী দুই প্রজন্ম পর্যন্ত।

নিউসায়েন্টিস্ট (২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩) অবলম্বনে

ডা. আতাউর রহমান

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আসসালামু আলাইকুম। আশা করি মা-জীসহ সবাইকে নিয়ে পরম করুণাময়ের অশেষ রহমতে বেশ ভালো আছেন। আমরাও আপনার দোয়ায় বেশ ভালো আছি।

গুরুজী, আপনি জানেন যে, ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে কোয়ান্টাম চেতনার আলোকে পরীক্ষামূলকভাবে আমি 2D এনিমেশন এর কাজ শুরু করি। এরপর ২০১১-এর অক্টোবর থেকে 3D এনিমেশন-এর কাজ শুরু করি। এ পর্যন্ত প্রায় ১০টি এনিমেশন করেছি এবং আপনার অনুমতিক্রমে লন্ডনসহ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন প্রোগ্রামে তা দেখানো হয়।

আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, এনিমেশন সংক্রান্ত এ কাজগুলো আমি নিজের চেষ্টায় শিখেছি কোনোরকম প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেনিং ছাড়াই। আমি লক্ষ করেছি যে, কাজের প্রতি ভালবাসা আর আগ্রহ আমাকে আপাত কঠিন একটি বিষয় জানা অনেক সহজ করে দিয়েছে। কাজটি অনেক সময়সাপেক্ষ যা তৈরি করতে আমাকে শত শত ঘণ্টা ব্যয় করতে হয়েছে। প্রবাসের শত ব্যস্ততার মাঝে সব কাজ ঠিক রেখেও তা করতে পেরেছি। এমনও হয়েছে কাজের নেশায় নির্ঘুম কাটিয়েছি অনেক রাত।

গুরুজী, সম্প্রতি এনিমেশন সংক্রান্ত অর্জিত কিছু সাফল্য এ চিঠিতে উল্লেখ করছি–

২৪ অক্টোবর ২০১২-তে লন্ডনের সিক্স অরেনজ ডকুমেন্টারি ফার্মে কনট্র্যাক্ট জব পেলাম 3D এনিমেটর হিসেবে। মাত্র ৩০ সেকেন্ডের একটি ক্লিপের জন্যে তারা আমাকে অফার করেছে ৪৫০ পাউন্ড।

লন্ডনের বাংলা টিভিতে 'সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন, কর্মব্যস্ত সুখী জীবন' ও 'A Positive Sign' এনিমেশন দুটি নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে।

২০১২-এর মার্চে অনুষ্ঠিত আমার M.Sc final thesis-এ এনিমেশনের ব্যবহারে আমি Thesis-এ ডিস্টিংশন পেয়েছি এবং সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ্। আপনি জেনে খুশি হবেন যে, M.Sc কোর্সে আমি সফলভাবে PGD (Post Graduate Diploma) সম্পন্ন করেছি ও পাঁচটি সাবজেক্টের চারটিতেই ডিস্টিংশন মার্ক পেয়েছি।

M.Sc পড়াকালীন ডিস্টিংশন পাওয়ায় আমার ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর একটি কলেজে আমাকে এনিমেশনের ওপর অনারারি লেকচারার হিসেবে পাঠান। সেখানে দুদিন ছাত্রদের এনিমেশন টুলস নিয়ে পড়িয়েছিলাম। পরবর্তীতে আমার শেখানো সফটওয়্যারে শিক্ষার্থীরা এনিমেশন প্রজেক্ট করে যা স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবি নি।

লন্ডনে অবস্থানরত বুয়েটের প্রফেসর ড. রেজাউল করিম আমার কাজ দেখে চট্টগ্রামে Greentech Institute of Technology (প্রস্তাবিত)-এর ওপর সরকারি পর্যায়ে প্রেজেন্টেশনের জন্যে ১৫ মিনিটের এনিমেশন তৈরির প্রস্তাব দেন। সফলভাবে সেটি করার পর বাংলাদেশের সরকার প্রতিনিধিদের এ এনিমেশন প্রেজেন্টেশনটি দেখানো হয়।

ইউএসএ-এর ভার্চুয়াল সেল-এর বার্ষিক ওয়ার্কশপ, অস্ট্রেলিয়ায় সাদাকায়নে কয়েকটি এনিমেশন দেখানো হয়। 'সন্তান যখন সম্পত্তি' এনিমেশনটি কিশোর/ কিশোরীদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এখনো এ বিষয়ে প্রচুর ইমেইল আমি পাচ্ছি। অনেক বাচ্চার মা আমাকে ফোন করে, ইমেইলে এনিমেশন-এর লিঙ্ক চাইছেন। এনিমেশনগুলো বর্তমানে ইউটিউবে আপলোড করা আছে।



গুরুজী, এ সাফল্যগুলোকে গ্রাউন্ড জিরো করে নতুন বছরে আরো অগ্রসর হতে চাই। আমার মনছবি টেলিভিশন চ্যানেলে কোয়ান্টাম চেতনার আলোকে শিক্ষামূলক এনিমেটিক শর্ট ফিল্ম, ডকুমেন্টারি তৈরি করা, যা থেকে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের সন্তানেরা উপকৃত হতে পারবে।

এছাড়াও ইউরোপে টিভি চ্যানেলগুলোতে এনিমেশনের ওপর কমার্শিয়াল এড, ডকুমেন্টারি ও শর্টফিল্মের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। গুরুজী, আমি এ পথে এগুতে চাই। কারণ এনিমেশন করা ও এ বিষয়ে জানতে আমার খুব ভালো লাগে।

কোয়ান্টামের জন্যে এনিমেশন করতে গিয়ে তার প্রভাব আমার রেজাল্ট ও ক্যারিয়ারে এত চমৎকারভাবে পড়বে–এটি আমার কাছে সত্যিই অপ্রত্যাশিত ছিলো। এজন্যে আপনার প্রতি জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমার জন্যে দোয়া করবেন গুরুজী।

তন্ময় আহমেদ

১৭৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট, লন্ডন শাখা

গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি এ কোর্সের শিক্ষা

ইবরার টিপু



আমি একজন সংগীত শিল্পী। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া যে, এ সৌভাগ্য আমাকে তিনি দিয়েছেন। সংগীত পেশা থেকে জীবনের অনেক বড় প্রাপ্তি আমি পেয়েছি। জীবনের সর্বোচ্চ সুযোগ হিসেবে আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো গত বিশ্বকাপ-এর মিউজিক করার। ভেবেছিলাম, এটাই বুঝি আমার সর্বোচ্চ প্রাপ্তি।

কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে আমার সে ধারণা পরিবর্তন হয়ে গেল। নিজের দিকে তো আমরা কখনো তাকাই না। এখানে এসে নিজের দিকে তাকানোর সুযোগ হয়েছিলো। আমি অনুভব করেছি, এ কোর্স থেকে আমি যতটুকু শিক্ষা পেয়েছি, যতটুকু আমার অর্জন–এটাই আসলে আমার জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি।

[ইবরার টিপু, বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী ও সংগীত পরিচালক। ৩৫৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ভাইভায় ছিলাম স্বতঃস্ফূর্ত

মো. তাওহিদুল ইসলাম



আমি ছিলাম প্রচণ্ড রকম নেতিবাচক একজন মানুষ। কিছু করতে গেলেই ভাবতাম–আমি এটা পারবো না, আমাকে দিয়ে হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো একটি বিষয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ হওয়া সত্ত্বেও সবসময় আমার মধ্যে হীনম্মন্যতা কাজ করতো।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২য় দিন থেকে আমার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগলো। কোর্সের ৪র্থ দিন সকালে ইউনিভার্সিটিতে আমার ভাইভা ছিলো। প্রস্তুতি অনেক ভালো থাকার পরও ভয়ে আমার বুক কাঁপছিলো। হঠাৎ আমার মনে হলো, কোর্সে দুদিনে কী শিখলাম আমি! ভয় পাচ্ছি কেন? ঠিক সেই মুহূর্তে কোয়ান্টা ভঙ্গি করে মনে মনে অটোসাজেশন দিলাম–'আমি সাহসী। আমি সাহসী। আমি পারবো।' মুহূর্তে সব ভয় দূর হয়ে গেল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, ভাইভা বোর্ডে আমি এতটা সাবলীল এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষকদের প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছি যতটা সহজভাবে আমি বাসায়ও কথা বলি না। কোর্সটি করতে পেরে আমি সত্যি পরিতৃপ্ত। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। হৃদয়ের সবটুকু বিশালত্ব দিয়ে আমি গুরুজীর দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

[মো. তাওহিদুল ইসলাম, বিবিএ, ২য় বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৫৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

রিটার্ন পাবো লক্ষ টাকার

এম এ এস রানা



এক বন্ধুর পরামর্শে 'হাজারো প্রশ্নের জবাব' বইয়ের প্রথম খণ্ডটি সংগ্রহ করি। বইটি পড়ে আমার মনে হলো, কোয়ান্টামের এই কোর্সে অংশগ্রহণ সবার জন্যেই জরুরি। বাসা থেকেও ইতিবাচক সাড়া পেলাম। অফিসে একটি মিটিংয়ে আমার সহকর্মীদের কাছে বইটির কিছু অংশ উপস্থাপন করলাম। সেখানে ছিলো, উন্নত বিশ্বে বড় বড় কারখানায় শ্রমিকরা মেডিটেশন করে। এমনকি অনেক কোম্পানি শ্রমিকদের মনোযোগ বৃদ্ধি ও কর্মোদ্যমী রাখতে নিজ খরচে আগ্রহী কর্মীদের মেডিটেশন করাচ্ছে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের চার জন ডিরেক্টরই তখন সিদ্ধান্ত নিলাম পালাক্রমে এ কোর্সটি করার। কারণ কোর্সটি করার উদ্দেশ্যে কয়েক হাজার টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে বহুগুণ রিটার্ন আমরা পেতে পারি। সে উদ্দেশ্যেই কোর্সে আসা। আমাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির জন্যে সবার দোয়া প্রার্থনা করছি।

[এম এ এস রানা, ব্যবসায়ী। ৩৫৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সন্তানকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার পথ পেয়েছি

ফিরদৌস রাহনুমা



একটি দুর্ঘটনায় জন্মের সময় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ব্রেনে অক্সিজেন কম যাওয়ায় আমার ছেলের ব্রেনের কিছু অংশ ড্যামেজ হয়ে যায়। ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন, 'এটা আর সারবে না। এ বাচ্চার আশা ছেড়ে দিন।' তাদের নেতিবাচক কথায় আমি হতাশাগ্রস্ত একজন মানুষে পরিণত হয়ে গিয়েছিলাম।

আমার মা এবং হাজব্যান্ড আমাকে এ কোর্সটি করার জন্যে উৎসাহিত করছিলেন। কারণ এর মাধ্যমে আমি নিজেকে প্রশান্ত রাখতে পারবো। আমার ছেলে কথা বলতে পারে না। বয়স ১১ বছর হলেও তার আচরণ তিন/ চার বছরের শিশুর মতো। একজন মায়ের জন্যে এটা খুব কষ্টের ব্যাপার।

কোর্সে এসে একটা উপলব্ধি হলো যে, আমার মধ্যেই সে শক্তি আছে, সেই চেতনা আছে যেটা আমার বাচ্চাকে সুস্থ করে তুলবে। গুরুজীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে, আমার সন্তানকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্যে এ কোর্সের বিভিন্ন শিক্ষার মাধ্যমে তিনি আমাকে একটা সুন্দর পথ দেখিয়েছেন।

[ফিরদৌস রাহনুমা, শিক্ষক, টার্কিশ হোপ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। ৩৫৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

১৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে আমিই পাশ করলাম

ডা. সাঈদা পারভীন



গত বছর এক আত্মীয়ের উৎসাহে কোয়ান্টামমে ধ্যানসাফারিতে গিয়েছিলাম। আত্মীয়ের পরামর্শেই বিশেষ একটা নিয়ত করে গিয়েছিলাম। আমি তখন এমএস পরীক্ষা দিয়েছি। পরীক্ষায় ভালোভাবে পাশ করার নিয়ত করলাম। কিছুদিন আগে আমার রেজাল্ট বের হয়েছে। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি পাশ করেছি এবং ১৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে আমিই একমাত্র সে পরীক্ষায় পাশ করেছিলাম।

লামা যাওয়ার পর থেকেই মনে হচ্ছিলো কোয়ান্টাম কোর্সটি আমার অবশ্যই করা উচিত। পেশাগত এবং শারীরিক কিছু সমস্যা নিয়ে আমি কিছুটা হতাশাচ্ছন্ন ছিলাম। আমার ঘাড়ে ব্যথা ছিলো। অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। ক্লাসে ঘণ্টাখানেক বসে থাকার পরই ঘাড়ের ব্যথায় আর মনোযোগ ধরে রাখতে পারতাম না। ঘাড় শক্ত হয়ে যেত। শুয়ে থাকতেও কষ্ট হতো। কোর্সে প্রথম দিন যাওয়ার পরই আমার নিজেকে বেশ সুস্থ, আরো প্রাণবন্ত, আরো আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিলো।

আমার রোগীদেরকে বাস্তবে চিকিৎসা করে কমান্ড সেন্টারে এনেও তাদের জন্যে প্রার্থনা করবো। আমার বিশ্বাস, রোগীদেরকে এখন আরো বেশি সেবা দিতে পারবো।

[ডা. সাঈদা পারভীন, মেডিকেল অফিসার, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা। ৩৫৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

এখন পড়তে ভালো লাগে

সাদিয়া তাসমিম বর্ষা



আমার আব্বু অনেক দিন থেকেই নিয়মিত মেডিটেশন করেন। তিনি কোয়ান্টামের একজন প্রো-মাস্টার। আব্বুই আমাকে ও আম্মুকে এ কোর্স করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আগে পড়ালেখায় একটুও মন বসতো না, পড়তে ভালো লাগতো না। কিন্তু কোর্স করার পর পড়াশোনা করতে আমার খুব ভালো লাগছে, এখন দুই ঘণ্টার পড়া আমি এক ঘণ্টায় করতে পারছি।

[সাদিয়া তাসমিম বর্ষা, শিক্ষার্থী, ৬ষ্ঠ শ্রেণী, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আবদুর রউফ পাবলিক কলেজ। ৩৫৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সুস্থ মন নিরাময় প্রক্রিয়াকে বেগবান করে। মনের সুখ দেহের অসুখকে সবসময় ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম

দুর্যোগ মোকাবেলায় অকুতোভয় দেড়শতাধিক কোয়ান্টিয়ার



বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স পরিচালিত কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় ২০১২ থেকে কমিউনিটি লেভেল স্বেচ্ছাসেবক অগ্নি নির্বাপণ, অনুসন্ধান, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কোয়ান্টিয়ার ও দায়িত্বশীলরা। ঢাকার বিভিন্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্সে তিন দিনব্যাপী পরিচালিত এ প্রশিক্ষণে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত কোয়ান্টামের দেড়শতাধিক সদস্য অংশ নিয়েছেন।

যেকোনো দুর্যোগ ও আকস্মিক দুর্ঘটনা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ লাভ ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে অগ্নিনির্বাপক কর্মীদের সাথে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সহায়তা প্রদানই এ ট্রেনিংয়ের মূল উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের এডমিন ও ফিন্যান্সের পরিচালক এম. আবদুস সালাম-এর সহযোগিতায় সেন্টার শাখা সেলের সদস্যদের নিয়ে এ প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। কোর্স শেষে অনুষ্ঠিত হয় সার্টিফিকেট পরীক্ষা। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন সদস্যের উচ্ছ্বসিত উপলব্ধিই তুলে ধরা হলো এই প্রতিবেদনে।

বিশ্বের যেকোনো দেশে সেবা দেয়ার সুযোগ

আসাদুল্লাহ্ টুটুল

ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং প্রোগ্রামটি অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং বাস্তবভিত্তিক একটি কোর্স। যেখানে সক্রিয় অংশগ্রহণ একদিকে আমাদের সেবক হওয়ার পথকে সুগম করবে, অন্যদিকে সৃষ্টির সেবা করার পথকে উন্মুক্ত করবে।

এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার পর এখন বিশ্বাস করি, যেকোনো দুর্ঘটনায় নিজেকে, পরিবারের সদস্য এবং আশেপাশের মানুষগুলোকেও সাহায্য করতে পারবো। এই প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত সনদপত্র দিয়ে বিশ্বের যেকোনো দেশে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করা যাবে। ফলে লাখো মানুষের ভরসাস্থল হওয়ার যে স্বপ্ন গুরুজী আমাদের দেখিয়েছেন সেটা বাস্তবায়নের সুযোগ এখন আমাদের হাতের নাগালে।

[আসাদুল্লাহ্ টুটুল, ব্যবসায়ী, ১৮৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

দুর্যোগে নিরাপদ থাকায় করণীয় শিখেছি

মুরাদ হোসেন

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ফায়ার সার্ভিসের এ প্রশিক্ষণ কোর্স করতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। এই কোর্সের মাধ্যমে আমরা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের দায়িত্বশীলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা খুব কাছ থেকে দেখেছি। ভূমিকম্প ও আগুন থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে করণীয় ও কীভাবে দুর্ঘটনা এড়ানো যায় এ বিষয়গুলো শিখেছি।

এ কোর্সে প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে আমরা যথেষ্ট সহযোগিতা ও সম্মান পেয়েছি। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনে যোগ হচ্ছে নতুন এক ভলান্টিয়ার দল। যারা মানুষকে বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় সাহায্য করবে।

[মুরাদ হোসেন, এইচএসসি সম্পন্ন করেছেন। ৩৩৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সুযোগ হলো সক্রিয়ভাবে কাজ করার

মো. মোর্শেদুর রহমান

প্রশিক্ষণটি সম্পন্ন করার কিছুদিন পর ভোর ৪টায় একটি ফোন এলো, স্থানীয় একটি জায়গায় আগুন নেভাতে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমি ও আমার বড় ভাই মো. আল মামুন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছলাম। এরই মধ্যে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দুগ্রুপে ভাগ হয়ে ভেতর এবং বাইরের দিকে কাজ শুরু করেন। ভেতরের অবস্থা ছিলো খুব ভয়াবহ। চারপাশে শুধু আগুন আর ধোঁয়া। দম নিতে কষ্ট হচ্ছিলো।

আমি প্রায় দুই ঘণ্টা পানির পাইপ দিয়ে আগুন নেভানোর কাজ করি। যে মেশিনের সাহায্যে এটি করা হয় সেটি ধরে রাখার জন্যে বেশ শক্তির প্রয়োজন হয়, পরিশ্রমসাধ্য একটি কাজ। অবশেষে সকাল ৮টায় আমরা আগুন নেভাতে সক্ষম হই। কাজ শেষে বাসায় ফিরে কিছুক্ষণ পরই আবার ইউনিভার্সিটিতে চলে যাই ক্লাস করতে। তবে আমার কোনো ক্লান্তি ছিলো না। স্রষ্টার কাছে গভীর শুকরিয়া যে, চরম দুর্যোগে প্রত্যক্ষভাবে এ কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি।

[মো. মোর্শেদুর রহমান, শিক্ষার্থী, ৩৪১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

প্রয়োজন এখন সচেতনতার

আশফাকুর রহমান আদনান

ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড–দুটি ঘটনাই ঘটে কোনো পূর্বাভাস ছাড়া। আমরা একটু সচেতন হলেই এসব পরিস্থিতিতে নিজেকে, আশেপাশের মানুষ ও সম্পদ রক্ষা করতে পারি। এসব পরিস্থিতিতে বাস্তব জ্ঞানের আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। তাই আমরা যারা এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি তাদের উচিত আশেপাশের মানুষকে সচেতন করে তোলা।

এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেবক হওয়ার পথে আরো একধাপ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি।

[আশফাকুর রহমান আদনান, নিউজ প্রেজেন্টার, এটিএন বাংলা। ২৯৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

প্রতিটি সচেতন নাগরিকেরই এ প্রশিক্ষণটি নেয়া উচিত

মোহাম্মদ আব্বাস উদ্দিন

আমাদের দেশে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ লেগে থাকে। অগ্নিকাণ্ড এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এছাড়া বড় ধরনের ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে আমাদের এ দেশ, যা মোকাবেলা করতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ জনবল প্রয়োজন। তাই কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরির এ উদ্যোগ অত্যন্ত সময়োপযোগী।

এ প্রশিক্ষণ থেকে আমরা দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার অভিযানে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির নাম ও ব্যবহার শিখেছি। দুর্যোগে আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা দিয়ে অধিকতর ক্ষতির হাত থেকে রক্ষায় যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তা দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের জানা উচিত।

[মোহাম্মদ আব্বাস উদ্দিন, সিনিয়র অফিসার, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, ৩৩৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কার্যকরী একটি প্রশিক্ষণ

নাজিয়া সুলতানা

দুর্যোগ মোকাবেলা ও দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার অভিযান বিষয়ক তিনদিনের এ প্রশিক্ষণ কোর্সটি আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে একটি অত্যন্ত বাস্তব ও কার্যকরী কোর্স। ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রশিক্ষকেরা আমাদেরকে দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার অভিযানের বিভিন্ন কলাকৌশল ও আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসাদান পদ্ধতি হাতে কলমে শিখিয়েছেন।

এ কোর্সের প্রতিটি অংশই ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। কোর্সটি আমাকে একজন আত্মবিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে তৈরি হতে সহায়তা করেছে। এখন আমি যেকোনো দুর্যোগে এ প্রশিক্ষণ কোর্সের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারবো।

[নাজিয়া সুলতানা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স পড়ছেন, ইডেন মহিলা কলেজ। ৩৩৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

গতি, সেবা আর ত্যাগ-ই এর মূলমন্ত্র

অজয় পাল

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ছাত্র হিসেবে দুর্যোগ সম্পর্কে তত্ত্বীয় অনেক কিছুই জানতাম কিন্তু এর কোনটা প্রয়োজনে বাস্তব জীবনে কাজে লাগবে তা খুঁজে বের করতে গেলে খেই হারিয়ে ফেলতে হয়। এক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের তিনদিনের ট্রেনিং কার্যক্রমটি অত্যন্ত কার্যকরী। এর মাধ্যমে সহজাত বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ নিজেকে, পরিবারকে ও তার আশেপাশের মানুষকে জীবন রক্ষায় সহায়তা করতে পারে।

ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের এ প্রশিক্ষণের মূলমন্ত্র 'গতি, সেবা ও ত্যাগ'। এর সাথে যদি আমরা আমাদের মমতা, দক্ষতা ও একাগ্রতাকে কাজে লাগাতে পারি তাহলে সম্মিলিতভাবে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করে জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণ করতে পারবো।

[অজয় পাল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-এর ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন। ২৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *আমরা জানি, গাছ লাগানো সওয়াবের কাজ। কিন্তু আমরা যারা ঢাকায় বাস করি তাদের জন্যে গাছ লাগানোর জায়গার অভাব। আমরা যারা কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার আছি তাদের জন্যে লামায় কোয়ান্টায়নের পরে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা যায় কি না?*

উত্তর : এটি নিঃসন্দেহে খুব ভালো প্রস্তাব। তবে গাছ লাগানোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ গাছ বাঁচানো। কোনো কোনো ঋতুতে গাছ বাঁচানোর জন্যে নিয়মিত গাছে পানি দেয়ার প্রয়োজন হয়। এখন থেকে যারাই কোয়ান্টামমে যাবেন তারা কোয়ান্টামমে বিভিন্ন স্থানে লাগানো গাছে পানি দিয়ে আসবেন।

এর জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করা হবে যাতে সবাই গাছে পানি দিয়ে আসতে পারেন। অতএব লাগানো গাছে পানি দেবেন, যত্ন করবেন। গাছ লাগানো হচ্ছে সদকায়ে জারিয়া। একটি গাছের পেছনে যার যতটুকু শ্রম থাকুক–সেটা যত্ন করে, পানি দিয়ে, সার দিয়ে, আগাছা পরিষ্কার করে হোক–এ গাছটা যখন বড় হবে, এর থেকে যত মানুষ উপকৃত হবে সমস্ত সওয়াব সবার নামে লেখা হতে থাকবে। অতএব গাছ বাঁচানোটাও একটা সওয়াবের কাজ।

গাছ বাঁচানোর জন্যে কোয়ান্টামমে আমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত অর্থাৎ বৃষ্টি না আসা পর্যন্ত প্রত্যেকটা গাছের গোড়ায় একটা করে কলস থাকতো। প্রতিদিন কলসে পানি দেয়া হতো, এর তলায় ফুটো দিয়ে পানি গাছের গোড়ায় যেত। এখন অবশ্য গাছ বড় হয়ে গেছে এখন আর কলসে পানি দিতে হয় না।

কিন্তু এখনো দূরে দূরে আমাদের অনেক গাছ আছে। গাছে পানি দেয়ার জন্যে হেঁটে যেতে হবে অন্তত এক ঘণ্টা। ওখানে বহু ধরনের গাছ আছে। আপনারা যাবেন এবং গাছে পানি দিয়ে আসবেন।

প্রশ্ন : *আমার জীবনে একই ভুল বার বার করছি। যদিও জানি আমার জন্যে কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ। তবুও যেন কিছুই ঠিক করতে পারছি না। কোয়ান্টামে এসে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবুও আমি ভালো মানুষ হতে চাই। এমন জীবন চাই যেখানে কোনো পাপ থাকবে না।*

উত্তর : পাপ নিয়ে চিন্তা যত কম করবেন তত ভালো। এর জন্যে সবচেয়ে ভালো হয় যে, আপনি কখনো একা থাকবেন না। একা থাকলেই পাপ করার সম্ভাবনা বেশি। সবসময় সঙ্ঘের সাথে থাকবেন। ভালো কাজের সাথে থাকবেন। কারণ আপনি যদি ভালো কাজ না করেন তাহলে মন্দ কাজ করবেন।

সবসময় আপনার পেশা এবং বাসা এ দুটো ঠিক রেখে বাকি সময় ফাউন্ডেশনে আত্ম উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজে ব্যয় করবেন। দেখবেন আপনি পাপ করার সময় পাচ্ছেন না। পাপ করতে সময় সুযোগ দুটোই লাগে। তাই ভালো মানুষের সাথে থাকলে, প্রথমত, সে সুযোগ আপনি পাবেন না। আর দ্বিতীয়ত, কাজের মধ্যে থাকলে সে সময়ও আপনি পাবেন না। অতএব সঙ্ঘে একাত্ম থাকলে আপনি কখনো খারাপ থাকতে পারবেন না।

একা থাকলেই শয়তান আপনাকে ধরবে। অধিকাংশ কুচিন্তা, পাপ চিন্তা আসে রাতের বেলা ঘুমাতে যাওয়ার আগে। কারণ তখন আপনি একা থাকেন। তখনো যদি আপনি ফাউন্ডেশনের চিন্তা করেন যে, আগামীকাল আমি কী কী কাজ করতে পারি, কী কী করবো। তাহলে দেখবেন যে, আপনি পাপ করার সুযোগ পাচ্ছেন না।

প্রশ্ন : *কোনো ভুল কাজ করার পর বুঝতে পারলে এবং সেই ভুল কাজ করার জন্যে যদি নিজেকে ক্ষমা করতে না পারি তাহলে কী করবো? নিজের প্রতি রাগ কমাতে পারছি না।*

উত্তর : নিজেকে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। নিজে নিজে যদি শাস্তি দিতে না পারেন, মায়া লাগে, তাহলে যার কথা আপনি শোনেন বা মানেন তাকে দিয়ে শাস্তি দেয়াবেন। এভাবে একবার শাস্তি হয়ে গেলে আপনি অনুভব করবেন যে, আপনি মুক্ত হয়ে গেছেন। কারণ একটা অপরাধের জন্যে তো বার বার শাস্তি হয় না।

আপনি দেখবেন যে, নিজের প্রতি রাগ তখন কমে গেছে। অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গিটা হতে হবে বাস্তবসম্মত। কারণ এই ভুলের মাঝে থাকলে আপনি তো অতীতে থেকে যাবেন। এটাও একটা নেতিবাচকতা। এটাও ক্ষতিকর। ভুল হতেই পারে। যে কারো জীবনে ভুল হতে পারে। এজন্যেই তো আল্লাহ তওবার পথ রেখেছেন। অনুশোচনা করলে তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ যেখানে ক্ষমা করে দেন সেখানে আপনি কেন নিজেকে ক্ষমা করতে পারবেন না?

আর অতীতে থাকা, ভুলের মধ্যে থাকা, অনুশোচনায় থাকা–এটাও একটা গুনাহর কাজ। অনুশোচনা করবেন, ভুলে যাবেন। ভুল হয়েছে, আল্লাহ মাফ করে দাও, আমি আর করবো না। সময়টাকে নতুন কাজে, ভালো কাজে নিয়োগ করবেন। কী ভুল করেছেন সেটা নিয়ে চিন্তা করে যদি সারাজীবন পার করে দেন তাহলে আপনি ভালো কাজ করবেন কখন? ভালো কাজ করতে হবে। ভালো কাজের মাধ্যমে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

প্রশ্ন : *আমি জানি না আমার কী হয়েছে? একা থাকলে শুধু কান্না পায় এবং মনে হয় অনেক জোরে জোরে কান্না করি। আমি চাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে কিন্তু একটা ভয় কাজ করে আমার মধ্যে। আমি বিসিএসকে অনেক বেশি ভয় পাই। কিন্তু এই বিসিএস পরীক্ষা দেয়ার জন্যে আমি পড়া শুরু করেছি। আমি কি পারবো?*

উত্তর : আপনার আগেও অনেকে বিসিএস পরীক্ষা দিয়েছে। আপনার পরেও অনেকে বিসিএস পরীক্ষা দেবে। সুতরাং এটা না পারার কিছু নেই। সবাই পারলে আপনিও পারবেন। এটাকে পিঠা মনে করুন। প্রত্যেকদিন একটা করে পিঠা খাবেন যে, আমি বিসিএস-এর একটা করে পরীক্ষা দিচ্ছি। সেইসাথে অটোসাজেশন দিতে থাকুন এবং আমাদের আত্মজাগরণ সিডির ট্র্যাক-২ দিনে দুবার করে শুনতে থাকুন। এভাবে ৪০ দিন শোনার পর, ফাউন্ডেশনের স্টুডেন্ট কাউন্সিলর যারা আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করে পরামর্শ নেবেন।

প্রশ্ন : *কোয়ান্টামে 'সমস্যা' না বলে 'সম্ভাবনা' বলা হয়। দয়া করে বিষয়টা পরিষ্কার করে বলবেন।*

উত্তর : আসলে আমরা কোনো কিছুকেই সমস্যা মনে করি না। কারণ আমরা আমাদের জীবনে দেখেছি যেটাকে সমস্যা বলা হয়েছে, সেটার মধ্যেই নতুন সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। সূরা ইনশিরাহ-এর ৬নং আয়াতে আল্লাহ খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন–নিশ্চয়ই কষ্টের পরে আছে স্বস্তি। স্বস্তি অর্থ তৃপ্তি, প্রশান্তি, সাফল্য।

অতএব প্রতিটি সমস্যার মধ্যেই সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। এই জন্যে আমরা সমস্যাগুলোকে সম্ভাবনা বলি। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে যেকোনো সমস্যার দুটি ফলাফল হতে পারে। হয় এটা সংকটে রূপান্তরিত হতে পারে না হলে এটা নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। সমস্যার সাথে যখন টেনশন যুক্ত হয় তখন তা সংকটে রূপান্তরিত হয়। আর সমস্যা সমাধানে যখন মেডিটেশন করবেন তখন সেটা নতুন সম্ভাবনায় রূপান্তরিত হবে।

প্রশ্ন : *আমি হুট করে রেগে যাই। রেগে গেলে কখন কাকে কী বলি খেয়াল করি না। যখন খেয়াল করি তখন মাফ চেয়ে নিই।*

উত্তর : তাহলে তো কোনো লাভ হলো না। ধরুন, আপনি একটি গ্লাস ভেঙে ফেললেন। মাফ চেয়ে নিলেন, গ্লাসটি কি জোড়া লাগবে? কখনো লাগবে না। সবসময় মাফ চেয়ে নেয়া যায় না। এরপর থেকে রেগে গেলে নিজেকে চড় দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। এরপর আবার যখন রাগ আসতে শুরু করবে এ চড়ে গাল কী রকম জ্বলছিলো সেটা মনে পড়ে যাবে। দেখবেন, রাগ কমে গেছে। কারণ আমাদের একটি জনপ্রিয় বাক্য 'দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে' এর চেয়েও এখন জনপ্রিয় 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'। আর একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট যদি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে এবং পরবর্তীতে আবার মাফ চাইতে হয়–সেটা খুব দুঃখজনক। তাই নিয়মিত মেডিটেশন করুন এবং 'রেগে গেলাম তো হেরে গেলাম' এ অটোসাজেশন চর্চা করুন।

প্রশ্ন : *আমরা দুই ভাই এক বোন। সংসারে আমি সবার ছোট। আমার বোন বিবাহিতা। ভাই বিয়ে করেছেন ছয় মাস হলো। কিন্তু ভাই এখন আলাদা হয়ে যাওয়ার পথে আছেন। আমি উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে স্নাতক পড়ার জন্যে দেশের বাইরে যাওয়ার মনছবি দেখছি। এ অবস্থায় বাবা-মাকে ফেলে বিদেশে গেলে তাদের সেবা করার মতো লোক থাকবে না। আমি কীভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি?*

উত্তর : আসলে উচ্চ মাধ্যমিক পড়া শেষ করে দেশের বাইরে পড়তে যাওয়াটা হচ্ছে একটা বোকামি। আপনি অনার্স, মাস্টার্স সম্পন্ন করুন তারপরে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্যে যান। আপনার যেহেতু মা-বাবার প্রতি টান আছে, মা-বাবাকে অনুভব করেন, আপনি দেশে অনার্স, মাস্টার্স সম্পন্ন করুন। তারপরে আপনি বিদেশের মনছবি দেখবেন আরো উচ্চতর পড়াশোনার জন্যে।

এ মাসের অটোসাজেশন

স্রষ্টা দিতে পছন্দ করেন।
তাঁর কাছে সবকিছুই আছে।
তাই নিঃসংকোচে শুধুমাত্র
তাঁর কাছেই চাইবো।

মহাজাগতিক সফরে

মিসেস হামিদা রহমান



কোয়ান্টাম পরিবারের একনিষ্ঠ সদস্য ৪র্থ ব্যাচের কোয়ান্টাম প্রো-মাস্টার মিসেস হামিদা রহমান আর আমাদের মাঝে নেই। গত ১৩ মার্চ ২০১৩ সকাল সাড়ে ১০টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কিডনি জটিলতায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে.... রাজিউন)।

তিনি স্বামী, দুই ছেলে, পাঁচ মেয়ে এবং অনেক সহযাত্রী রেখে গেছেন। মরহুমা হামিদা রহমান-এর পরিবারের সবাই কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য। উল্লেখ্য, মরহুমার স্বামী হযরত মওলানা মাজেদুর রহমান বিশিষ্ট লেখক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। তার রচিত আত্মদর্পণ, লোকচিকিৎসায় ঝাড়ফুঁক ও ইসলামিক বিশ্লেষণ, নামাজের পর হাত তুলে দোয়া–ছাড়াও রয়েছে 'মহানবী (স)-এর ১০০টি অনন্য বৈশিষ্ট্য', মহানবী (স)-এর ১০০টি অনন্য মোজেজা'সহ একাধিক অনুবাদ গ্রন্থ। মরহুমার পুত্র বুরহানুর রহমানের হাতেই শুরু হয় কোয়ান্টাম শিশুকানন-এর কাজ।

আমরা সদা বিনয়ী ও কল্যাণকামী এই মানুষটির মাগফেরাত কামনা করি।

অধ্যক্ষ মাহফুজুল হক



ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ-এর অধ্যক্ষ কোয়ান্টামের নিবেদিতপ্রাণ সদস্য মাহফুজুল হক আর আমাদের মাঝে নেই। গত ২৪ মার্চ ২০১৩, রাত ৮টায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত জটিলতায় ঢাকার ইউনাইটেড হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে.... রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে এবং বহু শুভাকাঙ্ক্ষী শিক্ষকশিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী রেখে গেছেন। বিশিষ্ট এই শিক্ষাবিদ কোয়ান্টাম মেথড ২৭২ তম ব্যাচে অংশ নেন। কোয়ান্টাম কোর্স সম্পন্ন করার পর কলেজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মেডিটেশনে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি গড়ে তোলেন 'মেডিটেশন ক্লাব' ও প্রি-সেল কার্যক্রম।

উল্লেখ্য, তিনি ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ ১৮ বছরের দক্ষ পরিচালনায় এ কলেজটিকে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করেন।

পরম করুণাময় মহাজাগতিক সফরের পরবর্তী ধাপে তাকে অনন্ত প্রশান্তি দান করুন।

সারাদেশে সেন্টার শাখা সেলে সংযোগায়ন ওয়ার্কশপ

বৃত্ত ভেঙে চারপাশে গড়ে তুলুন সম্প্রীতির বন্ধন



যশোরে সিসিটিএস মিলনায়তনে সংযোগায়ন ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীরা

চারপাশে ৪০ ঘরে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে সেন্টার শাখা সেলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সংযোগায়ন ওয়ার্কশপ। ব্যক্তিকেন্দ্রীকতার বৃত্ত ভেঙে পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করতে প্রত্যেকের নিজ নিজ আবাসস্থল থেকে নিজ উদ্যোগে চারপাশে কমপক্ষে ৪০ ঘরের প্রতিবেশীদের সাথে পরিচিত হওয়া, একাত্মতা বৃদ্ধি করা ও নিজেকে তাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই ফাউন্ডেশনে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে সংযোগায়ন ওয়ার্কশপ।

১৫ ফেব্রুয়ারি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ধানমণ্ডি শাখায় দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। সংযোগায়ন বিষয়ক কর্ম প্রক্রিয়া নির্ধারণে আলোচনা ও গ্রুপ ডিসকাশন নিয়ে প্রাণবন্ত ওয়ার্কশপ পরিচালিত হয় শাখায়। এতে উপস্থিত ছিলেন ৭০ জন দায়িত্বশীল ও কোয়ান্টিয়ার। ২১ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম সেন্টারের উদ্যোগে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। গ্রাজুয়েট প্রো-মাস্টারসহ মোট ১২৯ জন এতে উপস্থিত ছিলেন। ১ মার্চ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মতিঝিল ও মগবাজার শাখায় অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ। কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে মতিঝিল শাখার উদ্যোগে দিনব্যাপী ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন ১৬৫ জন অংশগ্রহণকারী। শাখা কার্যালয়ে মগবাজার শাখার ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এতে উপস্থিত ছিলেন ৪৩ জন অংশগ্রহণকারী।

যশোরে বকুলতলাস্থ সিসিটিএস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সংযোগায়ন ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন মোট ২২৩ জন সদস্য।□১৫ মার্চ খুলনা শাখা কার্যালয়ে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় এ সংযোগায়ন ওয়ার্কশপ। দায়িত্বশীল ও কোয়ান্টিয়ারদের সংযোগায়ন কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন ১৪৬ জন সদস্য। একই দিনে বংশাল অফিসে এ ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ৩৬ জন।

বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত এ ওয়ার্কশপগুলোতে আলোচনা করেন ফাউন্ডেশনের মোমেন্টিয়ার, দায়িত্বশীল ও অর্গানিয়ারবৃন্দ।

লন্ডনের কার্ডিফে সাদাকায়ন



কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি লন্ডনের উদ্যোগে ১০ মার্চ থেকে কার্ডিফে নিয়মিত সাদাকায়ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এদিন লন্ডন থেকে ১৫০ মাইল দূরবর্তী কার্ডিফে এর উদ্বোধন ও কোয়ান্টাম সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে 'প্রশান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সাফল্যের জন্যে মেডিটেশন' বিষয়ক আলোচনা করেন খন্দকার ফিরোজ আহমেদ। 'কোয়ান্টাম চ্যারিটি ব্যাংক' বিষয়ে আলোচনা করেন বি এম রাফি। লন্ডনে স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করেন লামিয়া শারমিন। অতিথিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন লন্ডন মেডিটেশন সোসাইটির দায়িত্বশীল শাহ আহমেদ সাদেক। অনুষ্ঠানে শিথিলায়ন মেডিটেশনের পাশাপাশি 'আসুন সুস্থ থাকি' ও 'কোয়ান্টাম বিশ্বাস ও বাস্তবতা' ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইয়াসিন আহমেদ চৌধুরী।

সিডনিতে একুশে বই মেলা ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম

৩ মার্চ কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি সিডনি'র উদ্যোগে পরিচালিত হয় বিশেষ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম। সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সিডনি প্রবাসী কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন ক্লিনআপ অস্ট্রেলিয়া-তে। তারা সিডনি সিটি সংলগ্ন ভিক্টোরিয়া পার্কটি পরিষ্কার করার দায়িত্ব পান।

গত বারের মতো এবারো সিডনি এশফিল্ড পার্কে আয়োজিত একুশে বই মেলায় অংশগ্রহণ করে কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি সিডনি। জ্ঞান পিপাসু এবং মেডিটেশনে আগ্রহী অনেকেই ভিড় করেন কোয়ান্টামের এ স্টলে। এতে সিডনিতে বসবাসরত অনেক প্রবাসী বাঙালির মাঝে কোয়ান্টামের বাণী পৌঁছে দেয়ার সুযোগ হয়। মেলায় স্মারক ও কণিকা ছিলো সবার মূল আকর্ষণ।

পাবনায় একুশে বই মেলায় তরুণদের ব্যাপক সাড়া

পাবনায় টাউন হলে ১২ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন পাবনা সেল। মেলায় কোয়ান্টামের স্টলে তরুণ প্রজন্মের ছিলো উপচে পড়া ভিড়। কোয়ান্টামের সবধরনের প্রকাশনার মধ্যে শিক্ষার্থী, পরিবার ও স্বাস্থ্য কণিকার চাহিদা ছিলো লক্ষ্যণীয়। এছাড়া প্রশ্নোত্তরের বই দুটিও বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে সবার মাঝে।

মেলায় কোয়ান্টামের স্টলে একদিন বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষার ক্যাম্প করা হয়। এ ক্যাম্পে মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টায় ১০২ জন রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে এবং স্বেচ্ছায় রক্তদানের অঙ্গীকার করে।

স্বেচ্ছায় রক্তদান মানবিক মূল্যবোধ সুদৃঢ় করবে



জীবজগৎসহ যেসব ক্ষেত্রে মানুষের পরোপকার করার সুযোগ রয়েছে এর মধ্যে রক্তদান নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম। আড়াই দশক আগেও আমাদের দেশে রক্তের অভাবে অনেক মুমূর্ষু রোগী মারা যেত। রক্তদান ও রক্তসংগ্রহে কুসংস্কার ও অজ্ঞতা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারলেও চাহিদার তুলনায় দেশে রক্ত সরবরাহ অনেক কম। কোয়ান্টামসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব শ্রেণীপেশার মানুষের রক্তদানে এগিয়ে আসার যে ধারা সৃষ্টি হয়েছে তা সমাজে সহনশীলতা, মানবিকতা ও সাম্প্রদায়িক মূল্যবোধকে আরো সুদৃঢ় করবে।

কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত ৯৫ তম আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে কথাগুলো বলেন প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলের প্রভোস্ট ও ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অনারারি প্রফেসর এবং বিশ্বধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিভাগের খণ্ডকালীন প্রফেসর ও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা আচার্য ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল।

প্রধান অতিথি আরো বলেন, রক্তদাতাদের মধ্যে যারা তরুণ তারা ভাগ্যবান যে, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তারা আগেই নিয়েছেন। বয়োজ্যেষ্ঠদেরও উচিত নিজ পরিবারসহ আশেপাশের তরুণদের রক্তদানে উৎসাহিত করা। তাহলে আমরা রক্তের চাহিদা মেটাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবো।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রোগ্রামে কোয়ান্টাদের সাফল্য

বাংলাদেশ সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রোগ্রামে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের পক্ষ থেকে চারজন কোয়ান্টা অংশগ্রহণ করে থানা ও জেলা পর্যায়ে মনোনীত হয়েছে। নবম শ্রেণীর 'ভাষা ও সাহিত্য' এবং 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' দুটি বিষয় এবং অষ্টম শ্রেণীর 'বাংলাদেশ স্টাডিজ' ও 'বিজ্ঞান' দুটি বিষয়সহ মোট চারটি বিষয়ে তারা অংশগ্রহণ করে।

উল্লেখ্য, থানা পর্যায়ে স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীদের সাথে এমসিকিউ পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে মেধা অন্বেষণের এ প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে প্রতিটি বিষয়ে প্রথম হয় কোয়ান্টারা। জেলা পর্যায়ে স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীদের সাথে অংশ নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে কোয়ান্টারা। উভয় পর্যায়েই এ কৃতিত্বের জন্যে তাদের পুরস্কৃত করা হয়।

থ্যালাসেমিয়া রোগীদের পাশে কোয়ান্টাম ল্যাব

প্রতিমাসে ৫০০ রোগী রক্ত পাচ্ছে প্রসেসিং খরচ ছাড়াই



স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম কোয়ান্টাম ল্যাব এখন রক্তের প্রয়োজনে মুমূর্ষু মানুষের অন্যতম ভরসাস্থল। ক্যান্সার, কিডনি জটিলতা, সন্তান জন্মদানকালে প্রসূতি মায়ের জন্যে এবং অন্যান্য অপারেশন ছাড়াও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের বেঁচে থাকার জন্যে রক্ত এক অপরিহার্য উপাদান।

থ্যালাসেমিয়া রক্তস্বল্পতাজনিত বংশগত একটি রোগ। এ রোগ মা-বাবার কাছ থেকে জিনের মাধ্যমে সন্তানের মাঝে আসে। এসব রোগীর বেশিরভাগই তীব্র রক্তস্বল্পতায় ভোগে। সাধারণত প্রতি ২-৪ সপ্তাহ পর পর আজীবন তাদের শরীরে নিয়মিতভাবে রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রয়োজন হয় এবং এটিই এ রোগের মূল চিকিৎসা।

সামর্থ্যহীন ও দরিদ্র থ্যালাসেমিয়া রোগীদের চিকিৎসার সুবিধার্থে স্বল্প বা বিনা প্রসেসিং খরচে রক্ত সরবরাহ করে আসছে কোয়ান্টাম ল্যাব। প্রতিমাসে থ্যালাসেমিয়ার প্রায় পাঁচশত রোগীকে ল্যাব থেকে স্বল্প বা বিনা প্রসেসিং খরচে রক্ত সরবরাহ করা হচ্ছে। এদের মধ্যে নাদিয়া, মুন্নী, বাবু, বৃষ্টি, সারা আসিফা, হাসান, সুমী, প্রশান্তসহ আরো অনেকে ৯/১০ বছর ধরে এ সেবা গ্রহণ করে আসছে।

জিনগত ত্রুটির কারণে এসব রোগীর হিমোগ্লোবিন অপূর্ণাঙ্গ হয়ে তৈরি হয়। ফলে রক্তে লোহিত কণিকা অকালে ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া রক্ত পরিসঞ্চালনের জন্যে এদের শরীরে আয়রন জমা হতে থাকে। অতিরিক্ত আয়রন জমা হয়ে হৃদরোগ, লিভার সিরোসিস, ডায়াবেটিস, শারীরিক বৃদ্ধি কম হওয়া ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়। আর এসব রোগের চিকিৎসায়ও ব্যয় হয় প্রচুর অর্থ। সাধারণত দরিদ্র ঘরের সন্তানদেরই এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

মো. শাহীন এবং মোসাম্মৎ নার্গিস দম্পতির কন্যাশিশু জান্নাতুল ফেরদৌসের ৪০ দিন বয়সে থ্যালাসেমিয়া ধরা পড়ে। তখন থেকে প্রতিমাসে দুবার করে তার রক্তের প্রয়োজন হয়। মেয়ের বয়স এখন দুই বছর। তাদের বড় ছেলে রাজুও একসময় এ রোগে আক্রান্ত হয়। তখন কোয়ান্টামের কথা জানা না থাকায় রক্তের জন্যে তাদের অনেক বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়েছে। এখন মেয়ের রক্তের জন্যে তাদের আর দুশ্চিন্তা নেই, বিনামূল্যেই রক্ত পাচ্ছেন কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে।

ক্ষুদ্রব্যবসায়ী নুরুল ইসলামের ৬ষ্ঠ শ্রেণী পড়ুয়া সন্তান শাওন। তিন/ চার বছর বয়স থেকে তার থ্যালাসেমিয়া। কয়েক বছর ভুল চিকিৎসা হওয়ার পর গত চার/ পাঁচ বছর ধরে কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে বিনামূল্যে রক্ত সংগ্রহ করে চিকিৎসা হচ্ছে তার।

কৃষক পরিবারের মেয়ে সীমা। ১০ বছর বয়সে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার পর গত তিন বছর ধরে কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে তাকে রক্ত সরবরাহ করা হচ্ছে। দরিদ্র পরিবারে যেখানে খাবারের চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতে হয় কৃষক বাবাকে, সেখানে বিনামূল্যে রক্ত পাওয়ার এ সুবিধা বেঁচে থাকার আশা যোগাচ্ছে ৭ম শ্রেণীতে পড়ুয়া সীমাকে।

মাদ্রাসার শিক্ষক এনায়েত উল্লাহ। তার ছেলে আফ্ফান-এর থ্যালাসেমিয়া ধরা পড়ে চার মাস বয়স থেকে। সন্তানের জন্যে জরুরি রক্তের প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হতে হতো তাকে। এখন কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে নিজে রক্ত সংগ্রহ করছেন সেইসাথে অন্যদেরও পরামর্শ দেন প্রয়োজনে এখান থেকেই রক্ত সংগ্রহ করার জন্যে।

এভাবেই জান্নাত, আফ্ফান, সীমা, নাদিয়া, বৃষ্টি, বাবুর মতো অনেক শিশু নিয়মিত দেহে রক্ত পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে বেঁচে আছে তাদের মা-বাবার কোলজুড়ে, উপভোগ করছে সুন্দর এ পৃথিবীর রূপ রস গন্ধকে। আর এ রক্তের যোগানদাতা হচ্ছেন দেশের গুটিকয় স্বেচ্ছা রক্তদাতা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, দেশে তিন লাখেরও বেশি শিশু এ রোগে আক্রান্ত, যাদের প্রতি দুই থেকে চার সপ্তাহ পর পর রক্তের প্রয়োজন হয়। রক্ত গ্রহণ করতে না পারলে কয়েক বছরের মধ্যে মারা যায় এ রোগীরা। আর পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ পেয়ে ৫০, ৬০ বছর পর্যন্তও বেঁচে আছেন, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে সংসার-সন্তান নিয়ে জীবনযাপন করছেন এমন উদাহরণও রয়েছে অনেক।

নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের দানেই বেঁচে আছে এ শিশুরা। দেশে স্বেচ্ছা রক্তদাতার সংখ্যা যত বাড়বে তত বেশি এ রোগীদের সেবা প্রদান সম্ভব হবে। তাই থ্যালাসেমিয়াসহ অন্যান্য মুমূর্ষু রোগীদের জীবন বাঁচাতে রক্তদানে সমর্থ ও সুস্থ প্রত্যেকেরই স্বেচ্ছা রক্তদানে এগিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : এপ্রিল ২০১৩ ॥ সম্পাদক : কাজী মাহ্তাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইভোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য– ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 8319377, 8391391 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

মে ২০১৩

কোয়ান্টাম বুলেটিন

সাভারে ভবনধসে দুর্গত মানুষের পাশে কোয়ান্টাম

তিন দিনে আড়াই হাজার ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ



দুর্ঘটনার খবর শোনার পর পরই স্বেচ্ছায় ল্যাবে রক্ত দিতে আসা মানুষের সারি

২৪ এপ্রিল সাভারে ঘটে যায় স্মরণাতীত কালের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ও মর্মস্পর্শী দুর্ঘটনা। কোয়ান্টাম পরিবার এ ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশের পাশাপাশি পরবর্তী দিনগুলোতে সাধ্যমতো অংশ নিয়েছে দুস্থের সেবায়, দাঁড়িয়েছে দুর্গত মানুষের পাশে। তিন দিনে আড়াই হাজার ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করেছে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম। দুর্ঘটনায় আহত ও চিকিৎসাধীন মানুষের জন্যে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছে ৬৪৯ ব্যাগ রক্ত। এছাড়াও দুর্ঘটনাস্থলে পাঁচ দিন ধরে চলা উদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের অধীনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাজে দক্ষ কোয়ান্টাম পরিবারের ৪৬ জন সদস্য।

২৪ এপ্রিল ঘটনার পর পরই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সবার প্রতি রক্তদানের আহ্বান জানানো হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, সাভার দুর্ঘটনায় আহত ও চিকিৎসাধীন যে কারো জন্যে কোয়ান্টাম ল্যাব কোনো সার্ভিস চার্জ ছাড়াই রক্ত সরবরাহ করবে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও জাতীয় দৈনিকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তিও প্রচারিত হয়।

সেদিন বিকেলের পর থেকেই ফাউন্ডেশনের সদস্যসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ কোয়ান্টাম ল্যাবে এসে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এমনকি ল্যাবে ফ্রিজে রক্ত সংকুলান না হওয়ায় রক্তদাতারা তাদের নাম তালিকাভুক্ত করে যান পরবর্তীতে এসে রক্ত দেয়ার জন্যে। পরদিন থেকেই কোয়ান্টাম ল্যাবের নিয়মিত দৈনিক রক্ত সরবরাহের পাশাপাশি দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের সুচিকিৎসার্থে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে জরুরিভিত্তিতে রক্ত সরবরাহ করে কোয়ান্টাম ল্যাব। ২৫ ও ২৬ এপ্রিল সন্ধানী ঢাকা মেডিকেল কলেজ ইউনিটে ২৪৯ ব্যাগ, ২৭ এপ্রিল কিডনি ফাউন্ডেশন এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউশনে ১৫০ ব্যাগ, সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০০ ব্যাগ এবং ঢাকা শিশু হাসপাতালে ৫০ ব্যাগসহ ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত মোট ৬৪৯ ব্যাগ রক্ত সরবরাহ করা হয়।

এ দুর্ঘটনায় আহতদের জন্যে প্রয়োজনীয় রক্তের চাহিদা পূরণার্থে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ব্লাড ক্যাম্প আয়োজন করা হয় মিরপুরের শেওড়াপাড়া, মিরপুর-১২, ২নং ওয়ার্ড কমিশনার অফিস, চৌরঙ্গী মার্কেট, ধানমন্ডি শাখা কার্যালয়, বনশ্রী কার্যালয়, পূর্ব বাড্ডা, বসুন্ধরাস্থ গ্রামীণফোন হেড অফিস, শিন শিন এপারেলস, এনসিসি ব্যাংক দিলকুশা শাখায়। এছাড়াও কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের ভ্রাম্যমাণ মোবাইল ব্লাড ক্যাম্পের উদ্যোগেও সংগৃহীত হয় আড়াই শতাধিক ব্যাগ রক্ত।



বনশ্রীতে আয়োজিত ব্লাড ক্যাম্পে বনশ্রী কল্যাণ সমিতির সভাপতি এম এ বাতেন চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক মো. নুরুল কবীর নিরু

দুর্গতদের পুনর্বাসনে জমা দিন আপনার একদিনের আয়

সাভার ট্র্যাজেডিতে আহত এবং পঙ্গুদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্যে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন তহবিল সংগ্রহ করেছে। শ্রদ্ধেয় গুরজী ও মা-জী সবাইকে তাদের এক দিনের আয় অথবা ব্যয় এই পুনর্বাসন তহবিলে জমা দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

ইতোমধ্যেই ফাউন্ডেশনের অর্গানিয়ার মোমেন্টিয়ার আর্ডেন্টিয়ার কোয়ান্টিয়ার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেকেই তাদের একদিনের আয় জমা দিয়েছেন পুনর্বাসন তহবিলে।

আপনিও এতে অংশ নিন। আসুন, আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাদের পাশে দাঁড়াই, সময়ের ক্ষতে বুলিয়ে দেই মমতার পরশ।

ভাগ্যবতী বিলকিস



তখন সকাল ৯টা। প্রতিদিনের মতো আটতলা বিল্ডিং-এর চারতলায় আমরা সাতজন মেয়ে কাজ করছিলাম স্যাম্পল সেকশনে। হঠাৎ প্রচ- ধাক্কা অনুভব করলাম, মনে হচ্ছিলো বিল্ডিংটা যেন মাটিতে গেঁথে যাচ্ছে। শত শত মানুষ ছিটকে পড়ে যাচ্ছে একেকদিকে।

আমি চিৎকার দিয়ে দৌড়াতে লাগলাম জানালার দিকে। কী করবো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বড় বড় দুটো লোহার টেবিলের নীচে আশ্রয় নিলাম। চারপাশে মানুষের চিৎকার আর কান্না। আমি শুধু আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করছিলাম আর মনে মনে বলছিলাম–সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন। মনে হচ্ছিলো, আমার ১০ বছরের মেয়েটার জন্যে হলেও আমাকে বাঁচতে হবে। এভাবে একসময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

জ্ঞান ফিরলে দেখি আমি হাসপাতালের বেডে। কাঁধে, মাথায় বেশ ব্যথা। জানতে পারলাম আমাকে উদ্ধার করা হয়েছে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে। আমার সাথে যে ছয়জন ছিলো তাদের দুজনকে হাত পা কেটে বের করতে হয়েছে আর বাকী চারজন মৃত। আমি যে অক্ষত শরীরে বেঁচে আছি এটা আল্লাহর অশেষ রহমতেই সম্ভব হয়েছে।

কোয়ান্টাম কোর্স করার পর থেকে প্রতিদিন দুইবেলা মেডিটেশন করি, নিয়মিত দান করি। এমনকি দুর্ঘটনার দিনও সকালে মাটির ব্যাংকে দান করে ঘর থেকে বের হয়েছি। আগে আমার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত পড়তো। কিন্তু ৩৫০ ব্যাচে কোর্স করার পর থেকে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

ঘুরেফিরে বার বার মনে পড়ছে সেই দিনটার কথা। সবকিছু কেমন চোখের সামনে শেষ হয়ে গেল। বুকের মধ্যে কেমন যে একটা শূন্যতা, কষ্ট, আতঙ্ক বলে বোঝানো যাবে না। কিন্তু আমি নিজেকে একা মনে করি না। আমি জানি, আমার সাথে কোয়ান্টামের সবাই আছেন। আমি আবার শুরু করতে পারবো একটা সুন্দর জীবন।

বাংলা লোকসংগীতের পুরোধা পুরুষ ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মুস্তাফা জামান আব্বাসী। গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ভাটিয়ালি জারি সারি দেহতত্ত্ব ভাওয়াইয়া মারফতি মুর্শিদি ইত্যাদি লোকগীতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে তিনি রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলা লোকসংগীতকে পরিচিত ও প্রশংসিত করানোর ক্ষেত্রে তার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বিচিত্র বিষয়ে তার রচিত ও সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা এ পর্যন্ত ৫০টিরও বেশি। বর্তমানে তিনি ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর কাজী নজরুল ইসলাম-আব্বাস উদ্দিন রিসার্চ এন্ড স্টাডি সেন্টারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সুসাহিত্যিক ও সংগীত-গবেষক শিল্পী মুস্তাফা জামান আব্বাসী কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২৫৫ ব্যাচে অংশ নেন। কোয়ান্টাম বুলেটিনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন তার বৈচিত্রময় চিন্তা ও জীবনদর্শনের নানা দিক সম্পর্কে।



কোয়ান্টাম মেথড আমাদের হৃদয়কে জাগিয়ে তোলে

মুস্তাফা জামান আব্বাসী

রবীন্দ্রনাথ তার গানে বলেছেন, 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো...'। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই তো কিছু ব্যর্থতা, কিছু না-পাওয়ার বেদনা আছে। কিন্তু তারপরও জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দময় হওয়া চাই। তাহলেই কেবল জীবনটা সার্থক হয়ে উঠতে পারে। আর এটি তখনই সম্ভব যখন আমরা জানবো–জীবনের লক্ষ্য কী, কিংবা লক্ষ্য কী হওয়া উচিত।

আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি কিছুদিন পড়িয়েছি। একদিন ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের জীবনের লক্ষ্য কী? প্রশ্ন শুনে ওরা একজন আরেকজনের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। একজন বললো, আমরা তো কখনো এভাবে ভেবে দেখি নি।

আমি ওদের বলেছি, মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া চাই আমাদের আত্মাকে পবিত্র করা। প্রতিদিন পবিত্র থেকে পবিত্রতর করা। তুমি কারো দিকে তাকালেই যেন সে তোমার দৃষ্টির মধ্যে একটা পবিত্রতার স্নিগ্ধ স্পর্শ পায়। তোমার পাশে এলেই যেন লোকে একটা পবিত্রতার গন্ধ অনুভব করে। আর এজন্যে সবাইকে ভালবাসতে হবে। চারপাশের সবাইকে মূল্য দিতে হবে।

জীবনের লক্ষ্য আসলে আমার কাছে এটাই। যখন আমি পরিপূর্ণভাবে পরিশীলিত হবো, ধৌত হবো, আমার হৃদয় পবিত্র হয়ে উঠবে কেবল তখনই চিরন্তন পবিত্রতার যিনি প্রতিমূর্তি, তাঁর করুণাধারা লাভ করার সৌভাগ্য আমি অর্জন করবো। তিনি আমার হৃদয়ে আসন পাতবেন, আমার অনুভূতিতে ধরা দেবেন। আমি তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারবো।

ভারতবর্ষের অন্যতম আধ্যাত্মিক সাধক শ্রী অরবিন্দ। আমেরিকার বড় বড় লাইব্রেরিতে বসে আমি তার বই পড়েছি। স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়েছি। রুমির কবিতা পড়েছি। আমি নবীজী (স)-এর জীবনী পড়েছি, পরবর্তীতে নিজে লিখেছি। ভারতের পন্ডিচেরিতে শ্রী অরবিন্দের আশ্রমে গিয়েছি, তুরস্কের কনিয়া'য় রুমির সমাধিতে গিয়েছি। নবীজীর রওজা'য় গিয়েছি, তাঁকে হামদ্-নাত শুনিয়েছি।

আমি উপলব্ধি করেছি–তাঁরা সবাই প্রেমের কথা বলেছেন, মিলনের কথা বলেছেন। মানুষকে ভালবাসার কথা বলেছেন। যে মানুষ প্রেমকে, মমতাকে মূল্য দেয় সব থেকে বেশি, সে-ই শ্রেষ্ঠ।

আমি অনুভব করেছি–তাঁরা কেউই বিরোধের কথা বলেন নি, কাউকে কষ্ট দেয়ার কথা বলেন নি। কাউকে ছোট করার বা অসম্মান করার কথা বলেন নি, বরং সবাইকে হৃদয়ের উষ্ণতায় বুকে টেনে নিয়েছেন।

আজকে আমেরিকাসহ পুরো পাশ্চাত্যে সবচেয়ে বেশি পঠিত কবিদের একজন হলেন মওলানা জালালুদ্দিন রুমি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর এই মহান সুফিসাধককে তাঁর শিষ্যরা একবার প্রশ্ন করলেন–এমন কিছু কি আছে যা নামাজের চেয়ে উত্তম? রুমি বললেন–'আছে, সেটি হলো নামাজের আত্মা'। এখানেই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব। মনকে সুন্দর করার জন্যে, আত্মাকে পবিত্র করে তোলার জন্যে এটিই দরকার।

এই যে জীবন, একে আমাদের সর্বোচ্চভাবে ব্যবহার করতে হবে। আর এটি সম্ভব কাজের মধ্য দিয়ে। অনেকে বলেন–এত কাজ, কোনোভাবেই সামলাতে পারি না। আমি তখন বলি, তুমি এত বেলা করে উঠলে কেন? সূর্যদেব সেই কখন থেকে তোমার জানালার পাশে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন। কেউ কেউ আবার বলেন, ভোরে তো উঠতেই চাই, কিন্তু পারি না। আমি ওদের বলি, সব মানুষই এক। কেবল স্বভাব-চরিত্রই তাদের আলাদা করে। আর স্বভাব পরিবর্তন করা মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। শুধু চাই আন্তরিক ইচ্ছা।

রাতারাতি বদলানোর চেষ্টা নয়, বরং প্রথমে দু-একটি স্বভাবের দিকে মনোযোগী হোন। নিদেনপক্ষে একমাসের কর্মসূচি হাতে নিন। কাজটি কেন করতে চান, সে বিষয়ে আগে নিজের মনকে বোঝান। মনকে উদ্বুদ্ধ করুন। এটি করতে আপনার বাধা কী, বাধাগুলো কীভাবে অতিক্রম করা যায় তা একটি কাগজে লিখুন। এবার শুরু করুন। বার বার চেষ্টা করুন। আপনি পারবেন। আপনার জীবন সত্যিই একসময় ইতিবাচকভাবে বদলে যাবে।

আর, মেডিটেশনই হতে পারে এক্ষেত্রে মোক্ষম ও কার্যকর একটি উপায়। এ কারণে প্রতিটি ধর্মে মোরাকাবা, ধ্যান, মেডিটেশন, আত্মনিমগ্নতা, মৌনতার কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। মেডিটেশন জীবন থেকে নেতিবাচক সমস্ত কিছু দূর করে আমাদেরকে ইতিবাচক শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলে।

আমেরিকাতেও দেখেছি, যেকোনো কাজে কিংবা চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ওরা মেডিটেশন-করা লোকজনকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এর কারণ হলো, এসব মানুষের স্থূলতা ও ভোগবাদিতার দিকে ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা কম। এবং এরা তুলনামূলক ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে ও বেশি কাজ করতে সক্ষম।

> কোয়ান্টাম জীবনকে সুন্দর করার কথা বলে, সুন্দর জীবনের দিকে পথনির্দেশ করে। মানুষকে কর্মময় জীবনের পথে উদ্বুদ্ধ করে। সবমিলিয়ে বলতে পারি, কোয়ান্টাম মেথড আমাদের হৃদয়কে জাগিয়ে তোলে।

আমার খুব ভালো লাগে যে, কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের মধ্য দিয়ে মহাজাতক সবার সামনে এই বিষয়টিই তুলে ধরছেন। এ কোর্সে আমি নিজে অংশ নিয়েছি এবং প্রভূত উপকার পেয়েছি। আমি দেখেছি, কোয়ান্টাম জীবনকে সুন্দর করার কথা বলে, সুন্দর জীবনের দিকে পথনির্দেশ করে। মানুষকে কর্মময় জীবনের পথে উদ্বুদ্ধ করে। সবমিলিয়ে বলতে পারি, কোয়ান্টাম মেথড আমাদের হৃদয়কে জাগিয়ে তোলে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন :
ডা. আতাউর রহমান

হাসুন, আনন্দে বাঁচুন



হাসুন, প্রাণখুলে হাসুন

রোগী গেলেন ডাক্তারের কাছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন–হার্টের সমস্যা, কিছু ওষুধ লিখে দিচ্ছি, নিয়ম মতো খাবেন। আর আপাতত কিছুদিন ভারী পরিশ্রম হয় এমন কাজগুলো করবেন না, অন্তত একমাস সিঁড়ি ভাঙা পুরোপুরি নিষেধ।

মাসখানেক পর রোগী পুনরায় গেলেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার সব দেখেশুনে বললেন, আপনার হার্টের অবস্থা আগের চেয়ে ভালোই মনে হচ্ছে, এখন আর সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করতে কোনো অসুবিধা নেই। এই শুনে রোগী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন– 'উফ্, বাঁচালেন ডাক্তার সাহেব, পানির পাইপ বেয়ে প্রতিদিন বাসায় ওঠা যে কী কষ্টের, এই কদিনে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি!'

জানি বলবেন, পুরনো কৌতুক। তা বটে। কিন্তু দরকার কী হাসি থামানোর? আপনি না হয় নতুন করেই হাসলেন। তাতে ক্ষতি নেই, বরং লাভ আছে ঢের। তাই হাসুন, প্রাণখুলে হাসুন। আনন্দে বাঁচুন।

হাসিতে সুস্বাস্থ্য! সুখনিদ্রা ও অটুট স্মৃতিশক্তি!

সুস্বাস্থ্যের সর্বোত্তম দাওয়াই হতে পারে হাসি। খোদ চিকিৎসকরাই বলছেন এমন কথা। স্বাস্থ্যের ওপর হাসির প্রভাব নিয়ে প্রথম গবেষণা করেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডা. উইলিয়াম ফ্রাই। তার মতে, হাসি এক ধরনের ব্যায়ামের কাজ করে।

প্রাণবন্ত হাসির দমকে দমকে কেঁপে ওঠে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পেট ও মুখের পেশিগুলো। ফলে চমৎকার ব্যায়াম হয় এদের এবং পর্যাপ্ত রক্তসঞ্চালন ঘটে। পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছে যায় হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও বিভিন্ন পেশিতে। শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পাশাপাশি পাকস্থলীতেও রক্তসঞ্চালন বাড়ে হাসিতে। ফলে হজম প্রক্রিয়া ভালো হয়।

স্বাস্থ্য-গবেষকরা হাসিকে অভিহিত করেছেন 'ইন্টারনাল জগিং' হিসেবে। ক্যালিফোর্নিয়ার লোমা লিন্ডা ইউনিভার্সিটির মেডিসিনের প্রফেসর ডা. লি ব্রেক বলেন, হাসি কখনো কখনো সত্যিকার ওষুধের মতোই কাজ করে।

হাসিতে শিরা ও ধমনী-পথে রক্ত চলাচল সুষম হয়, ফলে দেহকোষে অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়ে। তা-ই শুধু নয়, রক্তনালীর, বিশেষত ধমনীর অযাচিত সংকোচন রোধেও হাসির রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর প্রিভেন্টিভ কার্ডিওলজি পরিচালিত গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, হাস্যপ্রবণ মানুষদের হৃৎস্বাস্থ্য তুলনামূলক ভালো থাকে।

হাসি আপনার শারীরিক মানসিক আবেগীয় স্বাস্থ্য ভালো রাখে। মনের বোঝা কমায়। আপনি কিছুটা হলেও ভারমুক্ত হন। তাতে সাইকো-সোমাটিক ডিজিজ বা মনোদৈহিক রোগে ভোগার আশঙ্কা স্বাভাবিকভাবেই কমে।



এছাড়াও টেনশনজনিত মাথাব্যথা ও মাইগ্রেন নিরাময়ে হাসির ভূমিকা ইতোমধ্যে একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত।

হাসিতে পেশির সংকোচন কমে, পেশি শিথিল হয়। সে কারণেই বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন–এটি ভালো ঘুমে সহায়ক। বলা হচ্ছে, হাসি ইনসমনিয়া থেকে মুক্তি দিতে পারে।

হাসিখুশি থাকুন। অটুট থাকবে আপনার স্মৃতিশক্তি। যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স মেডিকেল স্কুলের একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, হাসি স্মৃতিশক্তি ও শেখার ক্ষমতা বাড়ায়। সৃজনশীলতা হয়ে ওঠে শাণিত। সবসময় হাসিখুশি থাকেন এমন মানুষদের ওপর গবেষণা চালিয়েই মিলেছে এসব তথ্যপ্রমাণ।

হাসিতে ব্যথা উপশম!

হাসি আপনার ব্যথা ও শারীরিক যন্ত্রণার অনুভূতি কমায়। আনন্দময় প্রাণখোলা হাসিতে মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে নিঃসৃত হয় এন্ডোরফিন, যা ব্যথার অনুভূতি কমিয়ে দেয়।

একবার প্রাণখোলা হাসি শরীরের মাংসপেশিকে শিথিল রাখতে পারে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন-এ প্রকাশিত একটি গবেষণা-প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১০ মিনিটের উচ্ছল হাসি পরবর্তী দুঘণ্টা পর্যন্ত ব্যথামুক্তির কাজ করতে পারে।

হাসি যে কেবল ছোটখাটো ব্যথার অনুভূতি কমায় তা নয়, স্প্যানিশ মেডিকেল জার্নাল র‍্যাবিস্তা দ্য এনফারমারিয়া-র একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, পেশি ও হাড়ের দীর্ঘদিনের ব্যথা (Chronic musculoskeletal pain) উপশমে হাসি হতে পারে এক দারুণ কার্যকরী ওষুধ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

হাসুন। বাড়বে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। সদা হাস্যময় ও উৎফুল্লচিত্ত থাকেন যারা, তাদের রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকে অধিকতর সংহত।

দেখা গেছে, এ ধরনের মানুষের ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম উপাদান গামা ইন্টারফেরন ও টি সেল-এর কার্যকারিতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে। আর তাতে কমে রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি। হাসিকে তাই ন্যাচারাল এন্টিবায়োটিক বা প্রাকৃতিক জীবাণুরোধী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

হাসির রয়েছে ক্যান্সার প্রতিরোধী ক্ষমতা। স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় আমাদের শরীরে প্রতিনিয়তই তৈরি হচ্ছে ক্যান্সার সেল। কিন্তু তা টিউমারে রূপ নেয়ার আগেই আমাদের রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ ন্যাচারাল কিলার সেল (NK Cell) ক্যান্সার সেলগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। আমেরিকার ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, নিয়মিত হাসিতে ন্যাচারাল কিলার সেল-এর কার্যকারিতা বাড়ে। রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, ক্যান্সার একবার হয়ে গেলে তা নিরাময়ে হাসির কোনো ভূমিকা আছে কি না–সেটি এখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নি বটে, কিন্তু ক্যান্সারের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার উদ্যম যোগাতে পারে হাসি।

হাসুন, সুখী হবেন

হাসি আপনাকে সুখী করে। বাড়ায় আপনার ইতিবাচকতা বোধ। আপনাকে স্ট্রেস থেকে দূরে রাখে। জীবনের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। স্থায়ী করে আপনার আনন্দের অনুভূতি।

আমাদের চারপাশের বন্ধু-প্রিয়জন-আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যাদের আমরা পছন্দ করি, যারা তুলনামূলক জনপ্রিয়, যাদের সঙ্গ আমাদের ভালো লাগে তাদের সবার একটি জায়গায় খুব মিল–তারা হাসেন, জীবনের কোনো না কোনো কিছু নিয়ে তারা সবসময়ই থাকেন হাসিখুশি আর আনন্দ-উৎফুল্ল।

জীবন কখনোই একমাত্রিক নয়। জীবনে চলার পথে নানা উত্থানপতন আর বিচিত্র সব কারণে স্ট্রেস আসতেই পারে। কিন্তু সদানন্দ মানুষেরা খুব সহজেই এসব স্ট্রেস সামলে নিতে পারেন।

আধুনিক ধারার স্বাস্থ্য-গবেষকরা তাই বলছেন, যাবতীয় স্ট্রেস, দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপের সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক হতে পারে হাসি। কারণ, আমরা যখন নির্মল আনন্দে হেসে উঠি–হোক তা যত তুচ্ছ কারণেই–তখন কর্টিসোল আর এড্রিনালিনের মতো স্ট্রেস হরমোনগুলোর প্রভাব কমে যায়। ফলে চাপ নিয়ন্ত্রণে আসে সহজেই।

ব্যক্তিগত জীবনেই শুধু নয়, সামাজিক জীবনেও পারস্পরিক সম্পর্ককে সহজ স্বাভাবিক করে তুলতে পারে একটা ছোট্ট হাসি। আর সঙ্ঘবদ্ধ কাজেও হাসি প্রাণ সঞ্চার করে, পুনঃউদ্যম যোগায়।

আপনি হাসুন, হাসবে আপনার চারপাশ

দুঃখী নিপীড়িত মানুষের মাঝে জীবনভর হাসিমুখে সুখের ছোঁয়া বিলিয়ে গেছেন মহিয়সী মাদার তেরেসা। তার নিজের জীবনোপলব্ধি–'হাসি দিয়েই আমাদের সব সুখ আর আনন্দের শুরু'।

তাই হাসুন। সুখী হওয়ার জন্যে, মনের চাপ কমিয়ে আনন্দময় জীবনের জন্যে শিশুর মতো নির্মল আনন্দে হেসে উঠুন। মনের কোণে জমে থাকা রাগ ক্ষোভ দুঃখ হতাশা সহজেই প্রশমিত হবে।

ক্যালিফোর্নিয়ার পিপার্ডিন ইউনিভার্সিটির সাইকোলজিস্ট প্রফেসর ড. স্টিভেন সুলতানফের পরামর্শ–জীবনে হাসির পরিমাণ বাড়িয়ে দিন, আপনার জীবন সত্যিই বদলে যাবে।

ভোরে, দিনের শুরুতেই, কোনো একটি সুখস্মৃতি মনে করে হেসে উঠুন। হাসি শুকরিয়ার প্রকাশ। কথায় বলে, মর্নিং শোজ দ্য ডে। তাই আপনি হাসুন, আপনার সাথে সাথে হেসে উঠবে অন্যরাও। হাসবে আপনার চারপাশ।

গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

শ্বাসকষ্টমুক্ত হয়েছি

সৈয়দা মোবাশ্বেরা বেগম



গত সাত/ আট বছর ধরে আমি শ্বাসকষ্টে ভুগছি। বরিশালে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আমি অংশগ্রহণ করি। কোর্সের এই চার দিন মনেই ছিলো না যে, আমার কোনো অসুখ আছে। ওষুধ খাওয়া বা ইনহেলার নেয়ার কথাও আমার মনে নেই। আমি কোনো ইনহেলার ব্যবহার করি নি। আমার বিশ্বাস, নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করলে আল্লাহর রহমতে আমি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবো। এ কোর্সে গুরুজী আমাদেরকে সুস্থ জীবনযাপনের বৈজ্ঞানিক নানা টেকনিক শিখিয়েছেন, সেগুলো অনুসরণ করে আমরা সুস্থতার পথে এগিয়ে যাচ্ছি। এজন্যে আমরা সবাই গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

[সৈয়দা মোবাশ্বেরা বেগম, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার, সোনালী ব্যাংক, প্রিন্সিপাল অফিস, বরিশাল। ৩৫৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

এখন ঘুমের ওষুধ লাগে না

মো. মীর আল-আমীন



বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর পারিপার্শ্বিক নানা কারণে মানসিকভাবে আমি বেশ অস্থির ছিলাম। এই অস্থিরতায় গত আড়াই বছর ধরে রাতে আমার ঘুম হয় না। ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে হয়। প্রথমে একটি করে টেবলেট খেতাম, এক পর্যায়ে ঘুমানোর জন্যে আমাকে তিন/ চারটা করে টেবলেট খেতে হতো।

আমার পরিচিত এক ছোটভাই আমাকে প্রায়ই মেডিটেশন করার কথা বলতো। তার কাছ থেকেই মেডিটেশনের কয়েকটা অডিও ফাইল সংগ্রহ করি। বাসায় ছাদে বসে বসে আমি সেগুলো অনুশীলন করতাম। আমি অনুভব করলাম, আগের চেয়ে আমি অনেক ভালো আছি। তখন থেকে আমার ইচ্ছা কোয়ান্টামের এই কোর্সটি করার।

এই কোর্সে গুরুজী আমাদের অনিদ্রা দূর করার কিছু টেকনিক শিখিয়েছেন। সেই টেকনিক অনুসরণ করে কোর্সের প্রথম দিন শেষে আড়াই বছর পর ঘুমের ওষুধ ছাড়া ঘুমাতে পেরেছি। আমি এখন ৮০ ভাগ সুস্থ। আমি বিশ্বাস করি, শতভাগ সুস্থ হবো। ঘুম না হওয়ার কারণে আমার কথা জড়িয়ে যেতো। এখন সে সমস্যা থেকেও আমি মুক্ত হয়েছি।

আমি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে পড়াশোনা করছি। আমার প্রত্যাশা, আমি দেশের একজন নির্ভরযোগ্য ও সফল দুর্যোগ ব্যবস্থাপক হবো।

[মো. মীর আল-আমীন, অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অনুষদ, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৫৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

এখন আর গামা লেভেলে যেতে পারি না

আজমেরি হক বাঁধন



আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমি একজন সফল মানুষ। একটি আদর্শ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। স্বামী ও একটি সন্তানসহ আমার খুব সুন্দর একটি পরিবার। আমি সময়মতো সব কাজ করি। কখনো মিথ্যা কথা বলি না। ভালো কাজ করার চেষ্টা করি। এই গুণগুলো আমি আমার বাবার কাছ থেকে রপ্ত করেছি। বাবা আমার আদর্শ। এই গুণগুলোর সাথে সাথে আমি আমার বাবার রাগটাও পেয়েছি।

আমি যখন রেগে যাই তখন আর আমার কোনো হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ছোটবেলা থেকে দেখেছি, আমার বাবা ভীষণ রাগী। আমার আদর্শ যেহেতু আমার বাবা, আমার ধারণা ছিলো আমাকেও রাগী হতে হবে। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের চার দিনে আমি এই ধারণা থেকে সরে আসতে পেরেছি। গুরুজীকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, এখন আমি কোনোভাবেই রাগ করতে পারছি না।

[আজমেরি হক বাঁধন, অভিনেত্রী ও ডেন্টিস্ট। ৩৫৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আমি এখন ভয়মুক্ত

মো. নাফিস ফুয়াদ



আগে আমি খুব ভয় পেতাম। মেডিটেশন করার পর আমার ভেতরে আর কোনো ভয় নেই। আগে আমি একজনের সাথেই কথা বলতে ভয় পেতাম কিন্তু কোর্স শেষে আমি শত শত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আমার অনুভূতি প্রকাশ করতে পেরেছি। ভয় দূর করার জন্যে কোয়ান্টামে অনেক সহজ টেকনিক শেখানো হয়েছে–কোয়ান্টা ভঙ্গি, অটোসাজেশন ইত্যাদি। মনের বাড়িতে এগুলো চর্চা করে আমরা আমাদের ভয় দূর করতে পারি।

আমি পড়াশোনা করছি, কিন্তু আমার কোনো লক্ষ্য ছিলো না। এখন আমি আমার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। আমি একজন বিজ্ঞানী হতে চাই।

[মো. নাফিস ফুয়াদ, স্ট্যান্ডার্ড-ফাইভ, মেথডিস্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। ৩৫৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

> যখন অভ্যাসের ওপর শুধুমাত্র আপনারই নিয়ন্ত্রণ থাকবে, তখনই আপনি অর্জন করবেন সত্যিকার স্বাধীনতা।

রাগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক

প্রফেসর ডা. এম এ খলিলুর রহমান



কোয়ান্টাম কোর্সের চারটি দিন আমার খুব ভালো লেগেছে। এর কারণ, আমার কিছু নেতিবাচক বিষয় ছিলো। যেটা যেভাবে হওয়া দরকার সেটা সেভাবে না হলে আমি রাগ হয়ে যাই। রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমি মনে করি, একে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কোর্সে এসে দেখলাম, লেখা রয়েছে–রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। কথাটি আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি ধীরে ধীরে এখন রাগ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি।

'পাছে লোকে কিছু বলে' এ ধরনের একটি সমস্যা আমার মধ্যে ছিলো। এখন অনুভব করেছি, এগুলোও রাখা যাবে না। সাহসী হতে হবে। কারণ মনে সাহস না থাকলে সামনে এগুনো যায় না।

আমার ধারণা, ১০ বছর আগে যদি এ কোর্সটি করতে পারতাম, তাহলে অনেক ভালো থাকতে পারতাম। এখন বিশ্বাস করি, কোর্সের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আমি আরো কার্যকরভাবে রোগীদের পরামর্শ দিতে পারবো।

[প্রফেসর ডা. এম এ খলিলুর রহমান, ডার্মাটোলজিস্ট, ভাইস প্রিন্সিপাল (অবসরপ্রাপ্ত), শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল। ৩৫৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নিজের শক্তি ও সম্ভাবনায় বিশ্বাস করেছি

ডা. রাশিন সাবা



আমি ব্লু বেল্টধারী, মার্শাল আর্ট চর্চা করি। এ বিদ্যা শেখার একটা পর্যায়ে আমাদের চোখ বন্ধ রেখে প্রতিপক্ষের আক্রমণকে প্রতিহত করতে হতো। বাতাসের তরঙ্গ অনুভব করে তা করতে হতো। তখন থেকেই নিজে নিজে মেডিটেশন করতাম। কিন্তু মনে হতো, একটা শূন্যতা, আমার মধ্যে কী যেন নেই।

প্রতিযোগিতামূলক এ পৃথিবীতে নিজের অবস্থান গড়ে তোলার জন্যে আমাকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু এ কোর্সে আসার পর আমার মনে হয়েছে, আরো আগে নিজেকে তাগিদ দিয়ে যদি এ কোর্সটি করতে পরতাম, তাহলে আমার চলার পথ আরো সুন্দর আরো গতিময় হতো।

এ কোর্স করার মাধ্যমে আমার ভেতরের যে শক্তি, সম্ভাবনা আছে তা বিশ্বাস করতে পেরেছি। চিকিৎসকের মতো একটি মহান পেশায় থেকে চারপাশের সবাইকে আমি অনেক সেবা দিতে পারি।

[ডা. রাশিন সাবা, ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৫৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কোয়ান্টামে সার্বজনীন রূপ পেয়েছে মেডিটেশন

অধ্যাপক ড. আমানত উলস্নাহ খান



মেডিটেশনকে একটি সার্বজনীন রূপ দিয়েছে কোয়ান্টাম। এটি একটি সুন্দর প্যাকেজিং। কারণ উচ্চতর পড়াশোনার জন্যে আমি উত্তর আমেরিকায় প্রায় ১০ বছর থেকেছি। সেখানে দেখেছি, পার্সোনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত অনেক কোর্স তারা করে। যারা যত বেশি ডেভেলপড তারা তত বেশি এ ধরনের কোর্সে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু কোয়ান্টামের মতো পৃথিবীর কোথাও এমন নেই যা একইসাথে সব বয়সের সব ধরনের মানুষের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য।

কোর্সের চতুর্থদিন বান্দরবান লামায় কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ভিডিওচিত্রটি মেডিটেশনের মতোই আমাকে উদ্দীপিত করেছে। সত্যিই আমি অত্যন্ত আনন্দিত। যেটা হলে আমি সবচেয়ে খুশি হতাম কোয়ান্টামের কার্যক্রম সেই দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। কোয়ান্টামের কার্যক্রম সম্পর্কে আমার অনেক প্রশ্ন ছিলো, যেগুলোর যথাযথ উত্তর সেদিন পেয়েছি। আমি প্রার্থনা করি দেশের আরো বহু জায়গায় এ রকম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক।

অধ্যাপক ড. আমানত উল্লাহ খান, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৫৬ ব্যাচে অংশগ্রহণ করেছেন

আমি আর একা নই

আলীম আল রাজী



আগে ক্যাসেট দিয়ে মেডিটেশন করতাম। কিন্তু বাস্তবের সাথে এর সম্পর্ক বুঝতাম না। গুরুজীর কথামতো আমি কোর্সের নিজস্ব প্রক্রিয়ার সাথে চলার চেষ্টা করেছি। এখন আমি উপলব্ধি করছি গুরুজীর শেষ কথাটি যে, আপনি একা নন। আসলেই কাছে থেকেও যাদের আমি অনুভব করতে পারতাম না। মনে হতো, চারপাশের কেউ আমাকে বোঝে না। এখন তাদের সবাইকে অনেক আপন মনে হয়।

আমার ছয় বছরের পুরনো কোমরব্যথা ছিলো। প্রথম দিন কোর্সে বসে থাকতে অনেক কষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয় দিন থেকে আমার সে ব্যথা একেবারেই নেই। ঘাড়ব্যথা ছিলো, সেটাও এখন একেবারেই নেই। আমার মধ্যে আরো যে নেতিবাচকতা ছিলো, সেগুলো থাকার কারণ আমি খুঁজে পেয়েছি। পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এখন এ প্রক্রিয়ার সাথে লেগে থাকতে হবে।

[আলীম আল রাজী, পিএইচডি ফেলো, কনসালটেন্ট, সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড কমিউনিকেশন। ৩৫৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সুস্থ হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে প্রত্যেকের মধ্যেই

ডা. ফাতেমা তুজ জোহরা



আমার আম্মার হাতে পায়ে ব্যথা ছিলো। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, ওষুধ খেয়েছেন কিন্তু ব্যথা কমে নি। কোয়ান্টাম কোর্সের প্রথমদিন ক্লাস শেষে বাসায় গিয়ে আম্মাকে কিছু অটোসাজেশন শিখিয়ে দিলাম এবং রাতে ঘুমানোর সময় সেগুলো বলতে বললাম। পরের দিন সকালে আম্মা বললো, তার ব্যথা অনেক কম মনে হচ্ছে। এ থেকে আমি উপলব্ধি করলাম যে, সুস্থ হওয়ার জন্যে মানুষের ভেতরের শক্তি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কিন্তু ওষুধের পাশাপাশি রোগীকে যখন কিছু সময় দেই, বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নেই, কাউন্সেলিং করি, তখন একই ওষুধে সে দ্রুত সুস্থ হয়ে যায়। কোয়ান্টামের এ কোর্সে এসে সে বিষয়ে আমার ধারণা আরো স্বচ্ছ হয়েছে।

[ডা. ফাতেমা তুজ জোহরা, মেডিকেল অফিসার, উজিরপুর হেলথ কমপ্লেক্স, বরিশাল। ৩৫৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আমি এখন সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষ

রুনা নাজমুন নাহার



আমি ছিলাম প্রচন্ড রাগী একজন মানুষ। কারো কোনো কথাই সহ্য হতো না। কেউ কুশল জিজ্ঞেস করলে আমি মনে মনে বলতাম, কেমন আছি তা দিয়ে আপনার দরকার কী! আমার একটাই সন্তান, সেও যদি আমাকে মা বলে ডাক দেয়–তাকে আগে একটা বকা দেই তারপর জবাব দেই। এসব আচরণে মাঝে মাঝে আমি নিজেও অনুতপ্ত হই কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না।

আমার কোমরে ব্যথা আছে। আমার চিকিৎসক হাজব্যান্ডসহ অন্যান্য ডাক্তাররা বলেন, এর কারণ মানসিক অস্থিরতা। ওষুধ খেয়ে যাচ্ছিলাম। কোমরব্যথায় বেশিক্ষণ বসে কাজ করতে পারি না। কোর্সে এসে প্রথম দিন থেকেই বেশ ভালো লাগছিলো। সারাদিন একটানা ১০ ঘণ্টা বসে থাকার পর বাসায় গিয়ে কোটাবাছাসহ রান্না করে সবাইকে খাইয়েছি। আমার কোনো কষ্ট হয় নি।

আল্লাহর অশেষ রহমতে কোর্সে অংশগ্রহণ করার পর থেকে গত চার/ পাঁচ বছরের সে কোমরব্যথা আর নেই। রাগও নিজের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এখন আমি সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষ।

[রুনা নাজমুন নাহার, গৃহিণী। ৩৫৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

বিশ্বশান্তিতে অনন্য ভূমিকা রাখবে কোয়ান্টাম

নজরুল ইসলাম



পেশাগত স্ট্রেসের কারণে বেশ কয়েক বছর হলো আমার স্পন্ডিলাইটিস ধরা পড়ে। এক জার্মান ডাক্তার বললেন, ডিস্ক বড় হয়ে গেছে, অপারেশন লাগবে। তবে সে অংশ আর নাড়ানো যাবে না। আরেক শুভাকাঙ্ক্ষীর পরামর্শে ফিজিওথেরাপি নিয়েছি। তাতেও কাজ হয় নি। সবশেষে কোয়ান্টামে এসে আমি নিরাময় পেলাম।

আমি একজন ধূমপায়ী। গত ২৫ থেকে ৩০ বছর আমি ধূমপান করি। ধূমপান ছাড়ার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছি। পরিবারে স্ত্রী-সন্তানরা সবাই ব্যর্থ। কানাডা থেকে ওষুধ আনিয়েছি, ওষুধ ছাড়ার পর আবার সে নিকোটিনের নেশা। কিন্তু কোর্সে গুরুজীর যে টেকনিক, সেটা অনুসরণ করার পর থেকে সিগারেট আর মুখে নিতে পারি নি। এমনকি সিগারেটের নেশাও হয় না।

আমার পরিবারের সবাই কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। তারা সবাই আমাকে কোয়ান্টাম কোর্স করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছে। অত্যন্ত গোছানো ও সুন্দরভাবে মানুষের মনের গভীরে মেডিটেশন পৌঁছে দেয়ার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো কোয়ান্টাম। আমি মনে করি, বিশ্বশান্তির জন্যে কোয়ান্টাম পদ্ধতিতে মেডিটেশনের একটি অনন্য ভূমিকা আছে এবং থাকবে।

[নজরুল ইসলাম, প্রধান আইসিটি কর্মকর্তা, জাতিসংঘ মানবিক সমন্বয় সংস্থা, আফগানিস্তান। ৩৫৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

অপারেশন ছাড়াই ব্যথামুক্ত

মহুয়া সাহা



এইচএসসি'র পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিই। একটাই লক্ষ্য ছিলো যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বো। সে সুযোগ না পেয়ে মনে হয়েছে, আমাকে দিয়ে আর কিছুই হবে না। আমার ক্যারিয়ার এখানেই শেষ। কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর এখন আমি খুবই আত্মবিশ্বাসী। মনে হয়, সবই পারবো।

দেড় বছর আগে আমার ডান হাতের মধ্যমা আঙুলে ব্যথা পেয়েছিলাম। ডাক্তাররা সবাই বলেন, অপারেশন করাতে হবে এবং সারাজীবনের জন্যে আমার ভারী কিছু তোলা নিষেধ। প্রতিদিন আমাকে পেইনকিলার খেতে হতো। কিন্তু আমি এখন সব কাজই করতে পারি। ওষুধ খেতে হয় না। আর আমার অপারেশনও করতে হবে না।

[মহুয়া সাহা, এইচএসসি সম্পন্ন করেছেন। ৩৫৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *আমি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি। এ পর্যন্ত যা মনছবি দেখেছি, শোকর আলহামদুলিল্লাহ, সবই পূরণ হয়েছে। এখন আমার স্বপ্ন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হওয়া। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি, আমার শিক্ষক এবং আমার আশেপাশের কারো কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা না পাওয়ায় মনছবির পথে নিজেকে এগিয়ে নিতে পারছি না। বরং নেতিবাচকতায় আক্রান্ত হচ্ছি। আপনার নির্দেশনার অপেক্ষায়।*

উত্তর : আল্লাহর অনেক শুকরিয়া যে, আমরা আস্তে আস্তে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছি। শ্রেষ্ঠ হওয়ার চিন্তাভাবনা আমরা করছি। ১৯৯৩ সালে আমাদের প্রথম প্রত্যয়ন ছিলো, সারা পৃথিবী আমার, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাবো। আর এ কারণেই আমাদের চিন্তা করতে হবে সারা পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে। শুধু নিজের বা নিজের চারপাশের প্রেক্ষাপটে নয়।

প্রথমত, আসলে আশেপাশের লোকজন দ্বারা কিংবা তাদের কথায় কখনো প্রভাবিত হবেন না। আশেপাশের লোকজন আপনাকে সবসময় নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে চাইবে। চারপাশের মানুষ যেহেতু নেতিবাচক, তাদের মধ্যে সেই বিশ্বাস আর সেই আস্থা নেই। তারা বিশ্বাসই করতে পারে না যে, আপনি এত বড় বিজ্ঞানী হতে পারেন। স্বভাবতই তারা আপনার সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলবে।

দ্বিতীয়ত, আবার আশেপাশের কেউ কেউ বিশ্বাস করেও ফেলতে পারে যে, আপনি বিশ্বসেরা বিজ্ঞানী হয়ে যেতে পারেন। আপনি যাতে বড় কিছু হতে না পারেন সেজন্যে আপনাকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়ার চেষ্টা করতে পারে। আবার অনেকসময় আপনি কাউকে ছাড়িয়ে যান কি না সে চিন্তায় কেউ কেউ ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠতে পারে।

তৃতীয়ত, সবসময় মনে রাখবেন, পৃথিবীতে যত সফল মানুষ এ পর্যন্ত সফল হয়েছেন–তারা কখনো নেতিবাচকতা দিয়ে প্রভাবিত হন নি। উড়োজাহাজের আবিষ্কারক রাইট ব্রাদার্স–তারা যদি পারিপার্শ্বিক নেতিবাচকতা দিয়ে প্রভাবিত হতেন তারা কখনো উড়োজাহাজ বানাতে পারতেন না।

আজকে আধুনিক সভ্যতার যত উপকরণ, তা প্রথমে বিজ্ঞানীরা চিন্তা করেছেন তারপর তাকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বাস্তবতায় রূপ দিয়েছেন। তারা নেতিবাচকতায় প্রভাবিত হলে সভ্যতা এগুতে পারতো না। কিছুই তৈরি হতো না পৃথিবীতে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যখন তার কবিতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে খ্যাতি পেতে শুরু করলেন সেসময় অনেকে তার সমালোচনা শুরু করলো। তারা রবীন্দ্রনাথকে অপদস্থ করে কবিতা লিখলো–'ঠাকুরবাড়ির রবি, সে-ও নাকি রে কবি'। রবীন্দ্রনাথ যদি তাদের এই কথা দিয়ে প্রভাবিত হতেন তাহলে তিনি আর কবিগুরু হতে পারতেন না। অতএব পৃথিবীতে সফল মানুষ কখনো নেতিবাচকতা দিয়ে প্রভাবিত হন নি।

তাই আপনি সবসময় নিজের মনছবিতে, নিজের বিশ্বাসে অটল থাকবেন। আপনার মনছবি সম্পর্কে আপনার ব্যাপারে যে-ই নেতিবাচক কথা বলবে বা আপনার নিজের মধ্যেই যদি কখনো নেতিবাচক কোনো চিন্তা আসে তবে সাথে সাথে 'তওবা তওবা' বা 'বাতিল বাতিল' উচ্চারণ করবেন। শয়তান তাড়ানোর দোয়া পড়বেন। শয়তান যেহেতু সরাসরি পারছে না তাই নেতিবাচকতার রূপ নিয়ে সে আপনার লক্ষ্য থেকে আপনাকে নিবৃত্ত করতে চাইছে। তাই সবসময় বিশ্বাসে অটল থাকবেন যে, আপনি আপনাকে লক্ষ্যে পৌঁছাবেনই। এর পাশাপাশি আপনি আপনার দিক থেকে যা যা করার আছে তার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিন।

প্রশ্ন : *আমার স্বামী নয় বছর হলো মারা গিয়েছেন। আমার মেয়ের বয়স ছিলো দুই বছর চার মাস। আমার স্বামী ও আমার ইচ্ছা ছিলো মেয়েকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াবো। মারা যাওয়ার চারদিন আগেও তিনি এ কথা বলেছেন। আমি বলতাম, ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে অনেক টাকা লাগবে। কোথা থেকে পাবো? আমার স্বামী বলতেন, নিয়ত করেছি। আল্লাহ জোগাবে। আমি মেয়েকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াচ্ছি। কিন্তু এখন সবাই বলে, ইংলিশ ভার্সনে দিতে। আমার আর্থিক সমস্যাও আছে। আমি এখন কী করবো? মেয়েকে ইংলিশ ভার্সনে পড়াবো নাকি ইংলিশ মিডিয়ামেই রাখবো? পরামর্শ চাই।*

উত্তর : এখানে কথা হচ্ছে, ইংলিশ মিডিয়ামে কেন পড়াবেন? ইংরেজি যাতে ভালো জানে, সে কারণেই তো। মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে ইংরেজিতে তাকে দক্ষ করে তোলা। কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামের অসুবিধা একটা জায়গায়–ওখানে তারা শুধু ইংরেজিই শেখে না, পাশাপাশি ইংলিশ কালচারও আয়ত্ত করে ফেলে। সাথে ফেসবুক ডেটিং মিটিং এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। সাধারণভাবে এটাই হয়। অবশ্য এর বাইরেও ইংলিশ মিডিয়ামে আমরা অনেক ভালো ছেলে-মেয়েকেও দেখেছি। কিন্তু তারা ব্যতিক্রম।

অন্যদিকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করলে আপনার সন্তান ইংরেজিতে যতটা দক্ষ হবে ন্যাশনাল কারিকুলাম ইংলিশ ভার্সনে পড়াশোনা করলেও সে একই রকম দক্ষ হবে। আর ইংলিশ ভার্সনে পড়াশোনার সুবিধাটা হচ্ছে, সে আমাদের দেশেই উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারবে। সেটি তার জন্যে সহজ হবে।

অন্যদিকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে এ-লেভেল ও-লেভেল করার পরে অধিকাংশই আমাদের দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিংবা বুয়েট বা মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে তারা খুব একটা সুবিধা করতে পারে না। এটা বাস্তবতা। তখন তাদেরকে পড়াতে হলে বিদেশে পড়াতে হবে। এখন ইংলিশ ভার্সনে দিলে আপনার স্বামীর ইচ্ছাও পূরণ হলো, সেইসাথে ইংলিশ ভার্সনে পড়ে এসএসসি, এইচএসসি করার পরে দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়ার সুযোগ পাওয়া তার জন্যে সহজ হবে। তাই ইংলিশ মিডিয়ামের চেয়ে ন্যাশনাল কারিকুলাম ইংলিশ ভার্সন সবদিক থেকেই তুলনামূলক ভালো।

প্রশ্ন : *আমি ডায়াবেটিস ও আর্থ্রাইটিসে ভুগছি। এছাড়াও প্রায়ই ঠান্ডার সমস্যা ও কাশিতে আক্রান্ত হই। নিরাময়ের মনছবি কীভাবে দেখবো?*

উত্তর : ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে আপনি মনছবি দেখতে পারেন যে, আপনার প্যানক্রিয়াসে পর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে। সেই ইনসুলিন রক্তে আসছে। তারপর যেই সুগারটাকে পাচ্ছে বার্ন আউট করে দিচ্ছে। আর আর্থ্রাইটিসের জন্যে অর্থাৎ ইউরিক এসিড জমে গেলে মনের বাড়ির হিলিং সেন্টারে গিয়ে অবলোকন করুন–যত জায়গায় ইউরিক এসিড জমে আছে, ডাক্তার নারিকেল কোরানি দিয়ে সব আঁচড়ে আঁচড়ে তুলে ফেলছে। তারপর ভালোমানের একনম্বর গ্রিজ লাগিয়ে দিচ্ছে। এবং সব ব্যথাবেদনা চলে যাচ্ছে। এছাড়াও দেখতে পারেন যে, বড় বড় চুম্বক লাগিয়ে দেয়া হয়েছে ব্যথার জায়গায়। এবং সমস্ত ব্যথা চুম্বক টেনে নিয়ে বের করে দিচ্ছে।

আসলে এক্ষেত্রে এতসব দেখার উদ্দেশ্য একটাই–আপনার ব্রেনে প্রোগ্রাম দেয়া যে, আমার এখানে অসুবিধা, অতএব এখানে মনোযোগ দাও। আর নিরাময়ের জন্যে এ মনোযোগটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন : *আমি ডেন্টাল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। অল্প কিছুদিন পরই আমার পরীক্ষা। কিন্তু গুরুজী, লেখাপড়ার কোনো চিন্তা আমার মধ্যে নাই। পড়ার আগে অটোসাজেশন দিই ঠিকই, কিন্তু একটু পরই ঢুঁ মারি ফেসবুকে। তারপর সেখানে আটকে যাই। এভাবে একসময় রাত শেষে ভোর হয়ে যায়। তারপর আর পড়ার সময় থাকে না। আর পড়তে বসলে পারিপার্শ্বিক নানান অপ্রয়োজনীয় কথা মাথায় আসে। একবার একটা মনছবি দেখি, আবার বদলে ফেলি। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি যে, কোনটা আমার জন্যে সঠিক। মাঝেমাঝে মনছবিকে অনেক কঠিন মনে হয়। আর যখনই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি তখনই ফেসবুককে সঙ্গী করে নিই এবং লেখাপড়ার কথা ভুলে যাই।*

উত্তর : আপনি বলেছেন, অটোসাজেশন দিয়ে পড়তে বসে আপনি ঢুকে পড়েন ফেসবুকে। তাহলে কী হবে? শেষপর্যন্ত ফেসবুক আসক্ত হয়ে আপনি একটা আসক্ত মানুষের জীবনযাপন করবেন, যা কোনোভাবেই স্বাভাবিক নয়। যারা ফেসবুকে আছেন কখনোই ফেসবুকে আধঘণ্টার বেশি সময় ব্যয় করবেন না–যদি সুস্থ জীবন চান। এর বেশি হলে একটু একটু করে এটা আপনার অসুস্থতার পর্যায়ে চলে যাবে। ধীরে ধীরে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন। আপনার পড়াশোনা, ক্যারিয়ার সবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অতএব আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে এই ফেসবুক আসক্তি থেকে যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে আসা। না হলে আপনার জীবনে কখনো সুখ আসবে না। শান্তি আসবে না। যেমন আসক্ত মানুষের জীবনে কোনো শান্তি আসে না। এটা করতে প্রথমে আপনার কষ্ট হবে। যেকোনো মাদকাসক্তেরই যেমন মাদকের আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসাটা কষ্টের। কিন্তু যখন সে বেরিয়ে আসে তখন সে অনন্ত কল্যাণ আর আনন্দময় জীবনের সন্ধান পায়। তাই প্রথমত ফেসবুক আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করুন। তারপর ঠান্ডা মাথায় জীবনের লক্ষ্য স্থির করে মনছবি দেখুন এবং পড়াশোনায় মনোনিবেশ করুন।

এ মাসের অটোসাজেশন

গালগল্পে বা আড্ডায় সময় না কাটিয়ে আমি তা সেবামূলক কাজে ব্যয় করবো।



পান্তাপিয়ার স্বাদে কোয়ান্টাম বর্ষবরণ

বাংলা বছরের প্রথম সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বাঙালিরা জেগে ওঠে নববর্ষের উৎসবমুখরতায়। এবারও ব্যত্যয় ঘটে নি এই সার্বজনীন আনন্দের। আর কোয়ান্টাম পরিবারের বর্ষবরণ মানেই নগরের তপ্ত রোদে নববর্ষের উৎসবে যোগ দেয়া হাজার হাজার মানুষকে তেঁতুল গুড়ের শরবত পান করানো। এ বছর বর্ষবরণের আনন্দকে আরো বাড়িয়ে দিতে যোগ হলো নতুন বৈশাখী মেন্যু পান্তাপিয়া। চিরচেনা পান্তাভাতের সাথে তেলাপিয়া মাছ ভাজা সাথে আলুভাজি, পেঁয়াজ, শুকনো মরিচভাজা–এই হলো পান্তাপিয়া। নববর্ষের আনন্দকে দুর্মূল্যের ঐতিহ্যের ছকে না বেঁধে সবার সাথে ভাগ করে নিতেই কোয়ান্টাম পরিবারের এই আয়োজন। দেশের বিভিন্ন স্থানে এই পান্তাপিয়ার স্বাদ নেয়ার পাশাপাশি সূর্যোদয়ের সাথে সাথে কোয়ান্টাম থিম সং বাজিয়ে স্বাগত জানানো হয় নতুন বছর ১৪২০। সঙ্ঘবদ্ধতা আর বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলার প্রত্যয় সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে পথে প্রান্তরে, পার্কে, উন্মুক্ত স্থানে আয়োজন করা হয় বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। এছাড়াও দেশজুড়ে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সেন্টার-শাখা-সেলগুলো আয়োজন করে বর্ষবরণের আলোচনা, যৌথ মেডিটেশন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। দেশের বাইরেও লন্ডন, সিডনি, মেলবোর্ন, আবুধাবিসহ বিভিন্ন জায়গায় কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা উদযাপন করেন কোয়ান্টাম বর্ষবরণ।



পান্তা আর তেলাপিয়া মাছের স্বাদে বর্ষবরণে পান্তাপিয়ার আয়োজন করেন মোহাম্মদপুর শাখার কোয়ান্টিয়াররা



এবার বৈশাখে পান্তাপিয়ার আয়োজনে ছিলো পান্তাভাতের সাথে ভাজা তেলাপিয়া মাছ, পেঁয়াজ আর শুকনো মরিচ



বনানী শাখা কার্যালয়ে বর্ষবরণে আনন্দ সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবারের সদস্যরা



সিডনি অলিম্পিক পার্কে বাংলাদেশি কমিউনিটি আয়োজিত বৈশাখী মেলায় কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের স্টল



বগুড়া শাখা কার্যালয়ে আনন্দঘন পরিবেশে বর্ষবরণ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কোয়ান্টিয়াররা



গেন্ডারিয়া শাখার উদ্যোগে বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে মিলব্যারাক জেটিতে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান



হবিগঞ্জ আর ডি হল প্রাঙ্গণে বাংলা নতুন বছরকেও শপথ গ্রহণের মাধ্যমে বরণ করে নেন কোয়ান্টাম সদস্যরা



গুলশান জাস্টিস সাহাবুদ্দিন পার্কে অনুষ্ঠিত বর্ষবরণে মেডিটেশন করছেন কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা



খুলনা ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় প্রাতঃভ্রমণকারীদের নিয়ে উন্মুক্ত স্থানে আয়োজিত বর্ষবরণ



কুমিলস্না ধর্মসাগর পাড়ে অবস্থিত মহিলা মহাবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত বর্ষবরণ অনুষ্ঠান



অস্ট্রেলিয়ায় মেলবোর্নে প্রিন্সেস পার্কে অনুষ্ঠিত বৈশাখী মেলায় কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি মেলবোর্নের স্টল



ময়মনসিংহ পার্কে বৈশাখী মেলায় কোয়ান্টামের স্টলে কণিকা সংগ্রহ করছেন আগতরা

ধানমন্ডিতে ফাউন্ডেশনের বর্ষবরণে কামাল লোহানী

আত্মবিশ্বাস জীবনকে আনন্দময় করে তোলে



জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে নববর্ষ আমাদের সবার জন্যেই একটি সার্বজনীন আনন্দের উপলক্ষ। আর জীবনের আনন্দকে পুরোপুরি উপভোগ করতে হলে, জীবনকে আনন্দময় করে তুলতে হলে আমাদের বিশ্বাসের শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে। আত্মবিশ্বাসে উজ্জীবিত করে তুলতে হবে নিজেদের।

ধানমণ্ডি লেক প্রি-সেল আয়োজিত বঙ্গাব্দ ১৪২০ বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে 'বিশ্বাসের আলোকে বদলাবো নিজেকে' শীর্ষক আলোচনায় এ কথা বলেন প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সাংবাদিক ও জাতীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী। পহেলা বৈশাখ বিকেলে ধানমণ্ডি লেক-সংলগ্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে ফাউন্ডেশনের সদস্য ও এসোসিয়েটসহ উপস্থিত ছিলেন ১২ শতাধিক মানুষ।

প্রধান অতিথি বলেন, আমরা যখন সত্যিকারভাবে নিজের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবো, আত্মশক্তিতে উদ্দীপ্ত হতে পারবো তখনই আমরা নিজেদের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হবো। আর এ কাজটি যারা পেরেছেন তারা প্রকৃত অর্থেই আনন্দপূর্ণ জীবনের অধিকারী হয়েছেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে তাদের অনুতাপ করতে হয় নি।

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের ও নানা শ্রেণী-পেশার মানুষের উপস্থিতি দেখে তিনি বলেন, হাজার বছরের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথ ধরে আমরা জানি, জাতি হিসেবে আমরা আসলেই উদার-মানবিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেতনায় উদ্বুদ্ধ। এখানে শত শত বছর ধরে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একসাথে সুখে-দুঃখে পাশাপাশি বাস করেছেন। আর প্রত্যেকটি ধর্ম তো আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। শান্তির কথা বলে, মানুষে মানুষে মিলনের কথা বলে।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে কামাল লোহানী বলেন, নববর্ষ উদযাপনের মতো এ চিরায়ত উৎসবকে সামনে রেখে এমন এক সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্যে আমি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাই।

আলোচনাপর্ব শেষে উপস্থিত সবাই মিলে 'সুখী জীবন'-এর মেডিটেশনে অংশ নেন।

সবশেষে ছিলো কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ পর্বে উপস্থিত অতিথিদের গান গেয়ে শোনান খ্যাতিমান সংগীতশিল্পী ইবরার টিপু, নির্ঝর, সুমাইয়া ফারাহ খান ও অন্যান্যরা।

নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বস্নাড ক্যাম্প ॥ একটি ক্যাম্প থেকে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ রক্ত সংগ্রহ



ঢাকার বসুন্ধরায় নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে ৩১ মার্চ থেকে অনুষ্ঠিত হয় চারদিনব্যাপী একটি ব্লাড ক্যাম্প। চারদিনের এ ক্যাম্প থেকে সংগৃহীত হয় মোট ৮০৯ ব্যাগ রক্ত। বাংলাদেশে এটিই এক ক্যাম্পের সর্বাধিক সংগ্রহ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংগঠন সোশ্যাল সার্ভিস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত এ ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলো কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম।

'ব্লাড ডোনেশন ড্রাইভ' থিমের অংশ হিসেবে আয়োজিত এ স্বেচ্ছায় রক্তদান ক্যাম্প পরিদর্শন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সাত্তার।

দেশের শীর্ষস্থানীয় এ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০২ সাল থেকে প্রতিবছর আয়োজিত হচ্ছে স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম। সোশ্যাল সার্ভিস ক্লাবের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে বিগত বছরের তুলনায় এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী স্বেচ্ছায় রক্তদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন।

রক্ত সংগ্রহের দিক থেকে দেশের সবচেয়ে বড় এই ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনের জন্যে নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সোশ্যাল সার্ভিস ক্লাবের সকল সদস্যদের আমরা জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

কোয়ান্টাম প্রকাশিত নতুন সিডি ও ডিভিডি





'আপনি বদলান পৃথিবী বদলে যাবে' শিরোনামে ৫ এপ্রিল কোয়ান্টাম প্রকাশ করে একটি নতুন সিডি। ঢাকার আইডিইবি ভবনে শ্রদ্ধেয়া মা-জী নাহার আল বোখারী ও পরিচালক-সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান এ সিডির মোড়ক উন্মোচন করেন। কোয়ান্টাম প্রত্যয়ন ও ১০০টি অটোসাজেশন নিয়ে একটি মেডিটেশনসহ দুটি ট্র্যাক রয়েছে এ সিডিতে।

'এই আমি আর হৃদয় আমার' শীর্ষক একটি নতুন ডিভিডি প্রকাশ করেছে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব। এতে রয়েছে করোনারি হৃদরোগের কারণ ও এর বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি, হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধে সুস্থ জীবনধারার ভূমিকা নিয়ে দেশের বিশিষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের অভিমত ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা, হৃদরোগ-জয়ী সদস্যদের অনুভূতি এবং কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি ছোট্ট ক্লিপ।

কোয়ান্টাম ব্যায়াম-এর শততম ব্যাচ পূর্তি

৩১ মে ও ১ জুন কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রম-এর (পুরুষ) শততম ব্যাচ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। কাকরাইলে কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে অনুষ্ঠিত এ কার্যক্রমের প্রথমদিন সকালে শ্রদ্ধেয়া মা-জী নাহার আল বোখারী এক ঘণ্টাব্যাপী একটি বিশেষ প্রোগ্রাম পরিচালনা করবেন।

কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কোর্স

ঢাকা : ৩৬১ তম ব্যাচ ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ মে

মে ২০১৩-এর কার্যক্রম

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম
বনানী : ১০ ও ১১ মে, ধানমণ্ডি : ৩১ মে ও ১ জুন

কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি কার্যক্রম
সিলেট : ১০ ও ১১ মে
চট্টগ্রাম : ১৭ ও ১৮ মে
কেন্দ্র : ২৪ ও ২৫ মে

জীবনে সফল হওয়ার পথ প্রথমায়ন
বরিশাল : ১০ ও ১১ মে
কেন্দ্র : ১৭ ও ১৮ মে
ফেনী : ২৪ ও ২৫ মে

কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রম
মহিলা : ২৪ ও ২৫ মে, **পুরুষ :** ৩১ মে ও ১ জুন

কোয়ান্টাম বেসিক কম্পিউটিং প্রোগ্রাম

কোয়ান্টাম বেসিক হার্ডওয়্যার প্রোগ্রাম
: প্রতি শুক্র - সোমবার

কোয়ান্টামম গ্রাজুয়েট কোয়ান্টায়ন
: ২৩, ২৪ ও ২৫ মে

কোয়ান্টামম প্রো-মাস্টার্স কোয়ান্টায়ন
: ৩০, ৩১ মে ও ১ জুন

কোয়ান্টাম বুলেটিন : মে ২০১৩ ॥ সম্পাদক : কাজী মাহ্তাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 8319377, 8391391 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন

জুন ২০১৩

মে মাসে ৮,৩৭৩ ব্যাগ রক্ত সরবরাহ

কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে এ বছর মে মাসে সরবরাহ করা হয় মোট ৮,৩৭৩ ব্যাগ রক্ত ও রক্ত উপাদান যা এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ সরবরাহ। গত ২০ মে সরবরাহ করা হয় ৩৪৩ ব্যাগ রক্ত ও রক্ত উপাদান যা ছিলো একদিনে সর্বোচ্চ সরবরাহ।

এ উপলক্ষে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সকল স্তরের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীকে বিশেষ দোয়া জানিয়েছেন গুরুজী। সেইসাথে চাহিদা বাড়ায় প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহকে নিশ্চিত করতে স্বেচ্ছা রক্তদানে আশেপাশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।



নতুন সংস্করণে কোয়ান্টাম ব্যায়ামের বই

কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা বইটির পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সংযোজিত হয়েছে হাঁটুর ব্যথায় ও সারভাইক্যাল স্পন্ডিলাইটিস-এ করণীয় ব্যায়াম, ঘাড়ে ব্যথা ও কোমরে ব্যথার রোগীদের জন্যে বিশেষ পরামর্শ। বইয়ের এ নতুন সংস্করণে রোগ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যায়ামগুলোর সচিত্র উল্লেখ ব্যায়ামচর্চায়ও বিশেষ সহায়ক হবে।

রোগ নিরাময়ে এবং সৌন্দর্যচর্চায় অনন্য প্রকাশনা কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা বইটির নতুন সংস্করণ কেন্দ্রসহ আপনার নিকটস্থ সেন্টার শাখা সেল থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

রমজানের বিশেষ কার্যক্রম

কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন
১২-১৮ জুলাই

কোয়ান্টামমে কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন
১২-১৬ জুলাই

দুই দিনব্যাপী কমপ্যাক্ট আখেরি দোয়া

কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট
১৯ ও ২০ জুলাই

শুধুমাত্র প্রো-মাস্টার্স
২৬ ও ২৭ জুলাই

স্থান : আইডিইবি হল, কাকরাইল

প্রি-সেল ওয়ার্কশপে গুরুজী

আসক্তিমুক্ত হলে অন্তরে প্রশান্তি আসবে

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে মহামতি বুদ্ধ সকল দুঃখের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন আসক্তিকে। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আসক্তি থেকে মুক্ত হলে অন্তরে প্রশান্তি আসবে। এ আসক্তি থেকে মুক্তির জন্যে প্রয়োজন সৎচিন্তা ও সৎকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। আর সঙ্ঘায়নই একজন মানুষকে অব্যাহত সৎচিন্তা ও সৎকর্মে লীন করতে পারে।

২৩ মে দিনব্যাপী প্রি-সেল ওয়ার্কশপে কথাগুলো বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ ওয়ার্কশপটি মহামতি বুদ্ধের স্মরণে উৎসর্গ করা হয়। ওয়ার্কশপে বুদ্ধের শিক্ষার ওপর আলোকপাত করেন গুরুজী।

গুরুজী বলেন, মহামতি বুদ্ধ সত্যের সন্ধানে সব রকম কষ্ট সহ্য করার প্রস্তুতি নিয়ে রাজগৃহ ত্যাগ করেছিলেন। দীর্ঘ সাধনার পর, দীর্ঘ মৌনতার পর তিনি অনুধাবন করলেন, মানুষের জীবনে দুঃখের কারণ হলো আসক্তি। আর এ আসক্তি আসে অবিদ্যা থেকে। আরবিতে একে বলা হয় জাহেলিয়াত, কোয়ান্টামে আমরা এটিকে বলি ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি।

বুদ্ধবাণীর উল্লেখ করে গুরুজী বলেন, সঙ্ঘকে অনুসরণ করাই হচ্ছে আসক্তির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার পথ, সৎকর্মের পথ। সঙ্ঘবদ্ধভাবে একজন মানুষ যখন সৎচিন্তা ও সৎকর্মে নিয়োজিত থাকবে তখনই সে আসক্তির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। আর এ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেই একজন মানুষ প্রবেশ করতে পারে অনন্ত প্রশান্তিলোকে।

সাধারণত অলস মস্তিষ্ক আসক্তিতে আক্রান্ত হয়। এ আসক্তি হতে পারে খাবার, পানীয়, বিলাসিতা, বিনোদন ইত্যাদিতে। সঙ্ঘচেতনা মানুষকে এসব আসক্তি থেকে দূরে রাখে। কারণ সঙ্ঘে মানুষ সৎচিন্তা ও সৎকাজে এত নিবেদিত থাকে যে, শয়তান তখন তাকে আসক্ত করার পথ পায় না।

সৎকর্মে সবসময় আল্লাহর রহমত থাকে। কারণ এ সময়টুকুতে একজন মানুষ সমস্ত অসৎ চিন্তা থেকে দূরে থাকে। আর সময়ের ব্যাপ্তি যত কমই হোক সৎকর্মে যখন কেউ একাত্ম হয়ে যায়, সঙ্ঘচেতনায় যখন কেউ লীন হয়ে যায় তখন তার জীবনকে স্রষ্টা রহমতে পরিপূর্ণ করে দেন।

তাই আত্মশুদ্ধির পথে নিজেকে একাত্ম রাখার পাশাপাশি আশেপাশের মানুষের কাছে কোয়ান্টামের আলোকিত বাণী পৌঁছে দিতে হবে, সবাইকে মেডিটেশন চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যে ঘরে নিয়মিত মেডিটেশন হয় সে ঘরে অবশ্যই আল্লাহর রহমত থাকে।

গুরুজী বলেন, আত্মশুদ্ধি ও সৃষ্টির সেবার লক্ষ্যে যারা প্রি-সেল, ঘরোয়া প্রি-সেল কার্যক্রম শুরু করেছেন তারা সৌভাগ্যবান। কারণ ছোট পরিসরে, পারিবারিকভাবে পরিচালিত কার্যক্রমের মাধ্যমে একজনও যদি অনন্য মানুষে রূপান্তরিত হন, সেই একজনই পরিণত হবেন লাখো মানুষের ভরসাস্থলে।

ওয়ার্কশপে সঙ্ঘায়নের গুরুত্ব উল্লেখ করে গুরুজী আরো বলেন, সঙ্ঘ হচ্ছে প্রতিনিয়ত আত্মশুদ্ধির পথ। যত সঙ্ঘের সাথে একাত্ম থাকবেন তত আত্মশুদ্ধির পথে এগিয়ে যাবেন। আর মানুষ যা অর্জনের জন্যে প্রাণান্ত প্রয়াস চালায় সে তা-ই পায়। কোরআনে সূরা নজম-এর ৩৯নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'মানুষ শুধু তা-ই পায়, যা অর্জনের জন্যে সে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালায়'।

উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কোয়ান্টাম পরিবারের ১২ শতাধিক আর্ডেন্টিয়ার এ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। প্রবল বর্ষণে প্লাবিত পথঘাট, যানজটের দুর্ভোগ আর প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও দূরদূরান্ত থেকে বৃষ্টিভেজা অবস্থায় ওয়ার্কশপে উপস্থিত হওয়া আর্ডেন্টিয়ারদের অভিনন্দন জানান গুরুজী।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের সুন্দর সমন্বয়

মান্নান হীরা



আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। কর্মজীবনে শিল্প সাহিত্যের সাথে জড়িত। এসব কারণে বিজ্ঞান, ধর্ম ও সংস্কৃতিমনা–সবধরনের মানুষের সাথে আমার অনেকটা সময় কেটেছে। তাই আমি অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করি না। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে চারদিনে বিজ্ঞান এবং ধর্মের যে সমন্বয় দেখেছি, তা শুধু দেশে নয় সারা পৃথিবীতে ঘটেছে বলে আমার জানা নেই।

সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে, গুরুজী বিজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা কেবল ইসলাম ধর্ম নয়, আমাদের জানা বিভিন্ন ধর্মের মহামানবদের উদ্ধৃতি ও তাঁদের বিশ্বাসও আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এমন একটি সময়ে, যেখানে মানুষ কেবল নিজের প্রচারণা নিয়েই ব্যস্ত, সেখানে জাতিকে সার্বিকভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোয়ান্টাম কাজ করছে তা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে–এটাই আমার প্রত্যাশা। আমি মনে করি, আমাদের সবার স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে এ প্রক্রিয়ার বিকাশ, প্রসারে উদ্যোগ নেয়া উচিত।

[মান্নান হীরা, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত নাট্যকার। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৬১ ব্যাচে প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে তিনি কথাগুলো বলেন]

কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কোর্স

ঢাকা : ৩৬২ তম ব্যাচ
১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ জুন

চট্টগ্রাম : ৩৬৩ তম ব্যাচ
২১, ২২, ২৩ ও ২৪ জুন

জুনের কর্মসূচি

কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ
: ৭ জুন

কোয়ান্টাম প্রো-মাস্টার্স ওয়ার্কশপ
: ২৮ জুন

কোয়ান্টামম গ্রাজুয়েট কোয়ান্টায়ন
: ২০, ২১, ২২ জুন

বিলকিস আক্তার। সাভারে আটতলা ভবন ধসে আটকে পড়া তিন সহস্রাধিক মানুষের মধ্যে তিনিও একজন। অগণিত মানুষের অশ্রু, আর্তনাদ আর রক্তের স্রোত পেরিয়ে কীভাবে অক্ষত অবস্থায় ফিরলেন–সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন কোয়ান্টাম বুলেটিনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে। গার্মেন্টস শ্রমিক বিলকিস আক্তার ৩৫০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

থেমে গেলে চলবে না ॥ আবার শুরু করতে চাই

বিলকিস আক্তার



তখন সকাল ৯টার মতো বাজে। প্রতিদিনের মতো আটতলা বিল্ডিংয়ের চারতলায় কাজ করছিলাম। আমরা সাতজন মেয়ে কাজ করি গার্মেন্টস-এর স্যাম্পল সেকশনে। পুরোদমে কাজ চলছে, হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ধাক্কার মতো অনুভব করলাম। এমন জোরে একটা ঝাঁকুনি লাগলো যে, শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল। একসময় মনে হলো বিল্ডিংটা যেন মাটিতে দেবে যাচ্ছে।

তাকিয়ে দেখি বিল্ডিংয়ের অন্যপাশটা একেবারে ভেঙে মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওপর থেকে যেন কেউ কিছু ঢেলে দিয়েছে। শত শত মানুষ ছিটকে পড়ে যাচ্ছে একেকদিকে। চোখের সামনেই চাপা পড়ছে অনেকে। ভয়ে আতঙ্কে ছুটছে সবাই, কারও দিকে ফিরে তাকানোর সময়টুকু পর্যন্ত নেই।

আমি তড়িঘড়ি করে ড্রয়ার খুলে আমার মোবাইল ফোন আর কোয়ান্টামের আইডি কার্ডটা পেলাম হাতের কাছে। এ দুটো হাতে নিয়ে দৌড়াতে লাগলাম জানালার দিকে। কী করবো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। জানালার কাছে বড় বড় দুটো লোহার টেবিলের নিচে আশ্রয় নিলাম।

কিছুক্ষণ পর সামনে আর ভালোমতো দেখাও যাচ্ছিলো না। দেয়ালগুলো ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, যেদিকেই তাকাই ধোঁয়ার মতো মনে হচ্ছিলো। কানে আসছে পিলার ভাঙার মটমট শব্দ। চারদিকে শুধু মানুষের গোঙানির শব্দ, কান্না আর চিৎকার। সবাই শুধু বলছে–বাঁচাও! বাঁচাও! এরপর জ্ঞান হারিয়ে কোথায় কীভাবে পড়ে ছিলাম কিছুই আর জানি না।

জ্ঞান ফিরলে দেখি আমি হাসপাতালের বিছানায়। তখন রাত ৮টা বাজে। টের পেলাম আমার কাঁধে আর মাথায় বেশ ব্যথা। পানির তৃষ্ণায় বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে। জানতে পারলাম, আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে। আমাদের রুমটা থেকে একমাত্র আমাকেই জীবিত এবং অক্ষত অবস্থায় বের করতে পেরেছে। আমার সাথে যে ছয়জন ছিলো তাদের দুজনকে হাত পা কেটে বের করতে হয়েছে আর বাকি চারজন মৃত। আমি যে বেঁচে আছি এটাই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিলো।

সেই রাতেই দুইজন উদ্ধারকর্মী আমাকে সিএনজি ঠিক করে দিলো, আমি হাসপাতাল থেকে বাসায় চলে এলাম। এসে দেখি আমার চিন্তায় সবাই পাগলপ্রায়। আমাকে জড়িয়ে ধরে তারা আনন্দে কাঁদে আর আমি কাঁদি এই ভেবে যে, সকালেও যে মানুষগুলো আমার সাথে ছিলো, তারা চোখের সামনে 'নাই' হয়ে গেল! আমার পরিবারের মতোই কত পরিবার হাহাকার করছে! হয়তো আপনজনের লাশটাও খুঁজে পাচ্ছে না ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে।

মনে আছে, জ্ঞান হারানোর আগ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে খুব কান্নাকাটি করছিলাম। আল্লাহকে বলছিলাম–তুমি সবাইকে রক্ষা কর। মনে হচ্ছিলো, আমার ১০ বছরের মেয়েটার জন্যে হলেও আমাকে বাঁচতে হবে। ঐ বিপদের মধ্যে ফোন করেছিলাম আমার সাথে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করা একজন আপুকে। তাকে বললাম, আমরা সবাই খুব বিপদে আছি, তোমরা আমাদের জন্যে দোয়া কর। আর শুধু মনে মনে বলছিলাম–সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন। এই অটোসাজেশন প্রতিদিন মনে মনে অনেকবার করে বলতাম, তাই হয়তো এই চরম বিপদের মুহূর্তেও অজান্তেই বলে যাচ্ছিলাম–সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন।

কোর্স করার পর থেকেই নিয়মিত মেডিটেশন করি এবং অটোসাজেশন চর্চা করি। প্রায় আট বছর ধরে আমার একটা অসুখ ছিলো। নাক আর মুখ দিয়ে রক্ত পড়তো। অনেক চিকিৎসা করেও সুস্থ হই নি। কিন্তু কোর্স করার পর থেকে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। গার্মেন্টসে দুপুরে যে এক ঘণ্টার বিরতি পেতাম তখন টেবিলের নিচে বসে মেডিটেশন করতাম।

কোর্সে আসার পর আমার জীবনে যে কত বরকত তা বলে শেষ করতে পারবো না। নিয়মিত মেডিটেশনের ফলে আমার জীবনে তো সুস্থতা এসেছেই, আমার মনছবি পূরণ হয়েছে। অনেকদিনের স্বপ্ন ছিলো গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জে একটুখানি জায়গা কিনবো দোকান করার জন্যে। কোর্সের দ্বিতীয়দিন মনছবি করতে শিখলাম আর তারপর থেকে নিয়মিত মনছবির মেডিটেশন করতাম। একসময় সত্যিই কষ্ট করে জমানো কিছু টাকা দিয়ে নিজেদের জন্যে ছোট্ট একটা জায়গা কিনতে পারলাম।

কোর্স করে আমার কাজের গতি, পরিশ্রম করার শক্তি এবং শুকরিয়া ও মনের শান্তি বেড়েছে বহুগুণে। পরিবারের প্রয়োজন ঠিকমতো পূরণ করতে পারবো কি না–সেসব নিয়ে আগে খুব দুশ্চিন্তা হতো; কিন্তু কোয়ান্টাম আমাকে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে যে, আমি পারবো।

আমার পরিবারে আছেন মা-বাবা, ছোট বোন আর আমার ১০ বছরের মেয়েটা। মেয়ের যখন তিন বছর বয়স তখন আমার স্বামী মারা যায়। অবশ্য আমি সংসারের হাল ধরেছি অনেক অল্প বয়সে।

ছোটবেলায় মা-বাবার স্বল্প আয়ে খুব কষ্ট করে আমাদের সংসার চলতো। একটু বড় হবার পর আমি আর মা-কে কাজ করতে দেই নি। মাত্র ১১ বছর বয়সে ৩০০ টাকা বেতনে প্রথম কাজ শুরু করি একটা গার্মেন্টসে। সেই থেকে আজ ১৭ বছর ধরে আমি গার্মেন্টসে কাজ করি। কাজে কোনোদিন অবহেলা করি নি। যখনই সুযোগ পেয়েছি নতুন নতুন কাজ শেখার চেষ্টা করেছি। সবার ছুটি হতো ৫টায়, আমি কাজ করতাম আরো পাঁচ ঘণ্টা। ওভারটাইমসহ মাস শেষে যা পেতাম তা দিয়ে সংসার চলতো। নিজে কষ্ট করেছি, কিন্তু কোনোদিন অন্যের করুণা প্রত্যাশা করি নি।

ছোটবোনকে পড়ালেখা করিয়েছি, এখন সে কলেজে পড়ে। আমার মেয়েটাকে পড়াচ্ছি হাফেজি মাদ্রাসায়। আমি আমার সন্তানকে ভালো একজন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। আর পরিবারের মানুষগুলোকে সুখী দেখতে চাই। সবসময় চাই আমার চারপাশের মানুষগুলোও যেন ভালো থাকে।

কোয়ান্টামে এসেই শিখেছি নিজের এবং অন্যের ভালোর জন্যে নিয়মিত দান করতে। তাই প্রতিদিন মাটির ব্যাংকে দান করি। দুপুরে টিফিনের জন্যে প্রত্যেক কর্মীকে বিশ টাকা করে দেয়া হতো। আমি বাসা থেকে নিজে রান্না করে খাবার নিয়ে যেতাম আর ওই টাকাটা খরচ না করে প্রতিদিন মাটির ব্যাংকে দান করতাম। দুর্ঘটনার সেই দিনটিতেও সকালে ঘর থেকে বের হবার সময় মাটির ব্যাংকে দান করেছি। আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহর অসীম রহমত আর নিয়মিত দান করার জন্যেই আমি আজ অক্ষত অবস্থায় বেঁচে আছি।

এখনো আমার চোখে ভাসে সেই আটতলা বিল্ডিং ভেঙে পড়ার দৃশ্য। কীভাবে এক মুহূর্তে চোখের সামনে সব শেষ হয়ে গেল! হারানো মানুষগুলোর কথা যতবার মনে পড়ে, বুকের ভেতরটা শূন্য লাগে, খুব কষ্ট হয়।

মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখেছি সেদিন। জীবনের কত মূল্য, এরকম অবস্থায় না পড়লে কোনোদিনই বুঝতাম না। আল্লাহ আমাকে যে নতুন জীবন দিয়েছেন আমি তা কাজে লাগাতে চাই। আবার কাজ শুরু করতে চাই। আমার সংসার চালাতে হবে, মেয়েটাকে মানুষ করতে হবে। যদি চাকরি না পাই, নিজেই কোনো ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করবো। আমার থেমে গেলে চলবে না।

ঐ ধ্বংসস্তূপে বসে আমার মেয়ের মুখটা মনে পড়ছিলো আর কষ্ট লাগছিলো এই ভেবে, যদি মারা যাই, তবে আর কোনোদিন কোয়ান্টামের অনুষ্ঠানে আসতে পারবো না, গুরুজীর কথা শুনতে পারবো না। আমি যতদিন বেঁচে আছি পরিশ্রম করে যেতে চাই, কোয়ান্টামের সাথে থাকতে চাই।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : নুঝাত নুহেরী কস্‌মী

পানিই সেরা পানীয়



সুস্থ জীবনের জন্যেই পানি

নিজেকে সুস্থ আর তারুণ্যদীপ্ত দেখতে চান সবসময়? দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তি জয় করে হয়ে উঠতে চান সতেজ? প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন, সারাদিন আপনি থাকবেন ঝরঝরে, জীবন-উদ্যমে ভরপুর, এমনকি মানসিক চাপমুক্ত।

আমাদের শরীরের শতকরা ৬০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই পানি। মানবদেহের সমস্ত কোষ, কলা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মূল গাঠনিক উপাদান পানি। যেমন, পেশির শতকরা ৭৫ ভাগ, হাড়ের ২২ ভাগ, রক্তের ৮৩ ভাগই হলো পানি।

এছাড়াও মাথা থেকে পা অবধি শরীরের প্রতিটি কোষের দৈনন্দিন স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া চলমান রাখার জন্যে পানি এক অপরিহার্য উপাদান। তাই কেবল তৃষ্ণা মেটানোই নয়, বরং সুস্থ জীবনের জন্যেই পর্যাপ্ত পানি পান জরুরি।

পানি পানে সজীব ত্বক, উজ্জ্বল তারুণ্য

চুমুকে চুমুকে পানি পান করুন সারাদিন। আপনার ত্বক হয়ে উঠবে দিন দিন আরো সজীব আর প্রাণদীপ্ত। ত্বকের সুস্থতার জন্যে নামিদামি ব্র্যান্ডের প্রসাধনীর চেয়েও পানি পানের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। আর ত্বকের শুষ্কতা নিয়ে চিন্তিত যারা, শীত কিংবা গ্রীষ্ম যখনই হোক, তাদের জন্যে দিনের পুরোটা সময় জুড়ে একটু একটু করে পানি পান হতে পারে মোক্ষম দাওয়াই। এতে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা চমৎকারভাবে বজায় থাকে।

ত্বকের বিভিন্ন রকম রোগ, যেমন : একজিমা, সোরিয়াসিস নিরাময়ে সহায়তার পাশাপাশি ত্বকে বয়সজনিত ভাঁজ পড়া ও অনাকাঙ্ক্ষিত দাগ দূর করার ক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত পানি পান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়াও পানি ত্বকের স্বাভাবিক কমনীয়তা ও স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

প্রতিদিন নিয়ম করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি পান করুন। এর ফলে রক্তের মাধ্যমে আপনার প্রতিটি দেহকোষে অক্সিজেন ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি পৌঁছে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি আরো ত্বরান্বিত ও সক্রিয় হয়ে উঠবে। আপনি হবেন সতেজ আর উজ্জ্বল তারুণ্যের অধিকারী।

ক্লান্তি জুড়ায়, উদ্দীপ্ত হয় মস্তিষ্ক

পানি পানে ক্লান্তি জুড়ায়। পরিশ্রমজনিত অবসাদ ও শ্রান্তি দূর হয়। অনেকক্ষণ ধরে ভারী পরিশ্রমের কোনো কাজ করতে থাকলে শরীরে যে পানিশূন্যতার সৃষ্টি হয়, তার ফলে কেউ কেউ মাস্‌ল ক্র্যাম্প বা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক পেশি-সংকোচনের শিকার হন। গবেষকরা বলছেন, ভারী পরিশ্রম ও ব্যায়ামের আগে-পরে যথেষ্ট পানি পান করলে ক্লান্তি দূর হওয়ার পাশাপাশি অযাচিত পেশি-সংকোচনের ঝুঁকি কমে।

আমাদের মস্তিষ্কের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই পানি। শরীরে পানিশূন্যতা দেখা দিলে ব্যাহত হয় মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কর্মপ্রক্রিয়া। মাথাঘোরা বা এ জাতীয় অস্বস্তিতে ভুগতে পারেন কেউ কেউ; কেউবা আবার আক্রান্ত হতে পারেন মনোযোগহীনতায়। অন্যদিকে শত ব্যস্ততা আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে অল্প অল্প পানি পান মস্তিষ্ককে রাখে উদ্দীপ্ত ও কর্মচঞ্চল। অটুট থাকে মনোযোগ ও কাজের গতি।

পানি পান মাথাব্যথার প্রাকৃতিক চিকিৎসা। মাথাব্যথা হতে পারে অনেক কারণেই, যার মধ্যে পানিশূন্যতা অন্যতম। তাই নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পানি পান করে আপনি মুক্তি পেতে পারেন যন্ত্রণাদায়ক মাথাব্যথা থেকে। সাধারণ মাথাব্যথাই কেবল নয়, মাইগ্রেনজনিত মাথাব্যথা উপশমেও প্রচুর পানি পানে উৎসাহ যুগিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

ওজন থাকে নিয়ন্ত্রণে, বাড়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পানে অভ্যস্ত যারা, তাদের ওজন থাকে নিয়ন্ত্রণে। কারণ, প্রয়োজনীয় পানির অভাবে বিপাকক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে শরীরে ফ্যাট জমে। এছাড়াও পানি ক্ষুধার অনুভূতি কমায়। তাতে অতিভোজনের সুযোগ কমে, খাদ্যগ্রহণ হয় পরিমিত। আবার ক্ষুধামান্দ্যতেও পানি পান কার্যকরী।

পানি দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। পেশি ও কোষে প্রয়োজনীয় শক্তি ও সতেজতা যোগায়। ফুসফুসের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় রাখে। শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিত করে সার্বিক সুস্থতা। এছাড়াও দেহের ছোট-বড় সব অস্থিসন্ধির স্বাভাবিক আর্দ্রতা ও নমনীয়তা অটুট রাখতেও পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বাতব্যথা ও আর্থ্রাইটিস নিরাময়ে পর্যাপ্ত পানি পানের পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

শরীরে পানির পরিমাণ কমে গেলে হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়। হৃৎপিণ্ডের সুস্থতার জন্যেও পানি পান তাই বেশ জরুরি। এর পাশাপাশি হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধের সাথেও পানি পানের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ক্যালিফোর্নিয়ার লোমা লিন্ডা ইউনিভার্সিটিতে একদল পূর্ণবয়স্ক নারী-পুরুষের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সারাদিনে পর্যাপ্ত পানি পান করেছেন যারা, তাদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমে গেছে ৪১ থেকে ৫৪ শতাংশ পর্যন্ত।

পর্যাপ্ত পানি পান শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সংহত ও শক্তিশালী করে তোলে। ঋতু পরিবর্তনজনিত ফ্লু এবং ভ্রমণজনিত অসুস্থতা প্রতিরোধেও পানি পানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

কিডনি ও পরিপাকতন্ত্রের সুস্থতা এবং স্বাভাবিক রেচন

কিডনির সুস্থতার জন্যে পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিডনির সুস্থতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এটি কিডনিতে পাথর জমার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে এবং দেহ থেকে সকল প্রকার ক্ষতিকর টক্সিন বা বিষাণুকে বের করে দেয়।

পর্যাপ্ত পানি পান পরিপাকতন্ত্রের সুস্থতা নিশ্চিত করে। পরিপাকতন্ত্রকে করে সংহত। ফলে হজম ভালো হয়। শুধু তা-ই নয়, এসিডিটির সমস্যায় অহোরাত্র অস্বস্তিতে ভোগেন যারা, তাদের জন্যে এটি বেশ কার্যকরী। সবমিলিয়ে বলা যায়, শরীরের স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্যেই পর্যাপ্ত পানি প্রয়োজন।

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এদের অধিকাংশেরই সারাদিনে যে পানি খাওয়া হয় তার পরিমাণ এক/দেড় লিটারের বেশি নয়। অথচ যথেষ্ট পরিমাণ পানির অভাবে কোলন শুষ্ক হয়ে যায়, বর্জ্য ঠিকমতো নির্গত হতে পারে না। দিনের পর দিন এভাবে চলতে থাকলে কোষ্ঠবদ্ধতা একসময় পরিণত হয় স্থায়ী সমস্যায়। আর এর সহজ সমাধান কিন্তু আপনার হাতের নাগালেই–সারাদিনে প্রচুর পানি পান করুন। এছাড়াও প্রচুর পানি পানের ফলে কোলন ও মূত্রথলির ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে।

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চার থেকে ছয় গ্লাস পানি পানের অভ্যাস করুন। প্রথমদিন দুই গ্লাস দিয়ে শুরু করুন। ধীরে ধীরে পরিমাণ বাড়ান। দিনের শুরুতেই খালি পেটে পানি পান নানা কারণে দারুণ উপকারী।

পানি পানে স্ট্রেস কমে

পানি পানে স্ট্রেস কমে। রীতিমতো গবেষণায় প্রমাণিত সত্য এটি। খ্যাতিমান এথলেট প্রশিক্ষক ও পুষ্টিবিদ আমান্ডা কার্লসন বলেন, মাত্র আধা লিটার পানির ঘাটতি হলেই আমাদের শরীরে স্ট্রেস হরমোন কর্টিসোলের প্রবাহ বেড়ে যায়। দেহমন স্ট্রেস আক্রান্ত হতে পারে।

অন্যদিকে, শরীরের সব কোষ-কলা-পেশিতে পানির পরিমাণ প্রয়োজন অনুপাতে থাকলে কর্টিসোল হরমোনের প্রবাহ থাকে সহনীয় মাত্রায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দেহে পানিশূন্যতা দেখা দিলে যেমন স্ট্রেস সৃষ্টি হয়, তেমনি স্ট্রেসের কারণেও দেহে পানিশূন্যতা দেখা দিতে পারে। এ এক দুষ্টচক্র। আর পানি পান হতে পারে এ দুষ্টচক্র ভাঙার সহজ উপায়।

পানিশূন্যতা হওয়ার আগেই পানি পান করুন : দেড় থেকে তিন লিটার প্রতিদিন

তৃষ্ণার্ত বোধ করছেন? তবে জেনে নিন, আপনার শরীর ইতোমধ্যেই পানিশূন্যতায় ভুগছে। তাই তৃষ্ণার্ত হওয়ার আগেই পানি পান করুন। কারণ, শরীরে পানির পরিমাণ ২০ শতাংশ কমে গেলে তা অনেক সময় মৃত্যুরও কারণ হতে পারে।

স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও আবহাওয়ায় প্রতিদিন দেড় থেকে তিন লিটার পানি পান করুন। ভারী পরিশ্রম কিংবা অতিরিক্ত উষ্ণ আবহাওয়ায় প্রয়োজন বুঝে একটু বেশি পানি পান করুন। এছাড়াও জ্বরের সময় শরীর পানিশূন্যতায় আক্রান্ত হয়। তাই এ সময় প্রচুর পানি পান করা জরুরি।

তৃষ্ণা পেলে পানিই পান করুন। কারণ, পানিই সেরা পানীয়। সেইসাথে খেয়াল রাখুন, পানিটা যেন হয় বিশুদ্ধ। আর জেনে রাখা ভালো–ঠান্ডা পানি নয়, বরং স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানিই স্বাস্থ্যকর।

উল্লেখ্য, হার্ট ফেইলিউর, কিডনি ও লিভারের সমস্যা, পেট কিংবা পা ফোলা ইত্যাদি স্বাস্থ্য-জটিলতায় ভুগছেন যারা, তারা অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পানি পান করবেন।

–ডা. আতাউর রহমান

মেডিটেশন সত্যিই এক অসাধারণ ব্যাপার

ড. আহমেদ কবির



কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আমি নানা বিষয়ে বিপুল অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। সত্যিই মেডিটেশন একটা অসাধারণ ব্যাপার! যার মাধ্যমে মানুষ নিজের শরীরকে, নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কোর্সে আমরা শুনেছি, যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও নিয়মনিষ্ঠ হই এবং সেইসাথে লক্ষ্য যদি স্থির থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হতে পারে।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছি প্রায় ৪৩ বছর। কিন্তু গুরুজীর এত বিশাল ক্লাস দেখে বিস্মিত হয়েছি। এখানে নানা শ্রেণীর, নানা ধর্মের, নানা বয়সের মানুষ। তারা এখানে আসছেন, একত্রে বসে ক্লাস করছেন, উপকৃত হচ্ছেন যা আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে। জীবনের লক্ষ্য পূরণে গল্পের ছলে যে শিক্ষা এ কোর্সে পেয়েছি, এগুলো আমার পাথেয় হয়ে থাকবে।

[ড. আহমেদ কবির, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৫৯ ব্যাচে কোর্স করেছেন]

কলার গার্ড ছেড়েছি প্রথমদিনই

মো. সামছুল হক



কিছুদিন আগে ভয়াবহ এক রোড এক্সিডেন্ট হয় আমার। কোর্সে আসার আগে ডাক্তার এমআরআই করে অনেকগুলো ওষুধ দিয়েছেন, নিয়মিত কলার গার্ড পরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে শারীরিকভাবে বেশ সুস্থবোধ করলাম। প্রথমদিন বিকেলে সিদ্ধান্ত নিলাম, কলার গার্ডের প্রয়োজন নেই। আমি সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত নিয়মিত নামাজ পড়ছি, নামাজে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

আমি অনেক ধরনের কাজের সাথে জড়িত ছিলাম। অর্জনও করেছি অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক সনদপত্র। তারপরও গত তিন বছর যাবৎ পারিপার্শ্বিক কিছু কারণে, নিজেকে ব্যর্থ মানুষ মনে হচ্ছিলো। এখন আমি আশাবাদী। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের সংস্পর্শে এসে আমার যে ইতিবাচক পরিবর্তনগুলো ঘটলো, আশা করছি এ পরিবর্তন আমার জীবন চলার পথকে আরো সুগম করবে।

[মো. সামছুল হক, ব্যবসায়ী। ৩৫৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেছি

আলফা আরজু



আমি ছিলাম আত্মপ্রত্যয়ী একজন মানুষ। শারীরিক-মানসিকভাবেও অনেক ভালো ছিলাম। কিন্তু গত কয়েক বছরে সেটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণের পর আমি আবার আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেছি।

আমি এমন একটি পরিবেশ থেকে এসেছি যেখানে আমার সহপাঠীদের ৫ম/ ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে থাকতেই বিয়ে হয়ে গেছে। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতা বিভাগে মাস্টার্স করেছি। দেশের বাইরে ইউরোপ, আমেরিকাসহ কয়েকটি দেশে পড়াশোনা করেছি সাংবাদিকতা বিষয়ে। আমার জীবনে যতগুলো অর্জন রয়েছে তার মধ্যে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের এই সার্টিফিকেট আমার কাছে শ্রেষ্ঠ।

গত কয়েক বছর ধরে আমি বিভিন্ন কারণে মানসিকভাবে বেশ অবসন্ন ছিলাম। আমার এক সহকর্মী সবসময় অনুপ্রাণিত করে এসেছেন এ কোর্স করার জন্যে। আমার মাথা বেশ ভারী হয়ে থাকতো, অনেক হতাশা ছিলো। আমি আলোকায়নে দুটি সেশনে এসেছিলাম। তখন থেকে ধীরে ধীরে আমার ভেতরটা হালকা হতে লাগলো। আর কোর্সে এসে আমি এখন নেতিবাচক সবকিছু থেকে মুক্ত।

[আলফা আরজু, সিনিয়র রিপোর্টার, দি ডেইলি ইনডিপেন্ডেন্ট। ৩৫৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নামাজে মনোযোগ বেড়েছে

আজমেরী নির্ঝর



গান করা আমার শখ। পড়াশোনা করেছি দেশের বাইরে। মিউজিকের জন্যে, দেশের জন্যে ফিরে এসেছি ভালো কিছু কাজ করবো বলে। তবে বিভিন্ন কারণে অনেক হতাশ ছিলাম। কাজ করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। মা-বাবার অনুপ্রেরণায় আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি। কিন্তু নামাজে বিভিন্ন চিন্তা, হতাশা এসে ভিড় করতো, মনোনিবেশ করতে পারতাম না। কোর্সে শেখানো মনোযোগ বৃদ্ধির টেকনিক অনুসরণ করে এখন আমি নামাজে মনোনিবেশ করতে পারছি–এ কোর্স থেকে এটা আমার অনেক বড় একটি পাওয়া।

পারিপার্শ্বিক নানা প্রতিকূলতায় আমি সবসময় টেনশন করতাম, অবসন্নবোধ করতাম। কান্না পেতো, অসুস্থ বোধ করতাম। এখন আর সেরকমটা বোধ করি না। নিজেকে সবসময় প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর একজন মানুষ মনে হয়।

[আজমেরী নির্ঝর, কণ্ঠশিল্পী। ৩৫৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

এটি পিওর সায়েন্স

রওশন জাহান মনি



আমি খুব যুক্তিতর্ক বিচার বিবেচনা করেই কোয়ান্টাম কোর্সে এসেছি। আবেগতাড়িত হয়ে বা ঝোঁকের বশে নয়। আমার মনে হয়েছে, সায়েন্টিফিক একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমস্ত মন এবং সত্তাকে শূন্য অবস্থানে নিয়ে যায় মেডিটেশন। তখন মনকে কমান্ড দিলে সে শুনতে পায়। কোয়ান্টামে এসে জানলাম, সেটাই হলো মনের আলফা লেভেল।

কোয়ান্টামে চার দিন কোর্স করার পর উপলব্ধি করেছি, এটি পিওর সায়েন্স। সবার জন্যেই এ সায়েন্স অত্যন্ত জরুরি। জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্যে এবং একটা সুন্দর পরিসমাপ্তির জন্যেও এটি জরুরি।

আমরা অনেকে হয়তো ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে এখানে এসেছি কিন্তু গুরুজী এ সায়েন্টিফিক মেথডের মাধ্যমে সমস্ত মানুষকে ধারণ করেন, দেশাত্মবোধকে ধারণ করেন, জাতিকে ধারণ করেন। গুরুজী মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেছেন, আলোকিত চেতনার কথা বলেছেন, তরুণদের রক্তদানের কথা বলেছেন, দানের কথা বলেছেন, নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলেছেন–এগুলো তিনি এমন উপলব্ধিময় ভাষায় ও বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যা আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।

[রওশন জাহান মনি, ডেপুটি ডিরেক্টর, এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট। ৩৫৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আত্মবিশ্বাস বেড়েছে

ইমরুল কায়েস



ছোটবেলা থেকে খেলাধুলাই আমার ধ্যানজ্ঞান। আল্লাহ আমাকে অনেক সাফল্য দিয়েছেন। ২০১১-এর বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টের পর থেকে আমি টিমের সাথে নেই। শুধু ভাবতাম, আমি আবার ফিরতে পারবো কি না, আবার ভালো খেলতে পারবো কি না। আমার ভেতরে কোনো ইতিবাচক কথা আসতো না, সারাদিন শুধু নেতিবাচক চিন্তা।

আল্লাহর কাছে অশেষ শুকরিয়া যে, কোয়ান্টাম কোর্স করার পর থেকে আমার বিশ্বাস, আমি এখনই আবার ট্র্যাকে চলে আসতে পারবো। কোয়ান্টামের একজন সদস্য হিসেবে সেবামূলক কাজের সাথে জড়িত থাকাও এখন আরো সহজ হবে আমার জন্যে, যেটা আমি সবসময় চেয়েছি। এ কোর্সে এসে অনেকদিন পর মন খুলে হেসেছি। সবার কাছে আমি দোয়াপ্রার্থী যেন ভালো খেলা উপহার দিতে পারি, বাংলাদেশের নাম অক্ষুণ্ন রাখতে পারি।

[ইমরুল কায়েস, ক্রিকেটার, বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল। ৩৫৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে গুরুজী

যত্নায়ন দেহকে টক্সিনমুক্ত করে



'সুস্বাস্থ্যের জন্যে যত্নায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। দেহ-অভ্যন্তরে নানাভাবে সৃষ্ট টক্সিন বা বিষাণুকে আমরা যত্নায়নের মাধ্যমে বের করে দিতে পারি। যত সুন্দর ও কার্যকরভাবে শরীর থেকে আমরা এসব টক্সিন বের করে দিতে পারবো তত আমাদের সুস্থ থাকার শক্তি বেড়ে যাবে।'

১ মে অনুষ্ঠিত গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে কথাগুলো বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। এদিন সারাদেশ থেকে আগত কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটদের অংশগ্রহণে ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি হলে অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী বিশেষ নিরাময় ও হিলিং ওয়ার্কশপ।

ওয়ার্কশপে 'যত্নায়ন' প্রসঙ্গে গুরুজী আরো বলেন, যত্নায়নের পাঁচটি ধাপের প্রথমটি হচ্ছে দম। সঠিকভাবে দম নেয়া ও ছাড়ার মাধ্যমে আমরা দেহকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ ও ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইডমুক্ত করতে পারি। তাই দম যত সঠিক হবে তত আমাদের এনার্জি লেভেল বাড়তে থাকবে। ফলে সারাদিন পরিশ্রম করেও দেহ থাকবে ক্লান্তিহীন ও কর্মক্ষম।

যত্নায়নের দ্বিতীয় ধাপে সঠিক খাদ্যাভ্যাস গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই খাবারের মধ্য দিয়ে যাতে দেহে টক্সিন প্রবেশ না করে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সবসময় যথাসম্ভব রাসায়নিকমুক্ত তাজা খাবার খেতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে যে, স্বাস্থ্যের জন্যে যা ভালো সেটাই খাবো। টক্সিনযুক্ত খাবার ও পানীয়, যেমন– এলকোহল, সফট ড্রিংকস, এনার্জি ড্রিংকস, ধূমপান অবশ্যই বর্জন করতে হবে।



যত্নায়নের তৃতীয় ধাপ হলো ব্যায়াম। কোয়ান্টাম ব্যায়াম শরীরের হরমোনাল, বায়ো-ইলেক্ট্রিক্যাল, নার্ভাস সিস্টেমের ভারসাম্য থেকে শুরু করে দেহের সব সিস্টেমের ভারসাম্য বজায় রাখে। তাই প্রতিদিন ২০/২৫ মিনিট কোয়ান্টাম ব্যায়াম চর্চা করা বা হাঁটা সুস্থতার জন্যে অত্যন্ত জরুরি। এতে ঘামরূপে ত্বকের মধ্য দিয়ে টক্সিন বেরিয়ে যায়।

যত্নায়নের চতুর্থ ধাপে রয়েছে হজম। খাবার এমনভাবে খেতে হবে যাতে হজমে সুবিধা হয়। এ ব্যাপারে রসুলুল্লাহ (স)-এর শিক্ষা হচ্ছে, খাওয়ার সময় পেটের এক তৃতীয়াংশ শক্ত খাবার, এক তৃতীয়াংশ তরল এবং এক তৃতীয়াংশ ফাঁকা রাখা। অর্থাৎ একটু ক্ষুধাভাব থাকতেই খাওয়া শেষ করা। এতে হজম ভালো হয়।

যত্নায়নের পঞ্চম ধাপ হলো রেচন প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে প্রস্রাব-পায়খানার সাথে শরীর থেকে টক্সিন বেরিয়ে যায়। শরীর থেকে নিয়মিত এসব বর্জ্য পদার্থ বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে হজমে সহায়ক সহজপাচ্য খাবার খাওয়া উচিত। ভাজাপোড়া তৈলাক্ত মশলাদার খাবার এড়িয়ে যেতে হবে।

যত্নায়নের পাঁচটি ধাপের মাধ্যমে দেহ থেকে টক্সিন বের করে দেয়ার এ প্রক্রিয়াই হচ্ছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। এক্ষেত্রে দেহের মুখ নাক কান ত্বক ও রেচন প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুস্থ থাকার জন্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার কোনো বিকল্প নেই। এজন্যে নিয়মিত গোসলে শরীর থেকে খুব সুন্দরভাবে টক্সিন বেরিয়ে যায়। রসুলুল্লাহ (স)-এর শিক্ষারও একটা বড় অংশ এই যে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে তিনি ঈমানের অঙ্গ বলেছেন।

আমরা আসলে অধিকাংশ সময়ই সুস্থ থাকি। অসুস্থ হই কখনো কখনো। আমাদের ৭৫ ভাগ রোগের কারণ–শরীরের ভেতরে সৃষ্টি হওয়া টক্সিন–যা নেতিচিন্তা, অস্বাস্থ্যকর খাবার, অসুস্থ বিনোদন, মাত্রাতিরিক্ত আবেগীয় সম্পর্ক, শখ, ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট। বাকি ২৫ ভাগ রোগের কারণ হতে পারে ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাসজনিত, যথাযথ পুষ্টির অভাব ও ভুল ওষুধ বা সার্জারির জটিলতা।

সাধারণত, দুই দিক থেকে আমরা এ বিষাণুতে আক্রান্ত হতে পারি। প্রথমত, মন অসুস্থ হলে টক্সিন তৈরি হতে পারে। দুশ্চিন্তা, রাগ-ক্ষোভ, ঘৃণা, ঈর্ষা থেকে টক্সিন সৃষ্টি হতে পারে। গীবত থেকে টক্সিন সৃষ্টি হতে পারে। টক্সিন সৃষ্টি হতে পারে দৃষ্টিভঙ্গিগত ভুলের কারণে। অর্থাৎ যেগুলোর বস্তুগত কোনো অস্তিত্ব নেই সেগুলো থেকেও টক্সিন সৃষ্টি হতে পারে।

আবার বিনোদনের নামেও সেটি আসতে পারে। যেমন টেলিভিশনে অধিকাংশ সময়ই আমরা দেখছি ভায়োলেন্স হিংসা সন্ত্রাস মারামারি চক্রান্ত ষড়যন্ত্র পরকীয়া। টিভিতে দেখা এসব ঘটনা এবং চরিত্র আমাদেরকে নেতিবাচকভাবে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। বাস্তব জীবনেও এসব ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে প্রলুব্ধ করে। ফলে আমাদের ভেতরে সৃষ্টি হয় টেনশন হতাশা আসক্তি আর অন্তর্দ্বন্দ্ব। এসব থেকেও দেহের ভেতরে সৃষ্টি হয় টক্সিন।

চারপাশের পরিবেশ থেকে বিভিন্নভাবে আমাদের শরীরে টক্সিন প্রবেশ করতে পারে। খাবার স্বাস্থ্যসম্মত না হলে, এছাড়া টিভি, মোবাইলসহ ঘরে ও বাইরে ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের রেডিয়েশনের সম্মুখীন হচ্ছি আমরা প্রতিনিয়ত। এ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্টর্ম থেকেও টক্সিন সৃষ্টি হয়।

আধুনিক সময়ে টক্সিন সৃষ্টি হওয়ার একটা অন্যতম মাধ্যম হলো মোবাইল ফোন। মোবাইল-নির্ভরতা বেড়ে যাওয়ায় একাগ্রভাবে বসে কোনো কাজ করা এখন আর সম্ভব হয় না। সময়ে-অসময়ে বার বার ফোন আসায় আমরা সেটি রিসিভ করি বিরক্তি নিয়ে। এই বিরক্তির উদ্রেক হওয়াতেও আমাদের ভেতরে টক্সিন সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে মোবাইল টাওয়ার থেকে প্রতিনিয়ত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ক্ষতিকর ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রশ্মি।

আমরা লক্ষ করলে দেখবো, দেহে টক্সিন বেশি হলে এসিডিটি বেড়ে যায়। এসিডিক অবস্থার বিপরীত হচ্ছে এলকালাইন অবস্থা। এলকালাইন হচ্ছে দেহের এমন এক অবস্থা যখন আমরা প্রশান্ত থাকি, সুস্থ থাকি। দেহকে সবসময় এমন অবস্থায় রাখার জন্যেই প্রয়োজন মেডিটেশন।

সুস্থ থাকার জন্যে সঠিক যত্নায়নের সাথে সাথে নিরাময়ের আরো চারটি শাশ্বত উপায় হলো ধ্যান, দোয়া, দান এবং দাওয়া। মন স্থির না হলে, মনে প্রশান্তি না এলে দেহে প্রশান্তি আসবে না, দেহে কখনো সুস্থতা আসবে না। ধ্যান বা মেডিটেশন আমাদের অন্তরে এই প্রশান্তি নিয়ে আসে।

এলকালাইন বা প্রশান্ত অবস্থা, একজন মানুষকে ৭৫ ভাগ রোগ থেকে মুক্ত রাখে। ধ্যানের পাশাপাশি নিরাময় প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজন দোয়া বা হিলিং। কারণ আন্তরিক প্রার্থনা নিরাময় প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে।

রোগ নিরাময়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম দান বা সদকা। যারা নিয়মিত দান করেন তাদের জীবনে বিপদ আসে তুফানের মতো আর চলে যায় বুদবুদের মতো। কারণ সৎদানের বিনিময়ে স্রষ্টা আমাদের বিপদ থেকে মুক্ত রাখেন। রোগ নিরাময়ে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হতে পারে সে অনুপাতে দান করা যেতে পারে।

৭৫ ভাগ রোগ নিরাময়ের জন্যে ধ্যান দোয়া দান–এই তিনটিই যথেষ্ট। বাকি ২৫ ভাগের জন্যে প্রয়োজন সঠিক চিকিৎসা ও দাওয়া। নিরাময়ের জন্যে ওষুধের সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দাওয়া বা পথ্য। নির্দিষ্ট রোগ নিরাময়ে নির্দিষ্ট পথ্য সম্পর্কে ধারণা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চমাত্রার ওষুধ বা এন্টিবায়োটিক সেবন করলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এড়াতে ডাব অথবা প্রচুর পরিমাণে পানি খাওয়া জরুরি। এতে দেহের ভেতরের টক্সিন দ্রবীভূত হয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় এবং রোগ নিরাময় হয় দ্রুততর।

শারীরিক মানসিক সামাজিক এবং আত্মিক–জীবনের এই প্রতিটি দিক থেকে ভালো থাকার নামই হচ্ছে সুস্থতা। সুস্থ জীবনযাপনের জন্যে বিশেষ জ্ঞানের কোনো প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন শুধু সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির। আর এ জন্যে স্রষ্টা আমাদেরকে যে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি দিয়েছেন এটি প্রয়োগ করাই যথেষ্ট। চিকিৎসাবিজ্ঞান আমাদের এই সাধারণ জ্ঞানটা গড়তে বা এটি অনুধাবন করতে সাহায্য করে।

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *আপনার অথবা কোয়ান্টামের সব কিছুর ওপরেই কি পূর্ণ সমর্থন রাখতে হবে? কিছু কিছু বিষয় যদি আমি সমর্থন না করি, আমি কি কোয়ান্টাম চেতনায় একাত্ম হতে পারবো না বা কল্যাণ পাবো না?*

উত্তর : আপনার জন্যে যা কিছু কল্যাণকর বলে আপনি মনে করেন, আপনি গ্রহণ করতে পারেন। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সেই আমরা বলি যে, আমি যে রকম আমার বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করি তেমনি প্রত্যেকের বিশ্বাসকে আমি শ্রদ্ধা করি। এখান থেকে আপনি যা কিছু কল্যাণকর মনে করেন, গ্রহণ করতে পারেন, আপনি সেটা থেকে উপকৃত হবেন। কারণ সবার জন্যেই তো সবকিছু নয় এবং প্রত্যেকের সবকিছু গ্রহণ করার প্রয়োজনও নেই।

কোয়ান্টাম মেথড হচ্ছে একটা টুলবক্স। এখান থেকে যার যখন যে যন্ত্রটা দরকার তিনি সেটা ব্যবহার করবেন। যেটা দরকার নেই সেটা সযত্নে থাকুক। যদি কখনো প্রয়োজন হয় সেটা ব্যবহার করবেন। আর কোয়ান্টাম মেথডের জীবনদৃষ্টি সংক্রান্ত যা কিছু আছে; যুগে যুগে মহামানবরা জীবনদৃষ্টি নিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন আমরা সে কথাগুলোর নির্যাসই এখানে নিয়ে এসেছি।

এই জীবনদৃষ্টিটাকে যত পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করবেন আপনার জীবন তত পরিপূর্ণ হবে, আনন্দময় হবে। আর যদি একে আংশিক গ্রহণ করেন–জীবন আংশিক আনন্দময় হবে, আংশিক ফাঁকা থাকবে। অর্থাৎ যতটুকু আপনি গ্রহণ করবেন ততটুকু উপকৃত হবেন। আর গ্রহণ করার ব্যাপারে আপনার পুরো স্বাধীনতা আছে।

প্রশ্ন : *গুরুজী, আমার লক্ষ্য কয়েকটা। কোনটা নিয়ে মনছবি করবো বুঝতে পারছি না। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে ইচ্ছে করে আবার এস্ট্রোফিজিসিস্ট হওয়ারও ইচ্ছা হয়। কিন্তু রেজাল্ট ভালো হচ্ছে না। সারাদিনই কল্পনা করি, হয়ে গেছি। বিক্ষিপ্ত মনকে এক করবো কীভাবে?*

উত্তর : আসলে মনছবি এবং ফ্যান্টাসি এক জিনিস নয়। মনছবি পূরণ হওয়ার যে পাঁচটি সূত্র রয়েছে, সে অনুসারে প্রথমত আপনাকে লক্ষ্যের সাথে একাত্ম হতে হবে। তারপরে লক্ষ্যানুরণন যে, 'হয়ে গেছি'। আর আপনি হয়ে গেছেন কি না সেটা বুঝতে পারবেন যখন আপনি লক্ষ্যের জন্যে কাজ করবেন। আপনি পড়ছেন না, পড়তে মন চাইছে না কিন্তু কল্পনা করছেন, হয়ে গেছি। এটা ফ্যান্টাসি, মনছবি না।

আসলে মনছবিতে ফ্যান্টাসির কোনো সুযোগ নেই। আর সারাদিন এ নিয়ে ভাবারও কোনো কারণ নেই। সারাদিন ভাবা মানেই হচ্ছে যে, আপনি এখনো প্রস্তুত হন নি। মনছবি পূরণের লক্ষ্যে আপনি যখন সারাদিন কাজ করবেন তখন বুঝতে হবে যে, ভাবনাটা আপনার মনের গভীরে ঢুকে গেছে। আপনি এস্ট্রোফিজিসিস্ট হতে চাচ্ছেন এবং আপনার পড়াশোনায় মন নেই, আপনার রেজাল্টও তত ভালো না। এর অর্থ আপনি পড়াশোনা করছেন না। পড়াশোনা করলে রেজাল্ট অবশ্যই ভালো হবে। পড়া এমন জিনিস যে, এর জন্যে কোনো বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় না। প্রথম সারিতে থাকার জন্যে বিশেষ মেধার প্রয়োজন নেই।

কোয়ান্টাম পরিবারের যেসব ছেলে-মেয়ে ক্লাসে প্রথম হয়েছেন তারা অধিকাংশই খুব সাধারণ মেধার। কিন্তু তারা তাদের লক্ষ্য জানতেন এবং তাতে অবিচল ছিলেন। তারা লক্ষ্য ঠিক করেছেন এবং লক্ষ্যের জন্যে পরিশ্রম করেছেন। মেডিটেশন করেছেন। মেডিটেশন তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ আধা ঘণ্টা মেডিটেশন দুই ঘণ্টা ঘুমের সমান উপকারী। অর্থাৎ আপনি অনেক বেশি পরিশ্রম করার সুযোগ পাচ্ছেন। ক্লান্তি আপনাকে স্পর্শ করবে না।

আমাদের সমস্যা হলো, একটু কাজ করেই আমরা একঘেয়েমিতে ভুগি। আপনি যখনই কাজকে ভালবাসবেন, সে কাজে কখনো একঘেয়েমি আসবে না। আপনি যত কাজ করবেন তত আপনার ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে, তত আপনার এনার্জি লেভেল বেড়ে যাবে। মনছবিকে মনে করবেন প্রথম প্রেম। অর্থাৎ আপনি যেভাবে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন সেভাবে মনে করবেন–দেখবেন, মনছবি আপনাকে ছাড়বে না। মনছবির দিকে প্রথম আপনি এগুবেন তারপর মনছবি আপনার দিকে এগুবে। এটাই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

প্রশ্ন : *আমি ভাগ্যবিড়ম্বিত একজন মানুষ। কোন মেডিটেশন করলে আমি সফল হতে পারবো, অনুগ্রহ করে বলবেন।*

উত্তর : প্রথমত, আপনার ওপরে আসলে মানসিক চাপটা বেশি। আপনি নিয়মিত শিথিলায়ন মেডিটেশন করুন। এতে আপনার মানসিক চাপটা কমে যাবে।

দ্বিতীয়ত, নিজেকে এখন থেকে ভাগ্যবান মানুষ বলতে শুরু করুন। দেখবেন যে, ভাগ্য আপনাকে সহয়তা করছে। নিজের অবস্থানের জন্যে সবসময় শোকরগোজার থাকবেন। মনে রাখবেন, পৃথিবীতে কেউ না কেউ আপনার চেয়েও খারাপ অবস্থায় আছে। আপনি কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হয়েছেন, কোয়ান্টামের প্রোগ্রামে আসতে পেরেছেন। বহু মানুষ রয়েছে যারা এখনো মেডিটেশনের গুরুত্ব অনুভব করে নি। সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই ভাগ্যবান। আর একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হিসেবে নিজেকে সবসময় ভাগ্যবান মানুষ মনে করা উচিত।

নিজেকে যত ভাগ্যবান মনে করবেন ভাগ্য তত আপনার সহায় হবে। কারণ তখন ভাগ্য আপনার দিকে আকৃষ্ট হবে। আর নিজেকে ভাগ্যহীন মনে করলে শুধু দুর্ভাগ্যই আপনার দিকে আকৃষ্ট হবে। অর্থাৎ আপনি যা চিন্তা করবেন, যা বিকিরণ করবেন সেটা আপনার দিকে আকৃষ্ট হবে। অতএব এই ভাগ্যহীন হওয়ার চিন্তা মাথা থেকে পুরোপুরি বাদ দেবেন। সবসময় শোকরগোজার থাকবেন। এখন থেকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ও রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আপনার নিজ ধর্ম অনুসারে স্রষ্টার নিকট বার বার শুকরিয়া প্রকাশ করবেন। ইনশাল্লাহ! আপনি অবশ্যই সফল হবেন।

প্রশ্ন : *কী করলে নিজেকে ও সৃষ্টিকর্তাকে ভালবাসতে পারবো এবং লেখাপড়ায় পূর্ণাঙ্গ সাফল্যলাভ সম্ভব হবে?*

উত্তর : এজন্যে নামাজে আমরা যে মোনাজাত করি, মনছবি হিসেবে এটি বেশ চমৎকার যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতের কল্যাণ দান কর। এই মনছবিটাকে পরিষ্কার রাখবেন; তাহলে আপনি আল্লাহকে ভালবাসতে পারবেন, নিজেকে ভালবাসতে পারবেন। লেখাপড়ায়ও পূর্ণাঙ্গ সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। তাই সবসময় মনছবিটাকে পরিষ্কার রাখবেন।

প্রশ্ন : *আমরা ঢাকায় থাকি। ঢাকার বাইরের জেলার এক ছেলেকে আমার মেয়ে পছন্দ করে। ছেলে ব্যাংকে কাজ করে। সে বিয়ের প্রস্তাব দিলে আমি না করে দেই এই বলে যে, আমি এতদূরে মেয়েকে বিয়ে দেবো না। এরপর থেকে আমার কেমন যেন অস্থির লাগতে থাকে। মেয়ের বিয়ে হলে কীভাবে থাকবো? মেয়ে এত বছরের সম্পর্ক ভুলতে পারবে কি না? অন্য কোথাও মেয়েকে বিয়ে দিলে কোনো সমস্যা হবে কি না? এসব চিন্তায় অস্থির লাগে। আমি এখন কী করবো?*

উত্তর : আসলে মায়েরা আবেগপ্রবণ হন। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কীসে তার কল্যাণ হচ্ছে তা-ও গুরুত্বপূর্ণ। সেটিও আপনাকে ভাবতে হবে। এমনও হতে পারে, মেয়েকে কাছে রাখার জন্যে পাশের বাড়ির ছেলের সাথে তার বিয়ে দিলেন। সেক্ষেত্রে মেয়ে যে সুখী হবেই এমন নিশ্চয়তাই বা কোথায়? আর কাছে থাকলেই কাছে থাকা হয় না। তেমনি দূরে থাকলেই দূরে থাকা হয় না। দূরে থাকলেও মানুষ অনেক কাছে থাকতে পারে। আবার কাছে থাকলেও মানুষ অনেক দূরে থাকতে পারে।

তাই মেয়ের যাতে মঙ্গল হয় এবং যদি সৎপাত্র পাওয়া যায় তবে কারো না কারো সাথে তো বিয়ে দিতেই হবে। মেয়েকে তো আর আপনি আপনার কাছে রেখে দিতে পারবেন না। যদি রেখে দেন পরে নিজেই আফসোস করবেন। অতএব, অন্যান্য বিষয়গুলো ঠিকঠাক থাকলে শুধু দূরত্বের কারণে মেয়ে বিয়ে দিতে কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয়।

প্রশ্ন : *দিনের অনেকটা সময় আমি ফেসবুকে কাটাই। এখন মনে হচ্ছে এটা অনেক বেশি প্রভাব ফেলেছে আমার ওপরে। ইদানীং পড়তে বসলে নেগেটিভ চিন্তায় মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। মেডিটেশন করতেও তখন ভালো লাগে না। শুধু ফেসবুকের চিন্তা আসে মাথায়। পড়তে বসলে অনেক ধরনের চিন্তা আসে। আশেপাশের মানুষ কী বলছে তা-ও নেতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করি। গুরুজী, জানাবেন কোন মেডিটেশনটা করবো? আমি সবসময় আমার সমস্যা শনাক্ত করতে পারি কিন্তু সবসময় নেতিবাচক হয়ে যাই।*

উত্তর : আসলে এই নেতিবাচকতা থেকে আগে আপনাকে বেরিয়ে আসতে হবে। মেডিটেশন করবেন পরে, আগে ফেসবুক বন্ধ করে দেবেন। কারণ ওটাতে ফেসও নাই, বুকও নাই। এবং এটা আপনার ক্ষেত্রে অসুস্থতার পর্যায়ে চলে গেছে। এখনকার সময়ে আধুনিক যুগের এ এক নতুন রোগ–ফেসবুক। আর এই রোগ থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্ত হতে পারেন আপনি তত ভালো থাকবেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

ধর্ম সদাচারণ ও সত্যভাষণ শিক্ষা দেয়।
আমি সদাচারী ও সত্যভাষী।

ফাউন্ডেশন সংবাদ

নারায়ণগঞ্জ সেলের অফিস উদ্বোধন করলেন মা-জী



২৪ মে ফাউন্ডেশনের নারায়ণগঞ্জ সেলের নতুন অফিস উদ্বোধন করা হয়। অফিস উদ্বোধন করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক শ্রদ্ধেয়া মা-জী নাহার আল বোখারী। অনুষ্ঠানে মা-জী ফাউন্ডেশনের আগামী দিনের কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার দিক-নির্দেশনা প্রদান ও বিশেষ মেডিটেশন পরিচালনা করেন।

সবুজবাগ শাখার মোমেন্টিয়ার মিসেস মাসুদা আক্তার আবেদীন এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'ফাউন্ডেশনের সৎ কাজ' বিষয়ে আলোচনা করেন এবং মগবাজার শাখার মোমেন্টিয়ার জনাব সি এম কামরুম মুনীর আলোচনা করেন মাটির ব্যাংক কার্যক্রম নিয়ে। কোয়ান্টাম পরিবারের ১৪০ জন সদস্য এতে উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহে সেমিনার



'ইয়েস অ্যালামনাই বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে ময়মনসিংহে অন্বেষা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে বাংলাদেশ ইয়ং উইমেন্স সেফটি এন্ড কনফিডেন্স বিল্ডিং ট্রেনিং (ওয়াই ডাবলিউ এস সি বি টি)-এর আট দিনব্যাপী ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এর একটি বিশেষ অংশ ছিলো মেডিটেশন প্রশিক্ষণ। এ ট্রেনিং প্রোগ্রামে ১৫ মে 'আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে মেডিটেশনের ভূমিকা' বিষয়ে আলোচনা করেন ফাউন্ডেশনের অর্গানিয়ার আহমেদ শরীফ।

একই দিনে বিকেল ৩টায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) মিলনায়তন, ময়মনসিংহে এক কোয়ান্টাম সভার আয়োজন করা হয়। এ সভায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ নিতে আসা নবীন ৫০ জন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও 'নেপ'-এর অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ মোট ৯০ জন অংশগ্রহণ করেন। সভায় আলোচনা করেন ময়মনসিংহের ফুলপুর মহিলা ডিগ্রি কলেজ-এর ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক সাইফুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন 'নেপ'-এর যুগ্ম সচিব মো. নাজমুল হাসান খান।

ধানমণ্ডি শাখায় ওয়ার্কশপ

১০ মে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ধানমণ্ডি শাখায় গ্রাজুয়েট প্রো-মাস্টারদের নিয়ে এক বিশেষ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এটি পরিচালনা করেন শ্রদ্ধেয়া মা-জী নাহার আল বোখারী। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এ ওয়ার্কশপ পরিচালিত হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শাখার অর্গনিয়ার আনোয়ার হোসেন টিপু। ওয়ার্কশপে মা-জী 'পরিবার হোক আপনার বিনোদন কেন্দ্র' এ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং বিশেষ মেডিটেশন, প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন। ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন মোট ১৮০ জন সদস্য।



রাজশাহীতে অজেয় ১৯-এর সভা

রাজশাহী সেন্টারের উদ্যোগে রাজশাহীর শিরোইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৫ মে এক ঘণ্টাব্যাপী অজেয় ১৯ প্রোগ্রাম-এর আয়োজন করা হয়। প্রোগ্রামে বিষয়ভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি স্লাইড শো ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়। এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ফাউন্ডেশনের আর্ডেন্টিয়ার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এপ্লাইড কেমিস্ট্রি এন্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ড. আহসান হাবীব। প্রোগ্রামটিতে উপস্থিত ছিলেন মোট ১১৪ জন।



২৩ মে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি, রাজশাহীতে অজেয় ১৯-এর একঘণ্টাব্যাপী একটি প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে দেশের সাতটি জেলা হতে আগত বিভিন্ন মসজিদের ৯২ জন ইমাম উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই স্বেচ্ছায় রক্তদানের বিষয়ে অনুপ্রাণিত হন এবং বহু সংখ্যক ইমাম প্রথম বারের মতো রক্তদানে উদ্বুদ্ধ হন।

মহিলাদের ব্যায়াম কার্যক্রম-এর শততম ব্যাচ পূর্তি

২১ ও ২২ জুন কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রম-এর (মহিলা) শততম ব্যাচ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। কোয়ান্টাম মেডিটেশন হল, কাকরাইলে অনুষ্ঠিতব্য এ কার্যক্রমে শ্রদ্ধেয়া মা-জী নাহার আল বোখারী বিশেষ দিক-নির্দেশনামূলক প্রোগ্রাম পরিচালনা করবেন।

লন্ডনে বৈশাখী মেলায় স্টল



১২ মে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া পার্কে ইংল্যান্ডের সর্ববৃহৎ বৈশাখী মেলায় অংশগ্রহণ করে কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি লন্ডন। দিনব্যাপী শত শত আগ্রহীদের পদচারণায় উৎসবমুখর হয়ে ওঠে এ স্টল। কোয়ান্টাম কণিকা, 'হে মানুষ শোনো' ও শিথিলায়ন মেডিটেশন সিডি ছিলো জনপ্রিয়তার শীর্ষে। স্টলে অনেক সদস্য আসেন মেডিটেশন সম্পর্কে জানতে। স্টলটি প্রবাসী কোয়ান্টাম সদস্যদের এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। উল্লেখ্য, এ স্টলে সাভার রিহ্যাবিলিটিশন ফান্ডের জন্যে অনুদান সংগ্রহের বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়।

জুন ২০১৩-এর কার্যক্রম

কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী কার্যক্রম
বনশ্রী : ১৪ ও ১৫ জুন

কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি কার্যক্রম
আজমপুর : ১৪ ও ১৫ জুন
বনানী : ২১ ও ২২ জুন

জীবনে সফল হওয়ার পথ প্রথমায়ন
মিরপুর : ১৪ ও ১৫ জুন
সিলেট : ২১ ও ২২ জুন

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম
বনশ্রী : ২১ ও ২২ জুন

কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রম
শান্তিনগর : ২১ ও ২২ জুন (পুরুষ)
কাকরাইল : ২১ ও ২২ জুন (মহিলা)
রংপুর : ২৮ ও ২৯ জুন (মহিলা)

কোয়ান্টাম বেসিক কম্পিউটিং প্রোগ্রাম
কোয়ান্টাম বেসিক হার্ডওয়্যার প্রোগ্রাম
: প্রতি শুক্র - সোমবার

আবশ্যক

ভিন্নধারার চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী এবং অভিজ্ঞ সৃজনশীল উদ্যমী তরুণ কোয়ান্টিয়ার আবশ্যক। সিভি-তে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখে আগামী ২০ জুনের মধ্যে পাঠাতে হবে নিম্নোক্ত ঠিকানায়–
info@quantummethod.org.bd
বিষয় লিখতে হবে : AVA CV

বান্দরবানের লামায় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ-এর জন্যে গণিত, ইংরেজি, হিসাব বিজ্ঞান ও বাংলা বিষয়ে শিক্ষক আবশ্যক। লামা সেন্টারের জন্যে ব্রাদার, সিকিউরিটি গার্ড, পিয়ন, মাঠকর্মী, আয়া ও বুয়া আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে সিভি পাঠানোর আহ্বান জানানো হচ্ছে। যোগাযোগ :

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

মধুমাসে কোয়ান্টামম



মধুমাসে চলছে কোয়ান্টাদের আম উৎসব

পরিকল্পিত বনায়ন ও সঠিক যত্নায়নের ফলে কোয়ান্টামম আজ হয়ে উঠেছে দেশের সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর ও সুন্দরতম এলাকার একটিতে। প্রকৃতিতে এখন চলছে মধুমাস। কোয়ান্টামমের আকাশ বাতাসেও এখন আম-কাঁঠালের মৌ মৌ ঘ্রাণ। বিভিন্ন জাতের আম, কাঁঠাল ছাড়াও এখানে উৎপাদিত মৌসুমি ফলের মধ্যে রয়েছে পানিয়াল জাবাটিকাভা জাম গোলাপজাম জামরুল কলা লটকন ইত্যাদি।

কোয়ান্টামমের রহমভ্যালী ও লম্বাখোলার হাসপাতালের জায়গাসহ সব আম গাছেই প্রচুর আমের ফলন হয়েছে। এরই মধ্যে এসব আম গাছ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার কেজি আম সংগ্রহ করে কোয়ান্টামমের কর্মী ও কোয়ান্টাদের মাঝে বিতরণ করা হয়। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও সুস্বাদু ছিলো আরোগ্যশালার আম। আরোগ্যশালার পথের দুইপাশ ও আশেপাশে রয়েছে প্রায় ১৫ প্রজাতির আমের দুইশতাধিক গাছের আমবাগান। বিভিন্ন প্রজাতির আমের মধ্যে রয়েছে আম্রপালী, খিরসাপাতি, ল্যাংড়া, হিমসাগর, মল্লিকা, হাঁড়িভাঙা, ফজলি ইত্যাদি।

ছোট ছোট গাছে অজস্র আমের ফলনে গাছগুলি সব মাটিতে নুয়ে পড়ছে। আরোগ্যশালায় আমবাগানসহ এবারের মৌসুমে প্রায় ১০ হাজার কেজি আম ও প্রায় তিন হাজার কাঁঠাল উৎপাদিত হয়েছে। পরিপূর্ণ যত্নায়ন ও মমতার পরশে প্রকৃতিও যেন নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে। ফলে ধীরে ধীরে একসময়ের ধূসর, রুক্ষ লামা আজ সেজেছে প্রকৃতির রঙে। অনুর্বর পাহাড়ী জনপদ সুশোভিত হয়ে উঠছে নানা বর্ণের ফুলে ফলে।



৯৬ ও ৯৭ তম শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান

শুধু নিজের জন্যে নয় বাঁচতে হবে অন্যের জন্যে





কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের উদ্যোগে কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে ১০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় ৯৬ তম শত আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. সি. এস. করিম।

আজীবন রক্তদাতাদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথি বলেন, কোয়ান্টামের স্বেচ্ছা রক্তদাতারা জানেন যে, তাদের রক্ত যেকোনো মানুষের জন্যে নিরাপদ–এটাও অবশ্যই একটা গর্বের বিষয়। সামাজিকভাবে আমরা রক্তদাতাদের কাছে ঋণী। সমাজের মহৎ কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কাজ সম্পাদন করছেন তারা।

তবে শুধু নিজে রক্তদান করলেই হবে না, আমাদের আশেপাশের সবাইকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ৮ মে অনুষ্ঠিত হয় শত আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানের ৯৭ তম আয়োজন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার। আজীবন রক্তদাতাদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথি বলেন, আমি নিশ্চিত যে, স্বেচ্ছা রক্তদাতারা কেউই কোনো বিনিময়ের জন্যে রক্ত দান করেন না। একজন মুমূর্ষু মানুষের জীবন বাঁচবে বলে তারা রক্ত দান করেছেন। আসলে একা বিত্ত-বৈভবের মধ্যে বেঁচে থেকে কোনো আনন্দ নেই, যদি আমার পাশের লোক আনন্দে না থাকে, সুখে না থাকে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত শুধু নিজের জন্যে নয়, অপরের জন্যে বাঁচা।

আমরা যদি প্রত্যেকে স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের মতো আরো ১০ জনকে রক্তদানে এবং মানুষের কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করতে পারি, তাহলেই বাংলাদেশকে মানবিক গুণসম্পন্ন দেশ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। এ জন্যে প্রয়োজন পরবর্তী প্রজন্মকে মানবিক শিক্ষা দেয়া এবং এমনভাবে গড়ে তোলা যেন সে শুধু নিজের জন্যে নয়, সমাজের জন্যে, অপরের জন্যে ভাবার সুযোগ পায়।

প্রযুক্তি জ্ঞানচর্চায় কোয়ান্টেক সাদাকায়ন



মুক্ত জ্ঞানচর্চা এবং বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে তরুণ প্রজন্মকে যুগোপযোগী ধারণা দিতে এ বছর ১১ জানুয়ারি থেকে প্রতি শুক্রবার বিকেলে বনশ্রী কার্যালয়ে শুরু হয় নতুন কার্যক্রম কোয়ান্টাম টেকনোলজি (কোয়ান্টেক) ক্লাব-এর নিয়মিত আয়োজন সাদাকায়ন কার্যক্রম। সবার জন্যে উন্মুক্ত এই কার্যক্রমে এরই মধ্যে দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তিবিদগণ নিয়মিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন। প্রতি মাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক দুটি ও আত্ম উন্নয়নমূলক দুটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এসএসসিতে কোয়ান্টাদের শতভাগ উত্তীর্ণ

২০১৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় বরাবরের মতো এবারো সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। এ বছর এ স্কুলের ১১ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে চার জন 'এ-প্লাস', ছয় জন 'এ' এবং একজন 'এ-মাইনাস' গ্রেড অর্জন করে। পাশের হার ছিলো শতভাগ।

বাংলাদেশ গেমস-এ কোয়ান্টারা পেলো রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ



২০-২৮ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত দেশের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া আসর বাংলাদেশ গেমস-এ অংশগ্রহণ করে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীরা। বাংলাদেশের 'অলিম্পিক' খ্যাত এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কোয়ান্টারা খো খো, হ্যান্ডবল ও আরচারি বিভাগে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করে জাতীয় ক্রীড়া অঙ্গনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রতিযোগিতায় খো খো খেলায় ১২ জন কোয়ান্টা রৌপ্য পদক ও ১২ জন কোয়ান্টা ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : জুন ২০১৩ ॥ সম্পাদক : কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 8319377, 8391391 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন

আমি এক অনন্য মানুষ আমরা এক মহান জাতি

জুলাই ২০১৩

সৌভাগ্যের ব্যাচ ৩৬৪ তম কোর্স

৫-৮ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কোয়ান্টাম মেথড ৩৬৪ তম কোর্স। শবেবরাত উদযাপনের মহিমান্বিত মাসে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এ কোর্সের ক্লাস। তাই সৌভাগ্যের এ ব্যাচে অংশ নিতে আপনার পরিবার, পরিচিত ও চারপাশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করুন।

ঢাকায় কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের পরবর্তী ব্যাচ অনুষ্ঠিত হবে অক্টোবরে। তাই কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা তাদের পরিচিত স্বজনদের সৌভাগ্যের এ ব্যাচেই কোর্স করানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। পাশাপাশি কোয়ান্টাম সভা আয়োজনের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষকেও উদ্বুদ্ধ করছেন। আর এ কোর্সে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ফাউন্ডেশনে বছরের সবচেয়ে বরকতময় অনুষ্ঠান কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন ও আখেরি দোয়ায় অংশ নেয়ার সুযোগ পাবেন তারা।

রমজানে একাত্ম হোন কোরআনের ধ্যানে

এবার রমজানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১৫ তম কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন। ১২ থেকে ১৮ জুলাই সারাদেশে কেন্দ্রসহ সেন্টার শাখা সেলগুলোতে এ কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন-এর আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া কোয়ান্টামমে এটি অনুষ্ঠিত হবে ১২ থেকে ১৬ জুলাই।

কোরআন নাজিল হয় এ রমজান মাসেই। তাই এ মাসে বেশি বেশি কোরআন চর্চা বিশেষ বরকতপূর্ণ। আর কোরআনের নির্দেশ–মনোযোগ ও মৌনতার মধ্য দিয়ে এর শিক্ষাকে উপলব্ধি করা। এ লক্ষ্যে ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতিবছর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ধ্যানের স্তরে মৌন থেকে কোরআন উপলব্ধির আয়োজন করছে। কোয়ান্টাম পরিবারের গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টারবৃন্দ এতে অংশ নিন। একাত্ম হোন মহিমান্বিত কোরআনের ধ্যানে।

কমপ্যাক্ট আখেরি দোয়ায় অংশ নিন

রমজানে ফাউন্ডেশনের সবচেয়ে বড়, আকর্ষণীয় ও বরকতপূর্ণ অনুষ্ঠান আখেরি দোয়া। কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন পরবর্তী এ কমপ্যাক্ট আখেরি দোয়ায় শরিক হোন। ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তনে গুরুজীর পরিচালনায় সকাল ৯টা থেকে ইফতার পর্যন্ত ১৯ ও ২০ জুলাই কমপ্যাক্ট গ্রাজুয়েট আখেরি দোয়া এবং ২৬ ও ২৭ জুলাই কমপ্যাক্ট প্রো-মাস্টার্স আখেরি দোয়া অনুষ্ঠিত হবে।

‘পারস্পরিক সম্পর্ক’ ওয়ার্কশপে গুরুজী

দেয়াল নয়, গড়ে তুলুন মমতার সেতু



নেতিবাচক আবেগ দিয়ে প্রভাবিত হয়ে প্রায়শই আমরা পারস্পরিক সম্পর্কের মাঝে দেয়াল তুলে ফেলি। এ সম্পর্ক হতে পারে ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক বা পেশাগত। তবে পরিবারের সদস্যরা যেহেতু আমাদের সবচেয়ে কাছের–তাদের সাথেই ভুল বোঝাবুঝি হয় সবচেয়ে বেশি। আর দৈনন্দিন জীবনে যখনই দেয়াল তুলে ফেলবেন আপনিই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাবেন, ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই পারস্পরিক সম্পর্কে দেয়াল নয়, গড়তে হবে মমতার সেতু।

৭ জুন ‘পারস্পরিক সম্পর্ক : অন্যকে বোঝার দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকেই’ শীর্ষক গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে কথাগুলো বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সমস্যা, এর কারণ ও সমাধানের উপায় নিয়ে দিনব্যাপী এ ওয়ার্কশপটি পরিচালিত হয় ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তনে।

ওয়ার্কশপে গুরুজী আরো বলেন, দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বহু সমস্যার কারণ হলো, আমরা নিজেকে সবসময় সঠিক মনে করি। আমরা চাই, অন্যরা আমাকে বুঝুক। অন্যকে বোঝার দায়িত্বও আমরা দ্বিতীয় পক্ষের হাতে দিয়ে দেই। অথচ একজন সফল মানুষ, বুদ্ধিমান মানুষ বোঝানোর দায়িত্বটা সবসময় নিজে নেন। তাই তিনি তার মেধাকে কাজে লাগান, কীভাবে বললে আরেকজন সহজে বুঝবে–এই কৌশল খুঁজে বের করতে।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যত ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হই এর উৎসকে পারিপার্শ্বিক ও মনোজাগতিক হিসেবে ব্যাখ্যা করে গুরুজী বলেন, পারিপার্শ্বিক সমস্যা যত বাড়বে তত আমাদের অন্তর্গত শক্তি বাড়তে থাকবে। অন্যদিকে মনোজাগতিক সমস্যা আমাদের ক্ষতি করে সবচেয়ে বেশি। নেতিবাচক আবেগ–রাগ ক্ষোভ ঘৃণা হিংসা ঈর্ষা পরচর্চা গীবত হলো এর মূল উৎস। আর এই নেতিবাচকতার কারণ হলো শুকরিয়ার অভাব।

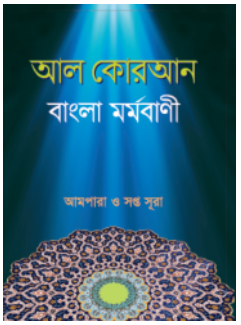
ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক পেশাগত জীবনে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গে গুরুজী বলেন, কষ্টের কথা কখনো অভিযোগ আকারে বলা উচিত নয়। যখনই আপনি অভিযোগ করবেন, অপর পক্ষ নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে উঠবে। দুঃখের কথা এমনভাবে বলতে হবে যেন অপর পক্ষের মমতা সৃষ্টি হয়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সমস্যাগুলো আসলে খুব ছোট ছোট। এই ছোট বিষয়গুলোকে আমরা আমাদের আবেগ, বিশেষত নেতিবাচক আবেগ মিশিয়ে আকারে বড় আর জটিল করে তুলি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সমস্যাকে সমাধান করতে হবে একটা একটা করে। সবসময় প্রশান্ত থাকতে হবে। আর তাহলেই এক এক করে খুলে যাবে সব সমস্যার জট।

আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী

আমপারা ও সপ্ত সূরা

পবিত্র কোরআনের আমপারা (৩০ তম পারা) এবং সপ্ত সূরা–সূরা লোকমান, সূরা ইয়া-সীন, সূরা ফাতাহ, সূরা হুজুরাত, সূরা আর রাহমান, সূরা ওয়াকিয়া ও সূরা মূলক-এর মর্মবাণী নিয়ে গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক-এর গ্রন্থনায় প্রকাশিত হয়েছে পুস্তিকা ও সিডি ‘আল কোরআন ॥ বাংলা মর্মবাণী’।



আধুনিক মননের উপযোগী করে গ্রন্থিত এ পুস্তিকার পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে গুরুজীর কণ্ঠে এর অডিও সিডি। এটি বার বার পড়ুন, বার বার শুনুন। পুরো রমজান মাসে নিজে এর অনুশীলন করুন ও যত বেশি সংখ্যক সম্ভব আত্মীয় বন্ধুসহ চারপাশের সবার মাঝে বিতরণ করুন। পবিত্র রমজানে এ প্রয়াস আপনাকে সফল করবে, সম্মানিত করবে দুনিয়া ও আখেরাতে।

রমজানে মাটির ব্যাংক করসেবা

রমজানে যেকোনো ভালো কাজের সওয়াব কমপক্ষে ৭০ গুণ বেশি। এ লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেলে রমজানে মাসব্যাপী আয়োজন করা হচ্ছে মাটির ব্যাংক করসেবা। এ করসেবায় কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা ব্যক্তিগত কাজের পাশাপাশি কর্মব্যস্ত সময় কাটাবেন নিজের ও পরিচিতদের মাটির ব্যাংক সংগ্রহ, জমাদান ও বিতরণে। এই রমজানে আপনিও আপনার মাটির ব্যাংক জমা দিন নিকটস্থ সেন্টার শাখা সেলে।

রমজানে সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায় করুন

সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায় আল্লাহর নির্দেশ। তাই যাকাত দানে সমর্থ পরিবারের সদস্যরা কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ডে যাকাত জমা করেন এবং অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করেন। এ ফান্ডে জমাকৃত সব অর্থ শরিয়া নির্ধারিত খাতে ব্যয় করা হয়। এ রমজানে আপনার যাকাত জমা দিন কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ডে। এ বছর রুপার বিক্রয় মূল্য হিসেবে ৪২ হাজার টাকা জমা থাকলে যাকাত আদায় ফরজ হবে।

প্রশাসনিক আপীলাত ট্রাইবুনাল-এর মাননীয় বিচারপতি জনাব এম এ মতিন কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৫৬ ব্যাচে সক্রীক অংশ নেন। কোয়ান্টাম বুলেটিনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন নিয়ে তার বৈচিত্রময় উপলব্ধি ও এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে।

চারদিন প্রাণখুলে হেসেছি

বিচারপতি এম এ মতিন



একালের জার্মান লেখক ও খ্যাতিমান বক্তা একার্ট টলি-র লেখা একটি বই পড়ছিলাম–'দি পাওয়ার অফ নাউ'। ২০০০ সালে নিউইয়র্ক টাইম বেস্ট সেলার তালিকায় স্থান পাওয়া এ বইটি তিনি শুরু করেছেন একটি চমৎকার গল্প দিয়ে।

রাস্তার ধারে বসে এক লোক ভিক্ষা করছিলো। সেপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক সাধক। ভিক্ষুকটি তার কাছে ভিক্ষা চাইলে সাধক বললেন–'তুমি কি জানো, তুমি কীসের ওপর বসে আছো? বাক্সটি খুলে দেখ।' ভিক্ষুক একটি ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত কাঠের বাক্সের ওপর বসে ছিলো। সে বললো, এর ওপর বসে আমি ৩০ বছর ধরে ভিক্ষা করছি, এটা খুলে দেখার কী আছে? তবু সাধকের কথায় ভিক্ষুক একসময় বাক্সটি খুললো। দেখা গেল, নিতান্ত অবহেলায় পড়ে থাকা যে বাক্সটির ওপর বসে ভিক্ষুকটি এতদিন পথিকদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলো, সেটি রাশি রাশি সোনায় ভর্তি।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে এ গল্পটিই আমার বার বার মনে পড়ছিলো। কোরআনের একটি আয়াত আমি গত ৪০ বছর ধরে পড়ছি। 'নামাজ শেষ করে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়। আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর।' মিন্টো রোডে আমার বাসা, আর তার খুব কাছেই কোয়ান্টাম মেথডের এমন কর্মচাঞ্চল্যমুখর পরিবেশ–সব মিলিয়ে এত চমৎকার একটি আয়োজন কিন্তু আমি একদিনও খুঁজে দেখি নি যে, এমন অভূতপূর্ব একটি অনুগ্রহ আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছিলো। এ চারদিন আমি সত্যিই প্রাণখুলে হেসেছি।

কোয়ান্টামের পরিবেশটা এমন পারিবারিক আবহপূর্ণ যে, এখানে এলেই মনে হয় সবাই যেন বলছেন–এটা আপনার পরিবার, আপনার বাড়ি। কোর্সের চারদিনই পারিবারিক হৃদ্যতার এই অনুরণন আমরা সবাই অনুভব করেছি।

দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে, রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন, শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞচিত্ততা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর কোয়ান্টাম কোর্সে চার দিন ধরে যে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো আসলে চিরন্তন ধর্মবাণীরই প্রতিধ্বনি। কোয়ান্টাম এভাবে মানুষকে একটি সুন্দর, আলোকিত ও কর্মময় জীবনের দিকে উৎসাহিত করে তুলছে।

আসলে কর্মময় জীবনই তো সার্থক জীবন। আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগের কথা। আমার একজন নিকটাত্মীয় দেশের একটি সম্মানজনক প্রতিষ্ঠানে একাউন্টস অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। একপর্যায়ে হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিয়ে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় তিনি মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমালেন। গিয়েই বুঝলেন যে, ভুল করেছেন। ওখানে তার আয় বেশি হচ্ছিলো ঠিকই, কিন্তু সে তুলনায় কাজের পরিবেশটা ছিলো বেশ কঠিন। তপ্ত মরুভূমিতে কাটাতে হতো দিনের অনেকটা সময়। এ দুরবস্থার কথা জানিয়ে তিনি আমাকে একটি চিঠি লিখলেন–ওখানে তার আর ভালো লাগছে না, আবার দেশেও চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন, এখন কী উপায়? কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত সূরা বালাদ-এর 'লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি কাবাত' আয়াতটি উদ্ধৃত করে আমি তাকে লিখলাম–স্রষ্টা মানুষকে শ্রমনির্ভর করেই সৃষ্টি করেছেন। তুমি কাজ চালিয়ে যাও এবং এর পাশাপাশি তোমার পছন্দসই কাজের জন্যে চেষ্টা করতে থাকো।

পরবর্তীতে ঠিক তা-ই হলো। একসময় সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা যখন জানতে পারলেন যে, তিনি একজন কমার্স গ্রাজুয়েট–তখন একই প্রতিষ্ঠানেই তিনি একাউন্টেন্ট পদে নিয়োগ পেলেন। এর বছর কয়েক পর তিনি ছুটিতে দেশে এসেছিলেন। তখন বললেন, 'আমি যদি তখন দেশে ফিরে আসতাম তবে একূল-ওকূল দুই কূলই হারাতে হতো। সেই হতাশাচ্ছন্ন দুঃসময়ে আপনার চিঠিখানি আমাকে কাজের শক্তি আর সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যুগিয়েছে।'

সে চিঠি যদি আমি আজ লিখতাম তবে 'কর্মব্যস্ত সুখী জীবন' কথাটি অবশ্যই উল্লেখ করতাম। কারণ, আমি মনে করি, কোয়ান্টাম মেথডের এ সূত্রটি মূলত সূরা বালাদ-এর উক্ত আয়াতটির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ জীবনে কর্মটাই আসল; যে কারণে কর্মহীন ইবাদতও কবুল হয় না।

আমি দেখেছি, জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় এমন বিষয়গুলো গুরুজী তার আলোচনায় চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস-এর একটি কথা আছে–'তোমার খাবারই তোমার ওষুধ, তেমনি তোমার ওষুধ হলো তোমার খাবার'। সুস্থ জীবনের জন্যে সঠিক খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে গুরুজীর আলোচনা শুনে একথাটিই আমার বার বার মনে পড়েছে।

এককথায় বলা যায়, কোয়ান্টাম মেথড একটি জীবন-বিজ্ঞান; যিনি যে কারণেই এখানে আসুন বা এ কোর্সে অংশ নেন না কেন, প্রত্যেকেই তার কাজটি সুন্দর ও কার্যকরভাবে করার এবং সেইসাথে মনোদৈহিক সুস্থতা অর্জনের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা এখানে পাবেন।

পবিত্র কোরআনের সূরা ফজর-এ আল্লাহ মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলছেন–'হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে চলো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার (সৎকর্মশীল) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।' অর্থাৎ যারা প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী তাদেরকেই আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশের আহ্বান জানাচ্ছেন। এটি আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় বান্দার মধ্যকার এমন একটি অবস্থা–যখন আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট এবং বান্দাও তার প্রভুর প্রতি পূর্ণ কৃতজ্ঞচিত্ত বা শোকরগোজার।

> আমার খুব কাছেই কোয়ান্টাম মেথডের এমন চমৎকার একটি আয়োজন কিন্তু আমি একদিনও খুঁজে দেখি নি যে, এমন অভূতপূর্ব একটি অনুগ্রহ আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছিলো। এ চারদিন আমি প্রাণখুলে হেসেছি।

এ আয়াতের মর্মার্থ থেকেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি–প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী শোকরগোজার মানুষেরাই পরম করুণাময়ের সন্তুষ্টি অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করবেন। কোয়ান্টাম কোর্সে গুরুজীর আলোচনায় কোরআনের এই চিরন্তন ও সার্বজনীন শিক্ষার মূল সুরটাই ধ্বনিত হয়েছে।

তাই, এ কোর্স থেকে শুকরিয়া আর প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার যে বাস্তব শিক্ষা আমরা পেলাম তা যেন আমরা কেবল নিজেদের মধ্যেই সীমিত করে না রাখি, এটি যেন আমরা আমাদের চারপাশে ঘোষণা করি, ছড়িয়ে দিই মানুষের কল্যাণে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

রক্তদানে রোগমুক্তি



প্রয়োজনের জীবনদায়ী হয়ে উঠতে পারে রক্ত। এ কথা আমরা সবাই জানি। তবে শুধু রক্তগ্রহীতাই নয়, দাতাও এর থেকে নানাভাবে উপকৃত হন। নতুন এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, রক্তদান হৃদরোগ, এমনকি ক্যান্সারের ঝুঁকিও অনেকটাই কমিয়ে দেয়। পাশাপাশি প্রতি পাইন্ট (এক গ্যালনের আট ভাগের এক ভাগ) রক্ত দিলে ৬৫০ ক্যালরি করে শক্তি খরচ হয়। অর্থাৎ ওজন কমানোর ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গবেষকদের ধারণা, রক্ত দিলে দাতার রক্তে উচ্চমাত্রার লৌহ স্তর কমে যায়। এ কারণেই নানাবিধ সুবিধা পায় দাতা। রক্তের বিন্যাস কতটা ঘন বা চটচটে হবে, তা নির্ভর করে লৌহের ওপর। লৌহের মাত্রা বেশি হলে রক্ত ঘন হয়, কোলেস্টেরল তৈরি হওয়ার হারও ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

চিকিৎসাবিষয়ক সাময়িকী 'জার্নাল অব দি আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন'-এর চলতি সংখ্যায় প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য দেয়া হয়। এতে বলা হয়, ৪৩ থেকে ৬১ বছর বয়সী ব্যক্তিরা ছয় মাসে অন্তত একবার রক্ত দিলে তাদের হৃদরোগ বা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেকটাই কমে যায়।

মেডিকেল ডেইলি নামের একটি নিউজ পোর্টাল জানায়, ফিনল্যান্ডের দুই হাজার ৬৮২ জনের ওপর একটি গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে–যারা নিয়মিত রক্ত দেয় তাদের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৮৮ শতাংশ কমে যায়। আরেক জরিপে দেখা যায়, যারা বছরে দুই বার রক্ত দেয়, তাদের অন্যদের তুলনায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও কম থাকে। সাড়ে চার বছর ধরে এক হাজার ২০০ লোকের ওপর এ গবেষণা চালানো হয়।

সূত্র : ডেইলি মেইল
সৌজন্যে : কালের কণ্ঠ (২ জুন ২০১৩)

ভালো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন কর্মব্যস্ততা রোগশোককে দূরে ঠেলে দেয়।

কোমল পানীয়ে দাঁত ক্ষয়

সুন্দর দাঁতের ঝকঝকে হাসি দেখতে কার না ভালো লাগে। ঝকঝকে হাসিটুকু খুব দ্রুতই হারিয়ে যাবে, যদি কোনো ব্যক্তির অতিরিক্ত কোলাযুক্ত মিষ্টি পানীয় পানের অভ্যাস থাকে। কারণ এ ধরনের কোমল পানীয় দাঁতের ক্ষয় ত্বরান্বিত করে। কোকেন ও মেথামফেটামাইন জাতীয় নেশাদ্রব্যের মতোই এসব পানীয় দাঁতের জন্যে ক্ষতিকর বলে দাবি করেছেন বিশেষজ্ঞরা। ব্রিটিশ ডেন্টাল এসোসিয়েশনের বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যেসব নারী তিন থেকে পাঁচ বছর ধরে প্রতিদিন দুই লিটার কোলাযুক্ত পানীয় পান করছে তাদের দাঁতে ক্ষয় শুরু হয়েছে। এই ক্ষয়ের পরিমাণ কোকেন ও মেথামফেটামাইনসেবীদের দাঁত ক্ষয়ের মতোই।

বিশেষজ্ঞরা জানান, প্রতিবার কোমল পানীয় গ্রহণের প্রায় একঘণ্টা পর্যন্ত দাঁতের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব বজায় থাকে। কারণ ওই পানীয়তে থাকা ক্ষতিকর উপাদানগুলোর প্রভাব অকার্যকর করতে মুখের লালার প্রায় একঘণ্টা সময় লাগে। কোনো ব্যক্তি বার বার এই পানীয় পান করলে মুখের ভেতর পর্যাপ্ত লালা নিঃসৃত হওয়ার সময় পায় না ও পানীয়ের প্রভাব ঠেকাতে পারে না। ফলে দাঁতের ক্ষতি হয় এবং ক্ষয়ের পরিমাণ বাড়তে থাকে।

সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া
সৌজন্যে : কালের কণ্ঠ (১ জুন ২০১৩)

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আমার আন্তরিক সালাম জানবেন। মা-জীকেও আমার সশ্রদ্ধ সালাম।

গুরুজী, কয়েক দিন আগে কোয়ান্টামমে তিন দিনব্যাপী কোয়ান্টায়নের শেষ দিনে আমার অনুভূতি বর্ণনায় চাবি হারানোর কথা লিখে আপনাকে জানিয়েছিলাম। আমি কল্পনাও করতে পারি নি যে, স্রষ্টার রহমত, আপনার দোয়া আর মওলানা ছায়ীদুল হক সাহেবের কথা এভাবে একত্রে মিলে যাবে।

মওলানা ছায়ীদুল হক সাহেব বলেছিলেন, কোয়ান্টায়নের দিনগুলোতে পরিপূর্ণভাবে মৌনতা পালন করতে, সাংসারিক, বৈষয়িক কোনো চিন্তা-ভাবনা না করতে এবং আরো বলেছিলেন, এসময় সবকিছুর হেফাজত স্বয়ং স্রষ্টাই করবেন।

আমার অনুভূতি বর্ণনায় আপনাকে লিখেছিলাম, আমার সাধ্যমতো আমি চেষ্টা করেছিলাম যাতে চাবি হারানোর ব্যাপারটি মাথায় থাকা সত্ত্বেও যথাসম্ভব কোয়ান্টায়নের বিষয়বস্তু ও ধ্যান-ধারণায় একাত্ম থাকতে পারি। গুরুজী, আমার মনের দিকে তাকালাম। দেখলাম, সেখানে কোনো অস্থিরতা নেই। মওলানা ছায়ীদুল হক বলেছিলেন, মন অস্থির বা সুস্থির যা-ই হোক না কেন, যেন সবকিছুর জন্যে শুকরিয়া আদায় করি পরম করুণাময়ের নিকট। মনে মনে তা-ই করার চেষ্টা করলাম।

মৌনতা ভাঙার পর সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ নিলাম। কেউ আমাকে চাবির খোঁজ দিতে পারলো না। শেষ ভরসা হিসেবে জিপগাড়িগুলোর দিকে এগুলাম, যেগুলো আমাদেরকে নিয়ে যাবার জন্যে সালাম তোরণের বাইরে প্রস্তুত ছিলো। সেখানে যার



গাড়িতে করে আমি কোয়ান্টামমে এসেছিলাম সৌভাগ্যক্রমে সেই চালকের সাথে আমার দেখা হয়। তাকে সরাসরি আমার চাবি হারানোর কথা বললাম। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, তিনি আমাদের এখানে (কোয়ান্টামমে) পৌঁছিয়ে দেয়ার দুদিন পর গাড়ির সামনের সিটের ইঞ্জিনের নিচে একগোছা চাবি পেয়েছেন। তার বর্ণনামতে সবকিছু আমার সাথে মিলে যাচ্ছিলো। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, চাবিটা যে জায়গায় আটকে ছিলো সেখানে থাকার কথা না। এবং থাকলেও এতটা সময় ধরে থাকার কথা না।

গুরুজী, অবশেষে কোয়ান্টায়ন শেষে ফেরার পথে সন্ধ্যায় আমার চাবিটি ফেরত পেলাম। স্বয়ং স্রষ্টার রহমত ছাড়া এটি পাওয়া সম্ভব হতো না।

গুরুজী, কোয়ান্টায়নের অভিজ্ঞতায় এবার এটি ছিলো অনন্য অর্জন। আমার বিশ্বাসে অনন্য সংযোজন। গুরুজী, এখন সংগ্রামে নামবো নিজের জৈবিক সত্তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। আমাকে জিততেই হবে। আমি জিতবোই। স্রষ্টার অশেষ করুণায় অনন্য মানুষের পথে সফল হবোই। আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজ শেষ করছি।

ডা. সঞ্জয় চন্দ্র ভট্টাচার্য
টেকনিকেল অফিসার, উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন প্রকল্প, সাভার, ঢাকা
৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,



আসসালামু আলাইকুম। মা-জীকেও আমার সশ্রদ্ধ সালাম।

কিছুদিন আগে কোয়ান্টামমে কোয়ান্টায়নে অংশ নেয়ার সুযোগ হয়েছিলো। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! অনেক প্রাপ্তিতে পূর্ণ ছিলো এই কোয়ান্টায়ন। লামার উদ্দেশ্যে বেশ রাত করে যাত্রা শুরু করে পরের দিন রাত ১১টায় আমরা কোয়ান্টামম পৌঁছাই। দীর্ঘ এ যাত্রাপথে একজন মানুষকেও ক্লান্ত হতে দেখি নি। সবাইকে দেখে মনে হয়েছে, যেন এক পরম তৃপ্তি ছেয়ে আছে তাদের। পারিপার্শ্বিক নানা প্রতিকূলতায় পদে পদে আপনার দোয়া অনুভব করেছি।

গুরুজী, কয়েকদিন আগে আমাদের ১১ তম বিবাহবার্ষিকী ছিলো। আপনার ও মা-জীর পক্ষ থেকে দোয়া পেয়ে খুব ভালো লেগেছে। আমার বড় মেয়ে নবনীতা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। পড়াশোনায় আরো মনোযোগী হওয়ার জন্যে আপনার দোয়া চাইছি। ছোটজন নন্দীতা ১৫ মাস বয়স। এখন মুখে আধো আধো বুলি ফুটেছে আর একটু একটু হাঁটতে পারে। কিছুদিন ধরে খুব সুন্দর করে কোয়ান্টা ভঙ্গি করা শিখেছে। দোয়া করবেন–ওরা যেন আলোকিত মানুষ হতে পারে, পরিবারের সবাই যেন আল্লাহর রহমতের ছায়ায় থাকতে পারি আর বিশ্বাসের আলোকে নিজেকে যেন বদলাতে পারি।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
আইটি প্রফেশনাল, আপন এন্টারপ্রাইজ
২৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

ব্যথার তীব্রতা আর নেই

জুলিয়া জেসমিন মিলি



পেশাগত কারণে আমাকে অনেক ব্যস্ত থাকতে হয়। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি করারও ইচ্ছে ছিলো। এর মধ্যে অনেকগুলো মিটিং থাকা সত্ত্বেও কোর্সের আগে কীভাবে যেন সবগুলো পিছিয়ে গেল। ঠিক করলাম এবার কোর্স করবো। আমার দীর্ঘদিনের মাইগ্রেন আর ব্যাকপেইন ছিলো। ওষুধ খেতে হতো। মাইগ্রেনের যন্ত্রণা বলে বোঝানো সম্ভব না। আল্লাহর কাছে অনেক শুকরিয়া, কোর্স করার পর থেকে আমার ব্যথার তীব্রতা নেই বললেই চলে। ওষুধও আর খেতে হচ্ছে না।

[জুলিয়া জেসমিন মিলি, ডেপুটি ডিরেক্টর, জেলা তথ্য অফিস, সিলেট। ৩৫৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আমার অন্তর্চক্ষু খুলে গেছে

নুরুল আলম



জন্মের পর থেকে মা-বাবা অনেক যত্নে লালন করেছেন, পড়ালেখা শিখিয়েছেন। আবার কর্মস্থলে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়েও অনেক কিছু জানার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণ করে বুঝতে পেরেছি, আমরা আমাদের চোখ দিয়ে চারপাশের সব কিছু দেখতে পাই, কিন্তু নিজেকে দেখতে পাই না। গুরুজী আমাদের অন্তরের চোখ খুলে দিয়েছেন।

[নুরুল আলম, সাংবাদিক, দৈনিক আমার দেশ। ৩৬০ ব্যাচ]

আমি এখন ধূমপানমুক্ত

মো. আবু সুফিয়ান



চারপাশের সবাই ব্যস্ত। কিছু ভালো কথা বলার, ভালো উপদেশ দেয়ার সময়, সুযোগ কারো নেই। অথচ কোয়ান্টাম কোনো বিনিময় ছাড়াই আমাদের এ সুবিধাগুলো দিয়ে যাচ্ছে। গত একবছর ধরে আমি সাদাকায়ন, আলোকায়নে অংশ নিয়েছি, মেডিটেশন করছি। দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ আমার ধূমপানের অভ্যাস ছিলো। দৈনিক দুই প্যাকেট সিগারেট লাগতো। কিন্তু মেডিটেশন শুরু করার পর থেকে সেই আমিই একটা সিগারেটও স্পর্শ করি নি। কোর্সের এ শিক্ষা নিয়ে সফল ও সুস্থ জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই।

[মো. আবু সুফিয়ান, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার, উইনার স্টেপস। ৩৬০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আত্মনিয়ন্ত্রণ বেড়েছে

রিদওয়ান চৌধুরী পঞ্চম



আমি ১৯৯৩ সাল থেকে মেডিটেশনের কথা শুনে আসছি। তখন থেকেই মেডিটেশন করার ইচ্ছা ছিলো আমার। কিন্তু পড়াশোনা আর পেশাগত নানা ব্যস্ততার কারণে কোর্সে অংশগ্রহণ করা হয়ে ওঠে নি।

আমার শ্বাসকষ্ট ছিলো, মনোযোগ দিতে পারতাম না। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেয়ার পর থেকে সে সমস্যাগুলো এখন আর অনুভব করছি না। আমার মনে হচ্ছে আমি নিজেকে নিরাময় করতে পারছি। আমার ধৈর্যশক্তি বেড়েছে, রাগও এখন নিয়ন্ত্রণে।

[রিদওয়ান চৌধুরী পঞ্চম, সংগীতশিল্পী। ৩৬১ ব্যাচ]

সমাধান এখন আমার হাতে

উম্যাসিং মার্মা



ভার্সিটিতে পড়ার সময় থেকেই বিভিন্ন এনজিও, সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। মাত্র ২৫ বছর বয়সে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছি। কাজ, ব্যস্ততা সব মিলিয়ে নিজের প্রতি মনোযোগ কমে যাওয়ায় একটা সময় অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আগের সেই প্রাণবন্ততা হারিয়ে যেতে লাগলো। চারপাশের মানুষের নেতিবাচক কথায় আমি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলাম।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে চারদিন ক্লাস করার পর এখন অনেক সুস্থবোধ করছি। এখন আমি জানি, আমার সমস্যার সমাধান কীভাবে করতে হবে।

[উম্যাসিং মার্মা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, রুমা উপজেলা পরিষদ, বান্দরবান। ৩৬০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মনোসংযোগ করা শিখেছি

তন্দ্রা দাশ গুপ্তা



একবার পড়ে গিয়ে আমার মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে যায়। তখন চিকিৎসার জন্যে ভারত যাই। সেখানে প্রাকৃতিক চিকিৎসাপদ্ধতিতে আমি সুস্থ হয়ে উঠি। আমাদের দেশেও যোগ মেডিটেশনের এমন প্রতিষ্ঠান আছে জেনে খুব ভালো লাগলো। আমি বহু আশ্রমে গিয়েছি, মেডিটেশনের অনেক নিয়ম দেখেছি। সবাই বলে, মনোসংযোগ কর। কিন্তু মনোসংযোগের প্রক্রিয়া শিখলাম কোয়ান্টামে এসে।

[তন্দ্রা দাশ গুপ্তা, ব্যবসায়ী। ৩৬০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কোয়ান্টাম মানুষকে ইতিবাচকভাবে বদলে দেয়

আউয়াল চৌধুরী



কিছুদিন আগে আমার পরিচিত এক অভিনেতা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি করেন। কোর্স করার পর থেকে তার কথায়, আচরণে চমৎকার এক সৌম্যভাব আমাকে দারুণভাবে বিস্মিত করে। তার এই আমূল পরিবর্তন আমাকে খুব ভাবালো!

সে আমাকে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে আসার জন্যে অনুরোধ করে। সেদিনই আমি বনশ্রীতে কোয়ান্টামের অফিসে যাই। এভাবেই স্বপ্রণোদিত হয়ে আমার কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আসা। এ কোর্সে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশই বয়সে তরুণ। এখন মনে হচ্ছে আরো আগে এ কোর্সটি করা দরকার ছিলো। তবে আমি এখনো আশাবাদী।

মেডিটেশন অনেক প্রাচীন কালের শিক্ষা। কোয়ান্টাম কোর্সের মাধ্যমে সে শিক্ষাকে আমাদের ভাষায় আমাদের উপযোগী করে উপস্থাপন করা, এর চর্চায় আমাদের উৎসাহিত করা, সর্বোপরি ধর্মীয় বিশ্বাস এবং বিজ্ঞান–এ দুটোর সমন্বয় সাধন করা–এটা সত্যিই অসাধারণ।

[আউয়াল চৌধুরী, প্রযোজক, বাংলাদেশ টেলিভিশন। ৩৬১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মাথাব্যথার ওষুধ আর খেতে হয় না

সানজিদা হক মীম



৩য় শ্রেণীতে পড়ার সময় প্রথম আমার মাইগ্রেন ধরা পড়ে। ডাক্তার বলেছেন, এটা ভালো হবে না, সবসময় ওষুধ খেতে হবে। সে সময় থেকেই আমি ওষুধ খেয়ে যাচ্ছি। মাইগ্রেনের ব্যথার জন্যে আমি নিয়মিত পড়াশোনা করতে পারতাম না। ফলে আমি খুব পিছিয়ে পড়ছিলাম। এসব নিয়ে যখন আমি খুব টেনশন করতাম তখন মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেতাম। এজন্যে সাইকিয়াট্রি ও নিউরোলজির অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে। তারা আমাকে ঘুমের ওষুধ দিতেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই আমার দিন শেষ হয়ে যেত। এজন্যে আমি হাসপাতালেও ভর্তি হয়েছি। কিন্তু আমার শারীরিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয় নি।

আমার মামার পরামর্শে আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আসি। আল্লাহর রহমতে কোর্সে অংশগ্রহণ করার পর থেকে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। ওষুধ খাওয়াও তাই ছেড়ে দিয়েছি। আমার ওষুধের বক্স বাসায় পড়ে আছে। আমার মা-বাবা সবাই অনেক খুশি যে, আমাকে আর ওষুধ খেতে হয় না।

[সানজিদা হক মীম, ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী, ভিকারুননিসা নূন স্কুল। ৩৫৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপের অনুভূতি

৭ জুন ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ। 'পারস্পরিক সম্পর্ক : অন্যকে বোঝার দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকেই' শিরোনামে দিনব্যাপী এই ওয়ার্কশপে সারাদেশ থেকে আগত কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটেরা সমবেত হন।

এই ওয়ার্কশপে দৈনন্দিন জীবনে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে করণীয়সমূহ নিয়ে ছিলো বিশেষ আলোচনা ও মেডিটেশন। পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে এবং সামাজিক সম্পর্কগুলোতে যেসব সমস্যা হয়ে থাকে তা সমাধানে নিজের দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয় এতে। এছাড়াও ছিলো মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দানের গুরুত্ব এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা। ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী গ্রাজুয়েটদের কয়েকজনের অনুভূতি ও উপলব্ধি তুলে ধরা হলো–



মোহাম্মদ মনির উল হক

ব্যবসায়ী মোহাম্মদ মনির উল হক তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বললেন, ওয়ার্কশপে নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দান প্রসঙ্গে আলোচনা এবং রক্তদান নিয়ে প্রদর্শিত দুটি ভিডিওচিত্র আমার খুবই ভালো লেগেছে। প্রোগ্রাম শেষে আমি কোয়ান্টাম ল্যাবে গিয়ে রক্তদান করেছি। আমি ওয়ার্কশপে এসে এতটাই উদ্বুদ্ধ যে, সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর কোনো ওয়ার্কশপ মিস করবো না।



আবিদা হোসেন

ভিকারুননিসা নূন স্কুলের সিনিয়র শিক্ষিকা আবিদা হোসেন গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপের অনুভূতি জানিয়ে বলেন, ওয়ার্কশপের প্রতিটি আলোচনা, মেডিটেশনসহ সবকিছুই খুব ভালো লেগেছে। বিশেষ করে পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, সন্তানদের সাথে মা-বাবার সম্পর্ক নিয়ে যে–কথাগুলো গুরুজী বলেছেন, তা অত্যন্ত কার্যকরী। আসলে খুব কাছের সম্পর্কগুলোর প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কীভাবে যত্নবান হতে হবে সে বিষয়ে জানতে পেরেছি ওয়ার্কশপে।



মির্জা আজিজুল হক

ব্যবসায়ী মির্জা আজিজুল হক বলেন, কোয়ান্টামের প্রতিটি প্রোগ্রাম আমাকে চমৎকারভাবে উজ্জীবিত করে। এবারের ওয়ার্কশপে এসে অনুভব করলাম চারপাশের মানুষকে বুঝতে পারলেই আমরা জীবনকে অনেক সুন্দর করতে পারবো। জীবনে সফল হতে হলে যেমন নিজেকে দায়িত্ব নিতে হয় তেমনি পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রেও নিজেকেই দায়িত্ব নিতে হবে। সমস্যা সমাধানে সবসময় নিজেকে এগিয়ে যেতে হবে। যে শিক্ষাগুলো পেয়েছি তা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি নিজের পরিবার থেকেই।



ডা. সোহানা সেলিম

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত ডা. সোহানা সেলিম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, কোর্স করার পর এ পর্যন্ত তিনটি ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছি। প্রতিটি ওয়ার্কশপে গুরুজীর যে দিক-নির্দেশনাগুলো পেয়েছি, তা সারা জীবনের জন্যেই আমার পাথেয় হয়ে থাকবে। এবার ওয়ার্কশপে এসে অনুভব করলাম, আসলে আমরা সবাই চাই অন্যরা আমাকে বুঝুক। আগে এই প্রত্যাশার কারণে কখনো কখনো আমারও মন খারাপ হতো। কিন্তু এখন জানি, বোঝানোর দায়িত্ব, সমাধানের দায়িত্ব নিতে হবে নিজেকেই।



এন্থনী চয়ন অধিকারী

স্কয়ার গ্রুপ-এ কর্মরত এন্থনী চয়ন অধিকারী জানালেন, ফাউন্ডেশনের প্রতিটি প্রোগ্রামেই খুঁজে পাই জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা। এবারের গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে উপলব্ধি করেছি কাছের মানুষগুলোর সাথে সুসম্পর্কের গুরুত্ব। ওয়ার্কশপে গুরুজী বলেন, অন্যকে বোঝার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। এখন সব জড়তা ভুলে আমি নিজেই উদ্যোগী হয়েছি সবার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে।



রেবা রাণী নাথ

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা রেবা রাণী নাথ বলেন, চেষ্টা করি সবার মাঝে মাটির ব্যাংক বিতরণ করতে। গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে দানের বিষয়ে আলোচনা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে আরো বেশি মানুষকে দানের বিষয়ে সচেতন করে তুলতে। কোয়ান্টাম পরিবারের সাথে যুক্ত হয়ে মনে হয়, জীবনের একটা অবলম্বন খুঁজে পেয়েছি। আমার এ ভালোলাগার কথা আমি চারপাশের মানুষের কাছেও বলি।



সুভাশীষ দাশ

বরিশাল বিএম কলেজ-এ অনার্স ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত সুভাশীষ দাশ বলেন, আমার সবসময় মনে হতো আমাকে কেউ বোঝে না। কিন্তু ওয়ার্কশপে অংশ নেয়ার পরে মনে হচ্ছে, আমিই তাকে বোঝাতে পারি নি। অনেক সময় পরিবারের সদস্যদের ওপর, আপনজনদের ওপর ছোট ছোট বিষয়ে রাগ হয়ে যেত। কিন্তু এখন প্রো-একটিভ থেকে তাদের বোঝার চেষ্টা করি। সমস্যার অংশ না হয়ে কীভাবে সমাধানের অংশ হওয়া যায় এটাই শিখেছি গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে।



শারমিন শাহরিয়া

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে কর্মরত শারমিন শাহরিয়া বললেন, ওয়ার্কশপে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে যে দিক-নির্দেশনাগুলো পেয়েছি তা আমার জন্যে খুবই প্রয়োজন ছিলো। ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার সামাজ এবং কর্মক্ষেত্রে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সহজ সূত্রগুলো জানতে পেরেছি। যাকাত সম্পর্কে ধারণা আরো স্বচ্ছ হয়েছে। যাকাত সুষ্ঠুরূপে আদায় করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা-ও উপলব্ধি করেছি।



মো. জহিরুল ইসলাম

ময়মনসিংহের গফরগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, ওয়ার্কশপে গুরুজী বলেছেন, যে সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না, সেখানে কখনো দেয়াল না তুলতে। কথাটি আমাকে খুব নাড়া দেয়। আমিও সেরকমটাই চেষ্টা করছি। ওয়ার্কশপের আলোচনা আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে অন্যদের মাঝেও দানের গুরুত্ব তুলে ধরতে। সবচেয়ে বড় যে উপলব্ধি নিয়ে আমি ফিরেছি সেটা হলো, অন্যের সমালোচনা বা গীবত থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।



তাসমিনা আফরোজ

গৃহিণী তাসমিনা আফরোজ জানালেন, ওয়ার্কশপে যাকাতের ওপর বিস্তারিত আলোচনা ভালো লেগেছে। আগে জানতাম শুধু সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের হিসেবেই যাকাত দিতে পারবো। কিন্তু এই আলোচনা থেকে জানলাম রুপার হিসেবেও একজন মানুষ যাকাতদাতা হতে পারে। সেইসাথে জানতে পেরেছি ফাউন্ডেশনে জমা দেয়া যাকাতের অর্থ কোন কোন খাতে ব্যয় হয়। আমি মনে করি, এই স্বচ্ছ ধারণা পেয়ে সবাই উপকৃত হয়েছে।

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *গুরুজী, একটি ঘটনায় আমি কয়েকদিন ধরে বিচলিত, আতঙ্কিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছি। ঘটনাটি আমাদের বাসায় ভাড়া থাকে এমন একটি পরিবারের ছোট ছেলেকে নিয়ে। সে স্কুলে পড়ে, তার বয়স ১৪ থেকে ১৫ বছর। সে কয়েকদিন আগে আত্মহত্যার চেষ্টা করে এবং পুরো বোতল স্যাভলন খেয়ে ফেলে। এ যাত্রায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে বাঁচানো হয়।*

এর কয়েকদিনের মধ্যে সে আবার তার হাত কেটে ফেলে। সে তার বাসায় হুমকি দিচ্ছে। তাকে নিয়ে তার পরিবারও আতঙ্কিত। এই পরিস্থিতিতে আমি কীভাবে তাদের সাহায্য করতে পারি? আমি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছি। কোয়ান্টামের কথা কীভাবে তাদের বলবো? এত অল্প বয়সে কেন সে এ রকম ভুল করলো? সে ভালো আছে তো? এসব বিষয় নিয়ে আমি চিন্তিত ও বিচলিত। দয়া করে সমাধান দেবেন।

উত্তর : এটা হচ্ছে আমাদের তরুণ প্রজন্মের একটা সমস্যা। এসব ব্যাপারে আমরা একটা জায়গায় ভুল করি। আসলে সমবেদনা জানানো আর কারো সমস্যার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা দুটো আলাদা বিষয়। গৃহপালিত প্রাণী হাঁস এবং মুরগির কথাই ধরুন। হাঁস পানিতে ডুব দিয়ে উঠে এসে যখন গা ঝাড়া দেয় তখন তার শরীরে পানির কোনো চিহ্ন থাকে না। কিন্তু একটি মুরগিকে পানিতে ডোবানো হলে ডাঙ্গায় ওঠার পর সে ভিজে একেবারে চুপসে যায়। এখানেই হলো পার্থক্য।

যে সমস্যা আপনি সমাধান করতে পারবেন না সেটার মধ্যে কখনো জড়াবেন না। সেটা হোক ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারবো না সেটা নিয়ে আমরা বেশি চিন্তা করি। আর এটা হচ্ছে আমাদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ।

আপনি যে ছেলেটির কথা উল্লেখ করেছেন, সে যেকোনোভাবেই হোক নেতিবাচক হয়ে গেছে। তার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। তার সাথে যে-ই জড়াবে সে-ই এটা দ্বারা আক্রান্ত হবে। আপনি জড়ালে আপনিও আক্রান্ত হবেন। আপনি ইতোমধ্যে কিছুটা আক্রান্ত হয়েও গেছেন। এখন সে ছেলেটির কথা ভেবে যদি আপনি চিন্তিত হন, বিচলিত হন, আপনার পড়াশোনা নষ্ট করেন–তাহলে আপনি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

তার এখন সঠিক চিকিৎসা প্রয়োজন। কারণ তার সমস্যা মানসিক। এ ব্যাপারে তাকে শুধু একজন সাইকিয়াট্রিস্ট সহযোগিতা করতে পারেন। আপনার পক্ষে তাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। কেন তার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সৃষ্টি হলো–এ সমস্যার সমাধান আপনি করতে পারবেন না, কারণ এটা আপনার সাবজেক্টও না।

যে কারণে আমরা বলেছি যে, নেতিবাচক লোক থেকে সবসময় দূরে থাকতে হবে। যাতে তার কোনো বিষয় আপনাকে প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত না করে। তাকে কখনো বন্ধু ভাবতে যাবেন না। সবসময় তার কল্যাণ কামনা করবেন, তার জন্যে দোয়া করবেন, এ-ই যথেষ্ট। অল্প বয়সে আসলে মন খুব নরম থাকে, এ সমস্ত ব্যাপারে তারা বেশি জড়িয়ে যায়। কিন্তু নেতিবাচক লোক–যারা নিজের জীবনে, অন্যের জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করে তারা কখনো কারো বন্ধু হতে, কখনো কারো উপকার করতে পারে না।

কথাগুলো কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু এটা হচ্ছে রূঢ় বাস্তবতা। আপনাকে আগে নিজেকে তৈরি করতে হবে, নিজেকে বড় করতে হবে, নিজেকে সফল করতে হবে। তখন আপনি অনেক মানুষকে সহযোগিতা করতে পারবেন, অনেক মানুষের উপকার করতে পারবেন, কল্যাণ করতে পারবেন। কিন্তু নিজে সফল না হয়ে আপনি যদি অন্যের প্রতি আবেগবশত কিছু করতে যান আপনি তারও কোনো উপকার করতে পারবেন না, নিজের তো নয়ই।

প্রশ্ন : *আমার স্ত্রীর দুটি ফেলোপিয়ান টিউবই ব্লকড। ডাক্তার বলেছেন, টেস্টটিউব বেবি নেয়া ছাড়া আর কোনো চিকিৎসা নেই। টেস্টটিউব বেবি পদ্ধতিতে সন্তান হওয়ার হার খুবই নগণ্য। চিকিৎসাটাও ব্যয়বহুল। ডাক্তার যত দ্রুত সম্ভব সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন। কারণ রোগীর বয়স এক্ষেত্রে একটা বড় ফ্যাক্টর। আমার স্ত্রীর বয়স এখন ৩৩ চলছে। এই অবস্থায় আমরা কী করতে পারি? দোয়া করবেন যেন আমাদের সৎকর্মশীল ঈমানদার সুস্বাস্থ্যবান একটি সন্তান হয়।*

উত্তর : আমরা আপনার জন্যে দোয়া করি। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে টেস্টটিউব বেবি জন্মদানের যে পদ্ধতি তার সাকসেস রেট খুব কম। আমরা দোয়া করছি যাতে আপনারা এতে সফল হতে পারেন। আর যদি সফল না-ও হন তাতেও চিন্তার কিছু নেই। সবসময় মনে করবেন যে, পৃথিবীতে সন্তানের কোনো অভাব নেই। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় শোকরগোজার থাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। চেষ্টা করে যাবেন কিন্তু সর্বাবস্থায় শোকরগোজার থাকবেন। এটাকে কোনোভাবেই না-শুকরিয়ার কারণ হতে দেবেন না। কারণ আপনার মধ্যে না-শুকরিয়া ঢুকলেই আপনি মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়বেন।

প্রশ্ন : *আলস্যের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হলে কী করতে হবে? ওজন কমানোর জন্যে আমি হাঁটি কিন্তু হাঁটার পর খুব ক্লান্ত লাগে এবং ক্ষুধা লাগে, এক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি?*

উত্তর : আপনি হাঁটবেন। হাঁটার পর ভাববেন যে, এই মুহূর্তে খাওয়ার মতো আপনার কাছে কিছুই নেই। সময় না হওয়া পর্যন্ত খাওয়া যাবে না। আর খাওয়ার সময় অল্প অল্প খাবেন। এক সাথে বেশি খাবেন না। তাতে যে খাবারটুকু খেলেন ওটা ক্যালরিতে পরিণত হবে এবং বার্নআউট হয়ে যাবে। আবার নতুন ক্যালরি হওয়া শুরু করবে। অর্থাৎ ক্যালরি ফ্যাটে পরিণত হওয়ার সুযোগ পাবে না।

আর আলস্যের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার খুব সুন্দর উপায় আছে। লামায় কোয়ান্টামে আমাদের খেদমতায়ন কার্যক্রম রয়েছে। ৪০ দিন বা ৯০ দিনের জন্যে আপনি চলে যেতে পারেন। ওখানে ভোর ৫টা থেকে রাতে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত 'খেদমতায়ন' কার্যক্রম চলে। আপনার আলস্য বলে কিছু থাকবে না। যে কেউ ৪০ অন্তত দিনের জন্যে এই খেদমতায়নে অংশ নিতে পারেন। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, কোয়ান্টামে খেদমতায়ন থেকে আসার পর আপনাকে কেউ অলস বলবে না। কারণ ওখানে আলস্যের কোনো সুযোগ নেই।

আসলে পরিশ্রম করার জন্যে দেহটাকে প্রস্তুত করতে হয়। শরীরের নাম মহাশয় যা সহাও তা-ই সয়। একদিনে যেহেতু এটা সম্ভব নয় তাই কোয়ান্টামে ৪০ দিন, ৯০ দিনের প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে। আপনি ওখানে তিন মাস থাকুন। দেখবেন, আপনি সময়মতো ঘুম থেকে উঠতে পারছেন, সময়মতো খেতে পারছেন এবং আপনার শরীরের ফিটনেস দেখেও আপনি নিজেই অবাক হবেন।

প্রশ্ন : *আমার সন্তান কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। কিন্তু সে সবসময় রি-একটিভ আচরণ করে। সবসময় আমার দোষ খুঁজতে থাকে, নিজের দোষ খোঁজে না। এ অবস্থায় আমার করণীয় কী?*

উত্তর : আসলে সমস্যাটা সন্তানের নয়, সমস্যাটা আপনার। কারণ আপনি সবসময় তার দোষ খোঁজেন আর সে আপনাকেই অনুসরণ করছে। কারণ মা-বাবা যা বলেন সন্তান সেটা করে না। সন্তান সেটাই করে যা মা-বাবা করেন। এটা হচ্ছে সন্তানের উল্লেখযোগ্য একটা বৈশিষ্ট। আপনি হয়তো তার ভালো কাজের প্রশংসা না করে খারাপ কাজকেই সবসময় দেখেন। এটিই তার মধ্যে রি-একটিভিটির সৃষ্টি করেছে।

আপনি রি-একটিভ হলে সন্তানও রিএকটিভ হবে। আপনারই তো ছেলে। আপনি প্রো-একটিভ হন এবং সবসময় তার জন্যে দোয়া করুন। সে যে কত ভালো সেটা তাকে বলুন। তার ভালো জিনিসগুলোকে তার সামনে তুলে ধরুন। মিথ্যা বলবেন না। যে গুণ তার মধ্যে নেই সেটা বলবেন না। তবে যে গুণ তার মধ্যে আছে সেটাকে বার বার বলুন। আপনি আর তার দোষ খুঁজবেন না। আপনি সবসময় তাকে ভালো বলবেন। অর্থাৎ আপনি তাকে যেরকম দেখতে চান সেই কথাগুলো বার বার বলবেন। তাহলে আপনার সন্তান ইতিবাচক হবে।

প্রশ্ন : *আমি ৩৩৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট। নিয়মিত মেডিটেশন করি কিন্তু কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাই না। এমনকি কমান্ড সেন্টারে নিজের স্বামীর ছবিও পরিষ্কার দেখতে পাই না। মন খারাপ হয়ে যায়। কী করবো?*

উত্তর : মেডিটেশনে স্বামীর ছবি পরিষ্কার হওয়ার জন্যে স্বামীর একটা ছবি সামনে রাখবেন। চোখ মেলে স্বামীর ছবি দেখবেন তারপর চোখ বন্ধ করে স্বামীর ছবি অবলোকন করবেন। এভাবে কয়েকবার চোখ খুলে এবং বন্ধ করে ছবি দেখবেন। নিজের মায়ের ছবি দিয়েও এটি চর্চা করতে পারেন। এভাবে অনুশীলন করতে করতে একসময় দেখবেন যে, চোখ বন্ধ করে আপনার অবলোকন করার ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে।

এ মাসের অটোসাজেশন

বঞ্চিতকে সাহায্য করলে
অন্তর্গত শক্তি বাড়ে।
আজ আমি একজন বঞ্চিতকে
সাহায্য করবো।

যাত্রাবাড়ী কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন



১ জুন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন যাত্রাবাড়ী কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান। এ কার্যালয়ের মাধ্যমে কোয়ান্টামের আলোকিত জীবনের বাণী, প্রশান্তি সুস্বাস্থ্য ও সাফল্যের বাণী বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে– উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন গেণ্ডারিয়া শাখার মোমেন্টিয়ার মিসেস তহুরা কালাম। কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট, এসোসিয়েট ও প্রো-মাস্টারসহ মোট ৭০ জন এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মিরপুরে গৃহকর্মীদের চিকিৎসাসেবা



মিরপুরে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন রূপনগর কার্যালয়ে গৃহকর্মীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এতে বাসাবাড়িতে কর্মরত গৃহকর্মীদের গাইনি সমস্যাসহ সব ধরনের রোগের প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। গাইনি ও মেডিসিন বিভাগের অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা এই সেবা প্রদান করেন। চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী তাদেরকে প্রয়োজনীয় ওষুধও বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

প্রতি সোমবার বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর আওতায় এ পর্যন্ত ২১৭ জন গৃহকর্মীকে চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি রোগ নিরাময় ও সুস্থ জীবনযাপনের লক্ষ্যে গৃহকর্মীদের অটোসাজেশন অনুশীলন ও কোয়ান্টাম ব্যায়ামের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়াও ভেষজ চিকিৎসাপদ্ধতিতে বিনা খরচে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের কৌশল সম্পর্কেও তাদের ধারণা দেয়া হয়।

ইউএনডিপি বাংলাদেশ কার্যালয়ে সেমিনার

২০ জুন ইউএনডিপি বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে মেডিটেশন বিষয়ক এক বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় আগারগাঁওয়ের আইডিবিতে অবস্থিত নিজস্ব কার্যালয়ে। এতে অংশ নেন ইউএনডিপি বাংলাদেশ-এ কর্মরত ৪৭ জন দেশি-বিদেশি কর্মী।



দুই ঘণ্টাব্যাপী এ সেশনে ছিলো প্রশান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সাফল্যের জন্যে দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব ও প্রক্রিয়ার ওপর বিশেষ আলোচনা ও মেডিটেশন। আলোচনা করেন ফাউন্ডেশনের অর্গানিয়ার রাবিয়া নাজরীন এবং অর্গানিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল। ইউএনডিপি বাংলাদেশ-এর লার্নিং কমিটির প্রধান মিস নারানতুয়ার এ সেমিনার আয়োজন করেন।

মতিঝিল শাখায় ওয়ার্কশপ



৮ জুন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মতিঝিল শাখায় এক বিশেষ কোয়ান্টিয়ার ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। শাখার মোমেন্টিয়ার অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব-এর সভাপতিত্বে এ ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন শাখার আর্ডেন্টিয়ার মো. আবুল ফয়সাল রাজু। ওয়ার্কশপে কোয়ান্টিয়ারের গুণাবলি, শাখার দায়িত্ব পালন ও নেতার প্রতি আনুগত্য এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন অর্গানিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল এবং অধ্যাপিকা মুরশিদা খানম। ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন মোট ৬২ জন সদস্য।

হাতিরপুল শাখার ওয়ার্কশপ

১৪ জুন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন হাতিরপুল শাখার উদ্যোগে কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে দিনব্যাপী এক ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। ওয়ার্কশপে 'এবারের রমজান হোক কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধির রমজান' বিষয়ে আলোচনা করেন মিরপুর সেন্টারের মোমেন্টিয়ার আবদুল্লাহ জুবাইর। 'দানের গুরুত্ব' বিষয়ে আলোচনা করেন মতিঝিল শাখার মোমেন্টিয়ার অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব, ও 'রমজানে করসেবা ॥ সৎকর্মের অনন্য সুযোগ' বিষয়ে আলোচনা করেন আর্ডেন্টিয়ার নাসরিন আবেদীন। কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টারসহ মোট ১০৩ জন এতে অংশ নেন।

সিডনিতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

১৫ জুন কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি সিডনি সেল ক্যান্টাবারি কাউন্সিল-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে রিভারউড সাবার্বের সল্ট পেন ক্রেক রিজার্ভ-এ এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করে। এতে গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার ও এসোসিয়েটদের সাথে যোগ দেন স্থানীয় প্রকৃতিপ্রেমীরাও। প্রবাসে বৃক্ষরোপণের মতো সাদকায়ে জারিয়াতে অংশগ্রহণ করতে পারা ছিলো দারুণ পরিতৃপ্তির। বৃক্ষরোপণ শেষে সবাই অংশ নেন শুকরিয়ার মেডিটেশনে।



বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে ইংল্যান্ডে বিশেষ প্রোগ্রাম

বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে ইংল্যান্ডে ১৯ জুন কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি লন্ডন স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের আয়োজন করে। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস ডোনার সেন্টারে এ প্রোগ্রামে মোট ৫৬ জন অংশগ্রহণ করেন। ১০ বার রক্তদান করেছেন এমন দুজন ডোনার এবার ব্রোঞ্জ এওয়ার্ড লাভ করেন। এ পর্যন্ত সোসাইটির মোট ১৩ জন রক্তদাতা এ এওয়ার্ড লাভ করেন।

আবুধাবিতে সাদাকায়ন ও পুনর্মিলনী

৭ জুন কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি আফ্রো-এশিয়া প্রি-সেলের উদ্যোগে আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ সাদাকায়ন ও পুনর্মিলনী। কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও যাকাতের ওপর প্রাণবন্ত আলোচনা, দোয়ার মেডিটেশন, অনুভূতি বর্ণনা ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন–সবমিলিয়ে চমৎকার এক অনুভূতিময় ও আনন্দঘন দিন অতিবাহিত করেন অংশগ্রহণকারীরা। কোয়ান্টাম পরিবারের ১৪ জন সদস্য এতে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে পরিবারের ছয় জন সদস্য এ প্রোগ্রামে উপস্থিত হন। এতে 'যাকাত দিলে সম্পদ বাড়ে' ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়।

আবশ্যক

বান্দরবানের লামায় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ-এর জন্যে গণিত, ইংরেজি, বিজ্ঞান ও গানের শিক্ষক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে সিভি পাঠানোর জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছে। যোগাযোগ :

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

কোয়ান্টাম ব্যায়াম কোর্সের শততম ব্যাচপূর্তি



দুই দিনব্যাপী কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রমের পুরুষদের ১০০ তম ব্যাচ অনুষ্ঠিত হলো গত ৩১ মে ও ১ জুন এবং মহিলাদের ১০০ তম ব্যাচ অনুষ্ঠিত হলো ২১ ও ২২ জুন। কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হল এবং ৩য় তলায় কোয়ান্টাম গ্যালারি মিলিয়ে প্রথমবারের মতো মাল্টিমিডিয়া প্রজেকশনের ব্যবহারে এ ব্যাচ দুটি ছিলো বিশেষ ব্যাচ।

শততম ব্যাচের দুটি আয়োজনেই উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মা-জী নাহার আল বোখারী। সুদীর্ঘ ৩২ বছরের গবেষণা ও নিয়মিত ব্যায়াম অনুশীলন, যোগ ব্যায়ামকে আরো সহজ ও ফলপ্রসূ করে কোয়ান্টাম ব্যায়ামে রূপান্তরের অভিজ্ঞতা এবং কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা বইটি লেখার পেছনে তার অনুপ্রেরণা–এসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন শ্রদ্ধেয়া মা-জী।

তিনি বলেন, দেহ হলো আত্মার নিবাস, তাই দেহের সুস্থতার ওপরই নির্ভর করে মানুষের ভালো থাকা। আপনি দেহের প্রতি যত বেশি সচেতন হবেন এবং যত্ন নেবেন, তত বেশিদিন কর্মক্ষম থাকবেন। আর দেহ সুস্থ রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত কোয়ান্টাম ব্যায়াম। কোয়ান্টাম ব্যায়াম শুধু শিখলে হবে না, প্রতিদিনের কর্মতালিকায় এটি থাকতে হবে।

মা-জী আরো বলেন, প্রযুক্তিনির্ভর এই সময়ে সঠিক খাদ্যাভ্যাস, মেডিটেশন, নিয়মিত হাঁটা এবং কোয়ান্টাম ব্যায়ামের সমন্বয়ই নিশ্চিত করতে পারে সুস্বাস্থ্য। প্রশ্নোত্তর পর্বের পাশাপাশি সুস্বাস্থ্যের অটোসাজেশন দিয়ে বিশেষ মেডিটেশন পরিচালনা করেন মা-জী।

কোয়ান্টাম ব্যায়াম-এর ১০০ তম আয়োজনে পুরুষদের ব্যাচে অংশ নেন ১৩০ জন এবং মহিলাদের ব্যাচে অংশ নেন ১২৯ জন। উৎসবমুখর পরিবেশে শততম ব্যাচে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন বিভিন্ন পেশার এবং বিভিন্ন বয়সের মানুষ।

অনুভূতি জানাতে গিয়ে অনেকেই বলেন, কোয়ান্টাম ব্যায়াম শরীরের জন্যে এতটা উপকারি এবং এর অনুশীলন এত সহজ–তা এখানে না এলে অজানা থেকে যেত। এতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই ছিলেন দারুণভাবে উৎফুল্ল এবং উজ্জীবিত।

মহিলাদের ব্যাচ পরিচালনা করেন প্রশিক্ষক ফেরদৌসী সুলতানা এবং পুরুষদের ব্যাচ পরিচালনা করেন প্রশিক্ষক সঞ্জয় কুমার রায়। এছাড়াও কার্যক্রমটি সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্যে সহযোগিতা করেন সহকারী প্রশিক্ষকবৃন্দ এবং কোয়ান্টিয়াররা।





১৪ জুন বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম

দুই সহস্রাধিক ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ



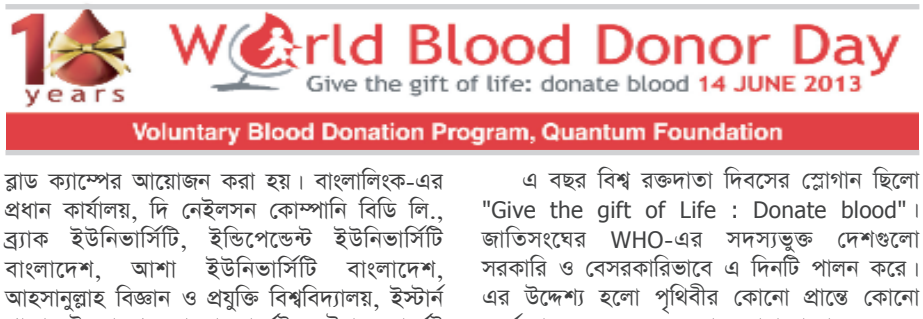
ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে ব্লাড ক্যাম্প পরিদর্শন করছেন এর রেজিস্ট্রার

১৪ জুন বিশ্ব রক্তদাতা দিবস পালিত হওয়ার ১০ম বছর পূর্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বেচ্ছা রক্তদানকে উৎসাহিত করতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মাসব্যাপী বিশেষ ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম। বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত এসব ক্যাম্প থেকে দুই সহস্রাধিক ব্যাগ রক্ত সংগৃহীত হয়।

বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে রক্তদানের চার মাস পূর্ণ হয়েছে এমন রক্তদাতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় কোয়ান্টাম ল্যাবে এসে রক্তদানের জন্যে। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল স্থান, কর্পোরেট অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শপিং মলগুলোতে ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। বাংলালিংক-এর প্রধান কার্যালয়, দি নেইলসন কোম্পানি বিডি লি., ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, আহসানুল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্টার্ন প্লাজা, ইসলামপুর চায়না মার্কেট, মৌচাক মার্কেট ইত্যাদি স্থানে ক্যাম্পে রক্ত সংগ্রহের পাশাপাশি বিশ্ব রক্তদাতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়।



বাংলালিংক কার্যালয়ে ব্লাড ক্যাম্প



এ বছর বিশ্ব রক্তদাতা দিবসের স্লোগান ছিলো "Give the gift of Life : Donate blood"। জাতিসংঘের WHO-এর সদস্যভুক্ত দেশগুলো সরকারি ও বেসরকারিভাবে এ দিনটি পালন করে। এর উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীর কোনো প্রান্তে কোনো মুমূর্ষু মানুষ যেন রক্তের অভাবে মারা না যায়।



আইইউবি-তে আয়োজিত ব্লাড ক্যাম্প

কোয়ান্টাম বুলেটিন : জুলাই ২০১৩ ॥ সম্পাদক : কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 8319377, 8391391 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন

চারপাশের ৪০ ঘর আলোকিত হোক
কোরআনের আলোয়

কোরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর কালাম। নবীজী (স)-এর নিকট দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে ধাপে ধাপে প্রেরিত হয়েছে এ মহাগ্রন্থ। একজন মানুষ কীভাবে তার জীবনকে সফল, প্রাচুর্যময় ও সার্থক করে তুলতে পারে, এর পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা আল্লাহ দিয়েছেন কোরআনের পাতায় পাতায়।

ব্যক্তিগত জীবনই শুধু নয়, বরং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকেও সুন্দর করার উপায় চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে কোরআনে।

কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা আমাদের সবার জন্যেই ফরজ। আর এজন্যে কোরআনের শিক্ষাকে উপলব্ধি করতে হবে মায়ের ভাষায়। এ লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন এবারের রমজানের প্রাক্কালে প্রকাশ করেছে আমপারা ও নির্বাচিত সপ্ত সূরার (মোট ৪৫টি সূরা) বাংলা মর্মবাণী সম্বলিত পুস্তিকা ও অডিও সিডি।

কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা এটি সংগ্রহ করে নিজেরা পড়ছেন, শুনছেন। সেইসাথে রমজানের বিশেষ উপহার হিসেবে কোরআনের আলোকিত জীবনের বাণী পৌঁছে দিচ্ছেন আত্মীয়স্বজন বন্ধু পরিজনসহ পরিচিতজনদের কাছে। পরিচয়ের সূত্র ধরে পৌঁছে দিচ্ছেন পাড়া-প্রতিবেশী ও চারপাশের ৪০ ঘরে।

বাস্তবতার নিরিখে বিচার করলে আমরা দেখি, দেশে কিংবা বিদেশে, সারা পৃথিবী জুড়েই সাধারণ মানুষ বর্তমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থার নানামুখী জটিলতা, পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন সংস্কার, প্রবৃত্তির দাসত্ব আর সমসাময়িক অবিদ্যার নানামুখী শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ক্রমাগত ভুল দৃষ্টিভঙ্গিজনিত জীবনাচারের ফলে অধিকাংশ মানুষই আজ ভুগছে নানারকম অশান্তি, অসুস্থতায়। আর এ থেকে বেরিয়ে আসতে চাই মুক্ত বিশ্বাস ও সুস্থ জীবনদৃষ্টি, যা মানুষকে দিতে পারে এক সুখী প্রশান্তিময় ও আলোকিত জীবনপথের সন্ধান।



আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, আন্তরিকভাবে কোরআন অনুসরণ এবং এর ফলে স্রষ্টা-সচেতন হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে আমরাও লাভ করতে পারি আলোকিত জীবনদৃষ্টি। হয়ে উঠতে পারি সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন ও কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের অধিকারী।

তাই, কোরআনের মর্মবাণী নিজে বার বার পড়া, ধ্যানের স্তরে গভীর মনোযোগে শোনা ও অনুধাবনের পাশাপাশি আপনার আত্মীয় বন্ধু পরিচিতজনসহ চারপাশের ৪০ ঘরে এটি পৌঁছে দিন। ইমেইলে এটাচ করেও পাঠিয়ে দিতে পারেন সম্ভাব্য সবার কাছে।

ঈদ-উপহারের সাথে প্রত্যেককেই একটি করে কোরআনের বাংলা মর্মবাণী পুস্তিকা কিংবা অডিও সিডি উপহার দিন। এর পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের সার্বিক সুস্থতা ও সাফল্যের নিয়তে নিদেনপক্ষে ১০টি পুস্তিকা পরিচিত পরিমণ্ডলে পৌঁছে দেয়ার জন্যে গুরুজী কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের বিশেষভাবে আহ্বান জানিয়েছেন।

কোরআনের আলোকিত জীবনের বাণীতে সমৃদ্ধ হোক আপনার চারপাশের মানুষের অন্তর।

ঈদ মোলাকাতে অংশ নিন সপরিবারে

প্রতিবছরের মতো এবারো ঈদুল ফিতরের দিনে কোয়ান্টাম আয়োজন করছে ঈদ মোলাকাতের। ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তনে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত এটি অনুষ্ঠিত হবে। এদিন পরিবারের সদস্যদের সাথে ঈদের আনন্দে শরিক হতে ও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতে উপস্থিত থাকবেন গুরুজী, মা-জী এবং ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেন্টার/ শাখা/ সেলের মোমেন্টিয়ার, আর্ডেন্টিয়ার, অর্গানিয়ার ও কোয়ান্টিয়াররা।

বছরের আনন্দময় এই দিনে ঈদ মোলাকাতের এ আয়োজনে সবাইকে সবান্ধব ও সপরিবারে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন গুরুজী এবং মা-জী।

৬ সেপ্টেম্বর গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ

৬ সেপ্টেম্বর ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তনে দিনব্যাপী গুরুজীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হবে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ। সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটদের এ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ বিশেষ সহায়ক হবে। দ্রুত আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করুন।

সেপ্টেম্বরে কোয়ান্টাম রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রাম

সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১৯ তম কোয়ান্টাম মেথড রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রাম। আত্ম উন্নয়নের লক্ষ্যে, আলোকিত জীবনের অভিযাত্রায় নিজেকে আরো একধাপ এগিয়ে নেয়ার এ কার্যক্রমে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৩৬০ তম ব্যাচ পর্যন্ত কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটরা আবেদন করতে পারবেন। ২০ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'এ' গ্রুপের এবং ২৭ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে 'বি' গ্রুপের ক্লাস।

এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতির জন্যে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স রিজুভিনেশন, কোয়ান্টামম গ্রাজুয়েট কোয়ান্টায়ন, কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি কার্যক্রম, জীবনে সফল হওয়ার পথ প্রথমায়ন, কোয়ান্টাম ব্যায়াম এবং প্রযোজ্য হলে কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ জরুরি।

সম্ভাবনাকে বিকশিত করে কোয়ান্টাম

এড. আব্দুল মতিন খসরু এমপি



মানুষের জীবন অফুরন্ত সম্ভাবনা আর শক্তির প্রতীক। বিস্ময়কর ক্ষমতাধর এক মস্তিষ্ক রয়েছে আমাদের সবারই। এর পাশাপাশি আমাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে কত মূল্যবান তা উপলব্ধি করেছি এ কোর্সের বিভিন্ন আলোচনায়। ছোটবেলা থেকেই আমি এমন একটা কিছুর সন্ধান করেছি, যার মাধ্যমে মানুষের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করা যায়। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে চারদিনে আমি এরই খোঁজ পেয়েছি।

ব্যক্তিজীবন সাফল্যমণ্ডিত করার পাশাপাশি আমাদের সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবনকেও সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে। এর জন্যে প্রয়োজন প্রশান্ত মন, প্রয়োজন মেডিটেশন। মন নিয়ন্ত্রণ, মনের শক্তিকে কাজে লাগানো, প্রশান্ত মন অর্জন করার জন্যে যে টেকনিক গুরুজী কোর্সে আমাদের শিখিয়েছেন তা ব্যক্তিজীবন, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীতে যত সফল মানুষ ছিলেন তারা সবাই বিশ্বাস করেছিলেন যে, আমি পারবো। কোর্সেও গুরুজী বলেন, হীনম্মন্যতা দূর করে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে, দৃঢ়সংকল্প হতে হবে। দেশের ১৬ কোটি মানুষ যদি আমরা এই মন্ত্র নিজেদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারি, তাহলে পৃথিবীর অন্যতম উন্নত জাতিতে আমরা উন্নীত হতে পারবো।

এ কোর্সের একটি অনন্য বৈশিষ্ট হলো, এর অধিকাংশ সদস্যই তরুণ। তারা অবশ্যই সৌভাগ্যবান। কোর্সের শিক্ষা তারাও সমানভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে। তাদের বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি আর কথাই তা বলে দেয়।

[এড. আব্দুল মতিন খসরু। এমপি, সাবেক আইনমন্ত্রী। ৩৬৪ ব্যাচের প্রত্যয়নে তিনি একথা বলেন]

কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কোর্স

ঢাকা : ৩৬৫ তম ব্যাচ
১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর

ভেন্যু : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি)

পহেলা রমজান উপলক্ষে গত (৯-১১) জুলাই সারাদেশের কেন্দ্রসহ সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলের দায়িত্বশীলদের নিয়ে কোয়ান্টামমে শ্রদ্ধেয় গুরুজীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হলো তিনদিনব্যাপী এক বিশেষ কার্যক্রম। এর দ্বিতীয় দিন বিকেলে কোয়ান্টামমের দরবারানে চার শতাধিক দায়িত্বশীলের সামনে এবারের রমজানে আমাদের করণীয় সম্পর্কে গুরুজী যে বক্তব্য দেন তা এখানে তুলে ধরা হলো।

ঈদ উপহারের অচ্ছেদ্য অংশ হোক
আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী

যা-ই করি, করতে হবে আত্মপর্যালোচনার সাথে

রোজা শুধু পানাহার বর্জনের নাম নয়। নিজের আচরণের নেতিবাচক দিকগুলোও বর্জন করতে হবে একইসাথে। আর সেজন্যে দরকার আত্মপর্যালোচনা। যখনই আপনি ইবাদত করবেন আত্মপর্যালোচনার সাথে, অন্তরে নিমগ্ন হয়ে নামাজ পড়বেন, সারাদিন নিজেকে আত্মপর্যালোচনার মধ্যে রাখবেন, রমজান পালন নিয়ে আপনার চিন্তা করার প্রয়োজন হবে না। এটা আল্লাহ নিজেই ওয়াদা করেছেন যে, এই পুরস্কার আমি নিজে দেবো। আর আমরা প্রত্যাশা করি, আমাদের এই রমজান সেই রকম উপলব্ধিময় হোক।

রমজান এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

রমজান কোরআন নাজিলের মাস। মানুষের কল্যাণে যা কিছু করণীয়, যা কিছু বর্জনীয় তার সমস্ত দিক-নির্দেশনা যে গ্রন্থে আছে তা নাজিল হয়েছে এ মাসে। এই দিক-নির্দেশনাগুলো প্রথমে জানা, তারপরে বোঝা, তারপরে উপলব্ধি করা এবং তারপরে মানা যাতে সহজ হয় সেজন্যে আল্লাহ এই একটা মাস বিশেষভাবে নির্ধারণ করেছেন।

বেশি কাজ, বেশি দান

সাধারণভাবে আমরা মনে করি, রোজার সময় কম কাজ করে বেশি বেশি বিশ্রামে থাকা উচিত। কারণ কাজ করলে ক্ষুধা লাগবে, তৃষ্ণা পাবে, ক্লান্ত হয়ে যাবো ইত্যাদি। কিন্তু সত্য হলো, নবীজী (স) রমজানেই বেশি কাজ করতেন। রমজানে যে আত্মশুদ্ধি এবং আত্মপর্যালোচনার তাগিদ দেয়া হয়েছে তাকে সার্থক করতে এ মাসে কাজ এবং দানের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিতেন। আর রমজানে কাজ করলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা লাগবে–এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল যদি সেই কাজটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করা হয়।

এ রমজানের সেরা কাজ

কোরআনের জ্ঞান নিজে জানা যেমন ফরজ, তেমনি অন্যকে জানানোও একইরকম গুরুত্বপূর্ণ। আল কোরআনের বাংলা মর্মবাণীর এ পুস্তিকা আমাদের এই ফরজ পালনের চমৎকার সুযোগ এনে দিচ্ছে। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে, কোরআনের বাণী আমাদের দেশের মানুষ যে ভাষায় বললে সহজে বুঝবে, আল্লাহ আমাদের তওফিক দিয়েছেন সেই ভাবে তা সংকলন করার। যারাই পড়ছেন তারাই অনুভব করছেন সুপাঠ্য এ মর্মবাণীর আকর্ষণী ক্ষমতাকে। কোথাও হোঁচট খেতে হয় না, যেন অদৃশ্য এক আকর্ষণী ক্ষমতা টেনে নিয়ে যায়। এ শুধুই আল্লাহর রহমত!

এ রমজানের সেরা কাজ তাই এ মর্মবাণীটি নিজে পড়া, অনুধাবন করা এবং অনুসরণের চেষ্টা করা। সেইসাথে তা লাখো হাতে পৌঁছে দেয়া।

সবসময় সাথে রাখুন

আল কোরআনের এ বাংলা মর্মবাণীটি সবসময় আপনার সাথে রাখুন যাতে সুযোগ পেলেই চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন। ট্র্যাফিক জ্যামে বসে আছেন, সময়টাকে কাজে লাগান এতে চোখ বুলিয়ে। গুরুজী বলেছেন, প্রতিদিন যদি একবার পড়া যায় এবং এভাবে ৩০ দিনে ৩০ বার, তাহলে তা খুবই ভালো। কারণ যতবার পড়বেন, ততবার আপনি নতুন নতুন উপলব্ধিতে উদ্ভাসিত হবেন।

সূরা হুজুরাত–এ রমজানে বিশেষভাবে আমল করুন

এবারের রমজানে গুরুজী সূরা হুজুরাতকে বিশেষ আমল হিসেবে গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছেন। বাংলা মর্মবাণীতে আমপারার পাশাপাশি যে সাতটি সূরা আছে, সূরা হুজুরাত তার একটি। পারিবারিক ও সামাজিক শিষ্টাচারের যে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনাগুলো এ সূরায় রয়েছে–তার আলোকে নিজের জীবনাচারে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করতে হবে। গুরুজী বলেন, সূরা হুজুরাত বার বার আমরা পড়বো এবং বোঝার চেষ্টা করবো যে, আমার জীবনাচারের সাথে এর আলোকে কী কী পরিবর্তন আনা দরকার। আমরা বিশ্বাস করি যে, এর মধ্য দিয়ে আমরা সম্পূর্ণ নতুন মানুষে পরিণত হবো।

আমাদের চেষ্টা থাকবে যতজনের কাছে আমরা পারি অর্থাৎ আমাদের যে ১৬ কোটি মানুষের দেশ, আমাদের মনছবি হবে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে পড়তে পারে এমন প্রতিটি মানুষের কাছে এটা পৌঁছে দেয়া। আর সবাই মিলে কাজ করলে সবার কাজের সম্মিলিত সওয়াব আমরা প্রত্যেকে পাবো।

> রমজানে আমাদের প্রোগ্রাম হবে চারপাশের ৪০ ঘরে লাখো লাখো মানুষের কাছে মর্মবাণীটি পৌঁছে দেয়া, যাতে দুই লক্ষ ২৪ হাজার নবী-রসুলের সবার জন্যে আমরা এ সৎকর্ম উৎসর্গ করতে পারি।

ঈদ উপহারের অচ্ছেদ্য অংশ হোক

প্রিয়জনদের আমরা যে ঈদ উপহার দেই, এর একটি অচ্ছেদ্য অংশ হোক এ পুস্তিকাটি। নিজেদের ঈদ খরচের একটা অংশকে আমরা রেখেই দিতে পারি মর্মবাণীর হাদিয়াস্বরূপ। যেমন, ঈদের খরচ যদি হয় ১০০০ টাকা, তাহলে তার এক দশমাংশ, অর্থাৎ ১০০ টাকা দিয়ে যতগুলো মর্মবাণী পাওয়া যায় তা উপহার হিসেবে দিতে পারি। খরচ যদি ১০,০০০ টাকা হয়, তাহলে একইভাবে ১০০০ টাকা বরাদ্দ করতে পারি এ বাবদ। আসলে নিজের আনন্দের অংশ থেকে যখন আপনি দান করবেন সেই দানই হবে উত্তম দান।

চারপাশের ৪০ ঘরে ছড়িয়ে দিন

একই সাথে আল্লাহর এই রহমতকে চারপাশের ৪০ ঘরে আমরা পৌঁছে দিতে চাই। রমজানে আমাদের প্রোগ্রাম হবে চারপাশের ৪০ ঘরে লাখো লাখো মানুষের কাছে মর্মবাণীটি পৌঁছে দেয়া যাতে দুই লক্ষ ২৪ হাজার নবী-রসুলের সবার জন্যে আমরা এ সৎকর্ম উৎসর্গ করতে পারি। তাঁদের জন্যে যখন উৎসর্গ করবো তখন আমাদের সবকিছু আল্লাহই দেখবেন। আল্লাহর যারা প্রিয় বান্দা–নবী-রসুল, মহামানব, তাঁদের জন্যে আমরা যখন উৎসর্গ করছি তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের যারা আত্মীয়স্বজন আছেন তারা এবং আমরাও সে রহমতের স্রোতের মধ্যে চলে আসবো।

কোয়ান্টাম কোর্সের দাওয়াত দিন

সেইসাথে আমরা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের দাওয়াত জোরদার করবো। এ কোর্সে আনার গুরুত্বটা হলো, একজন মানুষ যখন চারদিন একটা ইতিবাচক পরিবেশের মধ্যে থাকে তার জীবনদৃষ্টি ইতিবাচকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কারণ কোর্সের মধ্য দিয়ে একজন মানুষ জানতে পারে কীভাবে আত্মনিমগ্ন হতে হয়, কীভাবে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হয়, কীভাবে সত্য উপলব্ধি করতে হয়। এটিই হচ্ছে কোর্সের গুরুত্ব।

এভাবে এই পুস্তিকা ৪০ ঘরে পৌঁছে দেয়ার মধ্য দিয়ে যে পরিচয়, যে যোগাযোগ হলো এর ধারাবাহিকতায় আমরা তাদেরকে কোর্সে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। সেইসাথে পুরনো গ্রাজুয়েটদের কোর্স রিপিটে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। কারণ একজন যখন রিপিটে আসছেন, চারদিন একটা ইতিবাচক পরিবেশে গুরুর ভাইব্রেশনের মধ্যে থাকছেন। যার ফলে সত্যকে যেভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন, শুধু নিজে নিজে পড়ে নিজে নিজে বুঝে সত্যকে সেভাবে উপলব্ধি করা যাবে না।

রমজানে আত্মশুদ্ধির পথে আরো একধাপ

আত্মশুদ্ধির মাস পবিত্র রমজান। জীবনকে সহজ সুন্দর এবং স্রষ্টার পছন্দনীয় পথে পরিচালনার জন্যে এবছর রমজানে কোয়ান্টামের মূল সুর–এবারের রমজান হোক আল কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধির রমজান। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল্লাহর বাণীসমূহ জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে নিতেই প্রকাশিত হয়েছে 'আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী' আমপারা ও সপ্ত সূরা। পবিত্র এই মাসটিতে আত্মশুদ্ধির পথে আরেক ধাপ এগিয়ে যেতে আমপারা ও সপ্ত সূরা থেকে অনুসরণীয় বিষয়ভিত্তিক কিছু আয়াত এখানে বর্ণিত হলো :

স্রষ্টা-সচেতনতা

প্রতি মুহূর্তে স্রষ্টার উপস্থিতিকে স্মরণে রেখে পথচলাই স্রষ্টা-সচেতনতা। আর নিঃসন্দেহে স্রষ্টা-সচেতন মানুষই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। এ প্রসঙ্গে আল কোরআনে আল্লাহ বলেছেন :

* অপরদিকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে ভেবে যে শঙ্কিত ছিলো এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলো, জান্নাতই হবে তার আবাস।

সূরা নাজিয়াত ॥ আয়াত ৪০-৪১

* (হে নবী!) তুমি শুধু তাদেরই সতর্ক করতে পারবে, যাদের হৃদয় সত্য শুনতে প্রস্তুত এবং না দেখেও যারা করুণাময় আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন। তাদের তুমি ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের সুসংবাদ দাও।

সূরা ইয়া-সীন ॥ আয়াত ১১

* হে মানুষ! তোমাদেরকে আমি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন সমাজ ও জাতিতে ভাগ করেছি, যেন তোমরা পরস্পরের পরিচয় জানতে পারো। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে বেশি আল্লাহ-সচেতন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জানেন, সব বিষয়ে সচেতন। সূরা হুজুরাত ॥ আয়াত ১৩

জবাবদিহিতা

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বার বার বলেছেন, কেউ জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নয়। সত্যিকার সফল সেই ব্যক্তি যার জীবনের প্রতিটি কাজই জবাবদিহিতার নিরন্তর প্রস্তুতি। এই রমজানে এ অনুভূতিকে আমরা আরো জাগ্রত করতে পারি।

* সে কি মনে করে তাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না? সে বলে, আমি প্রচুর অর্থ উড়িয়ে দিয়েছি। সে কি মনে করে কেউ তাকে দেখে নি?

সূরা বালাদ ॥ আয়াত ৫-৭

* ওরা কখনো আশঙ্কা করে নি যে, ওদের কাজের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। ওরা একরোখাভাবে আমার বাণীকে অস্বীকার করেছিলো। ওদের প্রতিটি কাজের পূর্ণ বিবরণ সংরক্ষিত ছিলো। (তখন আমি বলবো) এখন স্বাদ নাও নিজ নিজ কৃতকর্মের। ভোগ কর আজাবের পর আজাব।

সূরা নাবা ॥ আয়াত ২৭-৩০

* জবাবদিহিতার দিন সকল গোপন বিষয়ই প্রকাশ করা হবে এবং তখন মানুষের কিছু করার শক্তি থাকবে না আর সে সাহায্যের জন্যেও কাউকে পাবে না। সূরা তারেক ॥ আয়াত ৯-১০

* নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালকের সামনে জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া একেবারেই নিশিছদ্র।

সূরা বুরুজ ॥ আয়াত ১২

* অবশ্যই ওদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে এবং সকল কাজের হিসাব দিতে হবে আমারই কাছে। সূরা গাশিয়াহ ॥ আয়াত ২৫-২৬

* অথচ মানুষ যখনই নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করতে শুরু করে, তখনই সে সীমালঙ্ঘন করে। কিন্তু মনে রেখো, প্রত্যেককে অবশ্যই তার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে।

সূরা আলাক ॥ আয়াত ৬-৮

দান

রমজানে প্রতিটি সৎকর্মের পুরস্কার কমপক্ষে ৭০ গুণ। পার্থিব জীবনে এবং আখেরাতে তারাই অফুরন্ত নেয়ামতে ধন্য হবে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে অন্যের কল্যাণে দান করে।

* আর যারা আল্লাহ-সচেতন এবং কারো কাছ থেকে প্রতিদানের প্রত্যাশা ছাড়াই শুধু মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি ও আত্মশুদ্ধির জন্যে নিজ সম্পদ থেকে দান করে তারা লাভ করবে অফুরন্ত তৃপ্তি ও সন্তোষ। সূরা লাইল ॥ আয়াত ১৭-২১

* অতএব তুমি এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না। কোনো সাহায্যপ্রার্থীকে তিরস্কার করো না।

সূরা দোহা ॥ আয়াত ৯-১০

* তুমি কি কখনো চিন্তা করেছো, কোন ধরনের লোকেরা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে? এ ধরনের লোকেরা এতিমের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে, অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে কোনো আগ্রহ বোধ করে না বা অন্যকেও উৎসাহিত করে না।

সূরা মাউন ॥ আয়াত ১-৩

গীবত

জীবনের ব্যাপ্তি জুড়ে আমাদের যা কিছু সৎকর্ম তা নষ্ট করে দেয়ার জন্যে গীবত বা অন্যের পরনিন্দা, পরচর্চা করাই যথেষ্ট। অথচ একটুখানি সচেতন হলেই আমরা প্রত্যেকে বিরত থাকতে পারি গীবত থেকে। গীবত বা পরনিন্দা স্রষ্টার নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়। এ প্রসঙ্গে সতর্ক করার লক্ষ্যে কোরআনের কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

* হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সাধারণভাবে অন্যের ব্যাপারে আন্দাজ-অনুমান করা থেকে বিরত থাকো। আন্দাজ-অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে গোনাহের কাজ। অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করো না। কারো অনুপস্থিতিতে গীবত অর্থাৎ পরনিন্দা করো না। তোমরা কি মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে চাও? না, তোমরা তো তা ঘৃণা কর (গীবত করা মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সমান)। তোমরা সবসময় আল্লাহ-সচেতন থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরমদয়ালু।

সূরা হুজুরাত ॥ আয়াত ১২

* দুর্ভোগ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে সামনাসামনি দুর্ব্যবহার করে এবং পেছনে নিন্দা করে। সূরা হুমাজাহ ॥ আয়াত ১

শিষ্টাচার

শিষ্টাচার একজন মানুষকে যেমন ব্যতিক্রমী এবং সফল করে পার্থিব জীবনে তেমনি পছন্দনীয় করে স্রষ্টার কাছেও। শিষ্টাচারের গুরুত্ব প্রসঙ্গে কোরআনের কিছু আয়াত তুলে ধরা হলো :

* কখনো অহংকারবশত মানুষকে অবজ্ঞা করো না, মাটিতে গর্বিতভাবে পা ফেলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীকে অপছন্দ করেন।

সূরা লোকমান ॥ আয়াত ১৮

* হে বিশ্বাসীগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস বা বিদ্রুপ না করে, কারণ উপহাসকারীর চেয়ে সে ভালো হতে পারে এবং কোনো নারী যেন অপর কোনো নারীকে বিদ্রুপ না করে। কারণ উপহাসকারিণীর চেয়ে সে ভালো হতে পারে। (সাবধান!) তোমরা একে অপরের বদনাম করো না। মন্দনামে ডেকো না। মন্দনামে ডেকে একে অন্যকে অপমান করো না। বিশ্বাস স্থাপন করার পর মন্দনামে ডাকা অতিগর্হিত কাজ। (এ ধরনের গর্হিত কাজ করার পর) যদি তওবা না করে, তবে তারা নিঃসন্দেহে সীমালঙ্ঘনকারী জালেম। সূরা হুজুরাত ॥ আয়াত ১১

সুবচন

একজন সুভাষী মানুষের উপস্থিতিই অন্যদের মাঝে সঞ্চার করে প্রশান্তি আর নিরাপত্তা। আর এই সুন্দর কথা, ভালো কথা আল্লাহ তাআলার কাছেও অত্যন্ত প্রিয়। এ প্রসঙ্গে কোরআনের কিছু আয়াত তুলে ধরা হলো :

* (হে আমার সন্তান!) চালচলনে সুশীল হও। মোলায়েম কণ্ঠে কথা বলো। (কখনো কণ্ঠস্বরকে গাধার মতো কর্কশ করো না) নিশ্চয়ই গাধার কণ্ঠস্বর সবচেয়ে কর্কশ।

সূরা লোকমান ॥ আয়াত ১৯

* নিঃসন্দেহে আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে দিনটি হবে সর্বোচ্চ পরিতৃপ্তির। তাদের জন্যে অপেক্ষা করবে আঙুর ও ফুলফল শোভিত বাগান, উচ্ছ্বসিত সুখের পানপাত্র আর সুযোগ্য সমুজ্জ্বল সাথিরা। সেখানে তারা শুনবে না কোনো অসার বাক্য বা মিথ্যা কথা।

সূরা নাবা ॥ আয়াত ৩১-৩৫

* এসবই তাদের সৎকর্মের পুরস্কার। সেখানে তারা কোনো বাজে বা পাপকথা শুনবে না। শুধু ধ্বনিত অনুরণিত হবে শান্তি! শান্তি!!

সূরা ওয়াকিয়া ॥ আয়াত ২৪-২৬

‘আয়াতগুলো যেন কথা বলতে শুরু করলো’

২৮ জুন ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় গুরুজীর পরিচালনায় ‘রমজানে থাকুন আল কোরআনের ছায়ায়’ শীর্ষক দিনব্যাপী প্রো-মাস্টার্স ওয়ার্কশপ। এ ওয়ার্কশপে ফাউন্ডেশন প্রকাশ করে ‘আল কোরআন ॥ বাংলা মর্মবাণী’ (আমপারা ও সপ্ত সূরা) পুস্তিকা ও সিডি। এ পুস্তিকার হৃদয়গ্রাহী ভূমিকা, সহজ, সুপাঠ্য ভাষা, বৈচিত্রময় শব্দচয়ন আর দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ সবকিছু মিলিয়ে মুহূর্তেই দারুণ সাড়া জাগায় পরিবারের সদস্যদের মাঝে। ওয়ার্কশপসহ রমজানের প্রথম সপ্তাহেই এর প্রায় ৮০ হাজার কপি পুস্তিকা সংগ্রহ করেন পরিবারের সদস্যরা। এছাড়াও প্রায় ২১ হাজার সিডি সংগ্রহের পাশাপাশি তারা কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে, মোবাইলে মেমোরি কার্ডে, ই-মেইলে এটাচসহ বিভিন্নভাবে আল কোরআনের মর্মবাণী পৌঁছে দিয়েছেন লাখো মানুষের কাছে।

গুরুজীর কণ্ঠে ধারণকৃত ‘আমপারা ও সপ্ত সূরা’-র এ সিডির অনুরণনে অনুরণিত হয় প্রো-মাস্টার্স ওয়ার্কশপে আগতদের হৃদয়মন। ওয়ার্কশপে পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী শুনে ও পরবর্তীতে অনুশীলন করে পরিবারের সদস্যরা ব্যক্ত করেন তাদের উপলব্ধি ও অনুভূতির কথা। তাদের কয়েকজনের অনুভূতি এখানে তুলে ধরা হলো।



ডা. এম এ জলিল

মেডি এইড হসপিটালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল এর প্রতিষ্ঠাতা ডা. এম এ জলিল বলেন, আমি ওয়ার্কশপ থেকে আল কোরআন-এর মর্মবাণী সংগ্রহ করেছি, পড়েছি, পরিচিতদেরও বিতরণ করেছি। তাদের সবার মতে, এটি প্রকৃত অর্থেই মর্মার্থ। আমারও খুব ভালো লেগেছে। কারণ সহজ ভাষায় এত গভীর অর্থের প্রকাশ শুধু অনুবাদ পড়ে বোঝা সম্ভব না। ব্যাখ্যা পড়ে আমাকে যা বুঝতে হতো, তার মূল ভাবটুকু এই পুস্তিকা পড়ে বুঝতে পারছি।

আমি রোজ রাতে আয়াতুল কুরসি পড়ে ঘুমাতে যেতাম। এখন মায়ের ভাষায় এটি পড়তে পারায় খুব তৃপ্তি পাচ্ছি, ছেলে-মেয়েদেরকেও সহজ ভাষায় কোরআন সম্পর্কে জানাতে পারছি।



নিগার ফারজানা

গৃহিণী নিগার ফারজানা বলেন, আমাদের জন্যে গুরুজীর পক্ষ থেকে এটি একটি চমৎকার উপহার। শুকরিয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্যে আমার কাছে এটি অত্যাবশ্যকীয় মনে হয়েছে। পুস্তিকাটি আমি সবসময় সাথে রাখতে পারবো–এটা ভাবতেই ভালো লাগছে। যেকোনো জায়গায়, গাড়িতে বা যখন যেখানে ইচ্ছে বা যেকোনো সময় আমি কোরআনের বাণী পড়তে পারবো। সামনে রমজান মাসে বেশি বেশি কোরআন অনুসরণেও এটি আমাদের জন্যে বিশেষ সহায়ক হবে।



মোহাম্মদ আব্দুর রহমান

হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ-এ বিএ অনার্স পড়ছেন মোহাম্মদ আব্দুর রহমান। তিনি আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী পড়ে অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, এর ভাষা অত্যন্ত সহজসরল। শব্দগুলো আধুনিক ও স্মার্ট। পড়ার সময় এটিকে খুব আপন মনে হয়। প্রতিটি আয়াতের নম্বর সামনে থাকার কারণে খুঁজে পেতেও সুবিধা হয়। কোরআনের মর্মবাণী সমৃদ্ধ এ পুস্তিকা গভীর মর্মার্থ প্রকাশ করার পাশাপাশি আকারে ছোট হওয়ায় অল্প সময়ে অনেকটুকু পড়া যায়।



ডা. শাহ্‌পারী শিমরান খান

হারুন আই ফাউন্ডেশনে কর্মরত ডা. শাহ্‌পারী শিমরান খান বলেন, কোরআনের অনুবাদ আমি ছোটবেলা থেকেই পড়ছি। তাই বেশ কিছু আয়াত আমার পরিচিত মনে হয়েছে।

গুরুজীর সংকলিত সূরা ওয়াকিয়া-র অর্থ আমার কাছে বেশ নতুন মনে হয়েছে এবং চমৎকার লেগেছে। সামগ্রিকভাবে পুস্তিকার ভূমিকা আর গুরুজীর কণ্ঠে পাঠ খুব ভালো লেগেছে। কোরআনে অনেক সূরায় সৎকর্ম এবং পরকালের কথা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমার ধারণা, এগুলো আমরা অনেকেই শুনেছি জেনেছি কিন্তু মনে রাখতে পারি না। তাই সহজভাষায় এর চর্চা আমাদের সচেতন হতে সাহায্য করবে।



জুবাইদা আখতার চন্দন

কুষ্টিয়ায় বসবাসরত গৃহিণী জুবাইদা আখতার চন্দন বলেন, পবিত্র কোরআনের অর্থ আগেও পড়েছি অনেকবার, শুনেছি, বুঝেছিও। এবারের অভিজ্ঞতা অন্যরকম। শ্রদ্ধেয় গুরুজীর ভাষায় যেকোনো কিছুই অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী হয়। এবারো তার ব্যতিক্রম হয় নি। কোরআনের মর্মবাণী অনেক বেশি হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। বার বার পড়তে ভালো লাগছে। এর আরেকটা কারণ এটি অনেক বেশি সহজবোধ্য। কথাগুলো মন ও মস্তিষ্কে গেঁথে যাচ্ছে, অনুরণিত হচ্ছে।

ভূমিকায় গুরুজী যেমন বলেছেন, ‘আয়াতগুলো যেন কথা বলতে শুরু করলো’। মর্মবাণী পড়তে গেলে অনুভূতিটা ঠিক সেরকমই হয়। স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা–এটি শুধু পড়া নয়, এর থেকে অর্জিত শিক্ষাগুলো যেন জীবনে কাজে লাগাতে পারি।

এডভোকেট প্রিয়লাল সাহা বলেন, ওয়ার্কশপে যখন মেডিটেটিভ লেভেলে গুরুজীর কণ্ঠে মর্মার্থ শুনছিলাম, তখন পুরো সময়টা আমি আর আমাতে ছিলাম না, অন্য এক জগতে হারিয়ে গিয়েছিলাম। ধ্যানমগ্ন হয়ে শুধু শুনে যাচ্ছিলাম। আমি সত্যিই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।



এডভোকেট প্রিয়লাল সাহা

যখন শুনছিলাম ‘তোমরা আমার কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?’ ভাবছিলাম, সত্যিই তো! স্রষ্টার কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবো আমরা? সবই তো তাঁর। তাঁর অনুগ্রহ ভোগ করে তাঁকেই বিস্মৃত হয়ে থাকি! আর কোনোদিন আমার ভেতরটা এভাবে নড়ে ওঠে নি।

বেশ কয়েক বছর আগে আমি নিজের চেতনা বোধ থেকেই একটা বাংলা তরজমাসহ কোরআন শরিফ কিনেছিলাম। পুরো তরজমাটা পড়ে মনে হয়েছিলো, এদেশে তো অনেক মানুষই কোরআন পড়েন, শুধু মর্মার্থ উপলব্ধি না করার কারণে বা করতে না পারার কারণে আচার-আচরণে আমাদের পরিবর্তন আসে নি। তাই আমার অভিমত, কোরআন পড়তে আগ্রহী করে তোলা, মর্মবাণী উপলব্ধি করে সে অনুযায়ী জীবনাচারে অভ্যস্ত হতে গুরুজীর এই প্রচেষ্টা সবাইকে যারপরনাই সহায়তা করবে।



আনন দাস বৃষ্টি

মিলিটারি ইনস্টিটিউশন অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি-র সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শিক্ষার্থী আনন দাস বৃষ্টি বলেন, ওয়ার্কশপে প্রথম যখন এর অডিও ফাইল শুনি তখন আমার কাছে এটি খুব সহজ মনে হয় এবং সব ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থের সাথে এর বাণীর সাযুজ্য খুঁজে পাই। গীতা পড়ার সময়ও বিভিন্ন শব্দের সাথে এর মিল আমাকে বিস্মিত করে। এই পবিত্র গ্রন্থে যে শব্দমালা ব্যবহার করা হয়েছে তা খুব স্বাচ্ছন্দ্যে পড়া যায়। এর অনুশীলনে সত্যিকার অর্থেই আমরা জীবনের সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারি।

এই পুস্তিকাটি বিতরণের অনুভূতি অসাধারণ। যাদেরকেই আমি এই বইটি দেখিয়েছি তারা সবাই আনন্দসহকারে অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে এটি গ্রহণ করেছেন। একদিন খুব অল্প সময়ে আমি ১০টি পুস্তিকা বিতরণ করেছি। আমার বন্ধুরা আমার কাছে এসে এটি সংগ্রহ করে নিয়ে যায়, এমনকি আমাকে কোনো ব্যাখ্যাও দিতে হয় না। চারপাশের মানুষ এ থেকে দারুণ উপকৃত হচ্ছে। আমরা যদি নিয়মিত এর অনুশীলন করি তাহলে নিজেদের পাশাপাশি চারপাশের মানুষকেও আলোকিত করতে পারবো।



এডভোকেট যাহেদ হোসেন

একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কমকর্তা এডভোকেট যাহেদ হোসেন বলেন, আমপারা ও সপ্ত সূরা-র সমন্বয়ে প্রকাশিত 'আল কোরআন ॥ বাংলা মর্মবাণী' পুস্তিকাটি ভাষায় সাবলীলতায় গুণগতমানে স্বাতন্ত্র্যে সহজসরল প্রাঞ্জলতায়– অসাধারণ অনন্য এক প্রকাশনা। রমজান মাসের শুরুতে এ অমূল্য রতন সদৃশ পুস্তিকাটি সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেয়ার উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। এই পুস্তিকার কিয়দংশও যদি নিজের জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে পারি তাহলে আমরা নিজেকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে পরিণত করতে সক্ষম হবো।



রোকসানা আকতার রূপী

ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক রোকসানা আকতার রূপী বলেন, ভূমিকায় গুরুজী বলেছেন, আয়াতগুলো কথা বলে। আমার ভেতরেও সেরকমটাই অনুভূত হয়েছে।

আরেকটি বিষয় আমাকে খুব বেশি নাড়া দিয়েছে, তা হলো এর সুন্দর, সাবলীল পরিচ্ছন্ন শব্দচয়ন। পবিত্র কোরআনের বঙ্গানুবাদের কিছু সাধারণ শব্দের এত চমৎকার ও যথার্থ প্রতিশব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে যা আসলেই মুগ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো। নিঃসন্দেহে এটি অনেক বড় একটি কাজ আর প্রশংসার দাবীদার।



এ এইচ এম মাছুম

বিটিভির নিউজ প্রোডিউসার হিসেবে দায়িত্বরত এ এইচ এম মাছুম বিল্লাহ বলেন, প্রো-মাস্টার্স ওয়ার্কশপে শোনা আল কোরআনের মর্মবাণীর কথাগুলো ছিলো খুব প্রাঞ্জল। আয়াতগুলো সহজেই অনুভূতিতে স্থান করে নিচ্ছিলো। এখন নিয়মিত কোরআনের মর্মবাণী সমৃদ্ধ পুস্তিকা পড়া ও শোনার আগ্রহ পাচ্ছি।

আমরা অনেক সময় পার্থিব সাফল্যের জন্যে ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ি। ব্যস্ততার চাপে পরকালের সাফল্যের উপকরণ সংগ্রহের কথা বেমালুম ভুলে যাই। অথচ পার্থিব সাফল্যের চেয়ে পরকালের সাফল্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কোরআনের এ মর্মবাণী নিসন্দেহে আমাদের পরকালের সাফল্য অর্জনের দিক-নির্দেশনা দেবে।

মার্কেন্টাইল ব্যাংক-এর সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার সুবীর কুমার চৌধুরী বলেন, বর্তমানে সারাবিশ্বে বিরাজমান অস্থিরতার মূল কারণ আমরা ধর্মের মূলশিক্ষার অনুশীলন করি না। আবার পড়ি কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করে না। এমন একটি সময়ে গুরুজীর কোরআনের মর্মবাণী নিয়ে এই প্রকাশনা আমাদের হৃদয়কে প্রশান্তির ছায়ায় আবৃত করে রাখবে।



সুবীর কুমার চৌধুরী

এর নিয়মিত অনুশীলন আমাদের সঠিক পথের নির্দেশনা দেবে, পাশাপাশি যে মহামানবিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি সে লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এটি অনুশীলন করার চেষ্টা করছি। আমার মতে, ফাউন্ডেশন থেকে আমাদের যত প্রাপ্তি এটি তার অন্যতম। এজন্যে গুরুজীর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।



সেলিম সাজ্জাদ

মিরপুর বিশ্ববিদ্যায় কলেজ-এর বাংলা বিভাগের প্রভাষক সেলিম সাজ্জাদ বলেন, আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী পুস্তিকাটি হাতে নিয়েই চমৎকার অনুরণন অনুভব করেছি। প্রচ্ছদের নীল আলোর বিচ্ছুরণের দিকে তাকালেই অন্তর প্রশান্তিতে ভরে ওঠে।

প্রথম যখন পড়া শুরু করেছি, মনে হলো যেন মহাচেতনার সাথে সংযুক্ত হয়ে গেলাম। প্রেমময় আল্লাহ্‌কে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে অনুভব করতে পারলাম। এর সহজ-সাবলীল, ধ্বনিমাধুর্যময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষা ব্যবহার আমাকে অভিভূত করেছে। পড়া শেষে মনে হলো গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থা থেকে একটি পরিশুদ্ধ চিত্ত নিয়ে জাগ্রত হলাম, সেইসাথে করুণাময়ের করুণাধারায় সিক্ত হয়েছি যেমন, তেমনি শ্রদ্ধেয় গুরুজীকেও আরো অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করতে পেরেছি।

পুস্তিকাটি এখন আমার নিত্যসঙ্গী। যতবারই হাতে নিচ্ছি, চোখ বুলানো মাত্রই চমৎকার অনুভূতি পাচ্ছি। কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করছি হৃদয়ের গভীর থেকে। শুধু অনুধাবন নয়, আন্তরিকভাবে অনুসরণের মাধ্যমে আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগের বদলে যাওয়া মানুষের মতোই আমরাও হয়ে উঠবো ভবিষ্যৎ আলোকোজ্জ্বল সভ্যতার নির্মাতা।



চাঁপা দেবী

চট্টগ্রামে বসবাসরত চাঁপা দেবী ইউসেপ বাংলাদেশ-এ শিক্ষকতা পেশায় আছেন। প্রো-মাস্টার্স ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে 'আল কোরআন ॥ বাংলা মর্মবাণী' প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমার মতে সব ধর্মের উৎস এক। তাই গুরুজী ওয়ার্কশপে যখন এসাইনমেন্ট জমা দিতে বলছিলেন, আমি পুস্তিকাটি পড়ে নির্দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ করণীয়গুলো জমা দিয়েছি। আমি চারপাশের পরিচিতদের মাঝেও এটি বিতরণের জন্যে মনস্থির করেছি। আমার মনে হয়েছে, রমজানে যেহেতু সবাই কোরআন বেশি বেশি চর্চা করে তাই এটিই উপযুক্ত সময় মানুষের কাছে চমৎকার এই প্রকাশনা পৌঁছে দেয়ার।



তামান্না ইয়াসমীন খান

শক্তি ফাউন্ডেশন-এর এইচআর ডিপার্টমেন্টের জেনারেল ম্যানেজার তামান্না ইয়াসমীন খান বলেন, আমি গুরুজীর কণ্ঠে কোরআন-এর মর্মবাণী (আমপারা ও সপ্ত সূরা) শুনেছি। এর আগেও বাংলায় কোরআনের অনুবাদ পড়েছি এবং এখনো পড়ছি। কিন্তু গুরুজীর সুললিত কণ্ঠের উচ্চারণ ধ্যানের গভীরে গিয়ে শোনা আসলেই অভূতপূর্ব এবং আমার মন ভরে গেছে। যখন শুনছিলাম, কেন যেন নিজের অজান্তেই চোখে পানি চলে এসেছিলো। সে এক অসাধারণ অনুভূতি।

কোরআন-এর মর্মবাণী (আমপারা ও সপ্ত সূরা) সিডি এবং বই প্রকাশের জন্যে শ্রদ্ধেয় গুরুজীকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আল্লাহর কাছে গভীর শুকরিয়া। এই বইটি খুব সহজেই বহনযোগ্য, তাই আমি ব্যাগে রাখছি এবং প্রতিদিন অফিস যাত্রাপথে পড়ছি। এভাবে কোরআনের অন্যান্য সূরাগুলো যদি ছোট ছোট খণ্ডে পাওয়া যায়, তাহলে আরো উপকৃত হবো।



মো. সামসুল আলম

ব্যবসায়ী মো. সামসুল আলম বলেন, ২৮ জুন প্রো-মাস্টার্স ওয়ার্কশপে কোরআনের বাংলা মর্মবাণী শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি। কারণ আগেও কোরআনের বাংলা অনুবাদ পড়েছি। কিন্তু আমপারা ও অন্য সাতটি সূরার বাংলা মর্মবাণী পড়ে মনে হয়েছে, বাংলা ভাষায় কোরআনের মর্মার্থ নিয়ে এই পুস্তিকা পড়ে আর সিডি শুনে মানুষ তৃপ্তি পাবে, যেমন আমি পেয়েছি। আমার বিশ্বাস এ প্রকাশনার মাধ্যমে সকল স্তরের মানুষের কোরআন পড়া ও বোঝার ভীতি দূর হবে।



আবিদা সুলতানা

বগুড়া থেকে ওয়ার্কশপে অংশ নেয়া গৃহিণী আবিদা সুলতানা বলেন, আগে কোরআন পড়তাম ভয়মিশ্রিত ভালবাসা নিয়ে। কোরআনের মর্মবাণী জানার জন্যে অনেক তাফসির পড়তে হতো। তাফসির এবং অনুবাদ সব মিলিয়ে অনেক জায়গায় সংশয় তৈরি হতো। এখন বাংলা কোরআনের মর্মবাণী হাতে পাওয়ায় কোরআন জানা সহজ হয়েছে সেইসাথে বেড়েছে স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা।

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : কোরআন ধ্যানের স্তরে বা কোয়ান্টায়নে শ্রবণের বিশেষত্ব কী?

উত্তর : কোরআনের প্রতিটি আয়াত নাজিল হয়েছে একটি বিশেষ স্তরে। সাধারণ জাগ্রত অবস্থায় কখনো কোরআন নাজিল হয় নি। কোরআন নাজিলের সময় যখন হতো তখন রসুলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে ধ্যানের একটা স্তর সৃষ্টি হতো। এজন্যে কোরআনকে যদি অনুশীলন করতে হয়, বুঝতে হয়–তাহলে ধ্যানের স্তরে শুনতে ও বুঝতে হবে।

এ বিশুদ্ধ মৌনতার স্তরে যদি পৌঁছতে না পারেন, আপনি কখনো কোরআনকে বুঝতে পারবেন না উপলব্ধি করতে পারবেন না এবং কোরআনের জ্ঞান–যা আপনার জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারতো তা কখনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। কারণ, শুধু কিছু কথা, কিছু বাণী মস্তিষ্কে প্রবেশ করলেই পরিবর্তন আসে না যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ে প্রবেশ না করে। ধ্যানের যে স্তরে নবীজী (স) সুদীর্ঘ ১৫ বছর প্রত্যেক রমজান মাসে হেরা গুহায় কাটিয়েছেন, কোয়ান্টায়ন হচ্ছে ধ্যানের সেই স্তর। অর্থাৎ কোয়ান্টায়ন হচ্ছে গভীর মনোযোগ এবং মৌনতা। আসলে কথা না বলে শুধু চুপ থাকাটাই কোয়ান্টায়ন নয়, সত্যিকারের কোয়ান্টায়ন হলো মনোযোগ এবং মৌনতা।

এছাড়া আপনি যখন কোরআন আরবীতে পড়ছেন বা শুনছেন তখন সওয়াব অবশ্যই হচ্ছে। কিন্তু যিনি আরবী জানেন না তার পক্ষে এর মাধ্যমে আল্লাহ কী বলছেন তা বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ কোরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্যই হলো, আল্লাহ মানুষকে সেই জিনিস শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যা মানুষ জানতো না।'

অর্থাৎ কোরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করা, জীবনের সঠিক পথ-নির্দেশনা প্রদান করা যাতে মানুষ জানতে পারে তার মুক্তি কোন পথে, পরিত্রাণ কোন পথে। শুধু তা-ই নয়, আধুনিক আরবী জানা মানুষের পক্ষেও কোরআন বোঝা সম্ভব নয়, কারণ কোরআনের ভাষা আরবী হলেও তা আধুনিক আরবী থেকে ভিন্ন। আবার আরবী জানলেই হবে না, এর বাণী বুঝতে হবে এবং আপনার হৃদয়ে অনুরণন সৃষ্টি করতে হবে।

কোরআন বুঝতে হবে এবং শুধু বোঝা নয় বিশ্বাস করতে হবে, হৃদয়ে অনুরণন সৃষ্টি করতে হবে তাহলেই আপনি মানতে পারবেন। তাই কোরআনের মর্মবাণী যদি আমরা মাতৃভাষায় ধ্যানের স্তরে না শুনি তাহলে আমরা কোরআনকে জানতে পারবো না আর জানতে না পারলে সঠিকভাবে মানতেও পারবো না।

প্রশ্ন : কোরআনকে নিরাময়ের উৎস বলা হয়েছে। কীভাবে আমরা কোরআনের সাহায্যে নিরাময় পেতে পারি?

উত্তর : সূরা বনী ইসরাইলের ৮২নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, যারা কোরআন পাঠ ও কোরআনের আলোচনায় সমবেত হবেন তাদের ওপর আল্লাহর রহমত, শান্তি ও ক্ষমা বর্ষিত হবে। আল্লাহর এ উদ্ধৃতির সত্যতা প্রমাণিত হয় আধুনিক গবেষণার প্রেক্ষিতে। আমেরিকায় একদল স্বেচ্ছাসেবীকে কোরআন তেলাওয়াত শোনানোর পর দেখা যায়, এদের ৯৭% এর মধ্যেই এক প্রশান্তির অনুরণন সৃষ্টি হয়েছে। ইইজি পরীক্ষায় দেখা গেল, কোরআন শুনতে শুনতেই তাদের ব্রেন ওয়েভ প্রতি সেকেন্ডে দ্রুতগতির ১২-১৩ ওয়েভ থেকে নেমে ধীরগতির ৮-৩ ওয়েভে অবস্থান করছে যা গভীর প্রশান্ত অবস্থাকে বোঝায়। উল্লেখ্য, এদের অনেকেই আরবী ভাষা বোঝেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোরআন শ্রবণ তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে এক পরিতৃপ্ত গভীর প্রশান্তি।

আর একথা সর্বজনবিদিত যে, টেনশন এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাই দেহের ৭৫% রোগসৃষ্টির কারণ। স্নায়বিক উত্তেজনা এবং মানসিক ভারসাম্যহীনতাই দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। কোরআন শ্রবণের মাধ্যমে যার উল্টো প্রভাব সৃষ্টি হয় দেহে। আর এখানেই কোরআনের নিরাময় রহস্য। এজন্যেই নবীজী (স) বলেছেন, যারা মসজিদে সমবেত হয়ে কোরআন পাঠ এবং আলোচনায় অংশ নেয় তাদের ওপর শান্তি ও ক্ষমা বর্ষিত হবে, তাদেরকে ঘিরে থাকবে ফেরেশতাগণ এবং আল্লাহ বলবেন, তারা তো তাঁর পাশেই আছে।

ড. আহমেদ আল কাজি আমেরিকায় একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। আরবী বলতে পারেন না বা বোঝেন না এমন কয়েকজন আমেরিকান স্বেচ্ছাসেবীকে তিনি তিনটি গ্রুপে ভাগ করেন। প্রথম গ্রুপকে কোরআন তেলাওয়াত শোনানো হলো। দ্বিতীয় গ্রুপকে দৈনন্দিন আরবী ভাষার কিছু বাক্য পড়ে শোনানো হলো এবং তৃতীয় গ্রুপকে কোনোকিছু না শুনিয়ে শুধু একটি নিরিবিলি জায়গায় রিল্যাক্স করতে বলা হলো। এরপর ড. কাজি তিন গ্রুপের সদস্যদেরই ব্লাড প্রেশার, ইইজি, হার্ট রেট, পেশির সংকোচন-প্রসারণ এবং ঘেমে যাওয়ার প্রবণতা পরীক্ষা করেন। তিনি দেখেন, বাকি দুই গ্রুপের তুলনায় প্রথম গ্রুপের অর্থাৎ যাদের কোরআন তেলাওয়াত শোনানো হয়েছিলো তাদের মধ্যে প্রশান্তির প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি।

আর কোয়ান্টায়নে কোরআনে যখন আপনি ধ্যানের স্তরে আত্মনিমগ্ন থাকেন, যখন আপনি নিমগ্ন হয়ে কোরআনের এই তেলাওয়াত শোনেন এর সুর, ছন্দ সবকিছুই একটা শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে, ধ্বনির অনুরণন সৃষ্টি করে। আল্ট্রাসাউন্ড ওয়েভ সৃষ্টি করে। এই ধ্বনির অনুরণন আপনার নিরাময় প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। শারীরিক-মানসিকভাবে নিরাময় এবং প্রশান্তি সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন : কোরআনের বেশ কয়েক জায়গায় আছে 'আল্লাহ না চাইলে কেউ হেদায়েত পায় না' বা 'আল্লাহ তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন'। তাহলে হেদায়েত পাওয়ার উপায় কী বা কীভাবে তা পাওয়া যাবে?

উত্তর : কোরআনে উল্লিখিত এই 'মোহর মারা' নিয়ে আমাদের অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। যেমন আমরা মনে করি, আল্লাহ যদি মোহর মেরে থাকেন, তাহলে তার দোষটা কী? সে তো হেদায়াত পায় নি, ভুল বা অন্যায় করবেই। আসলে এখানে মোহর মারা বলতে প্রকৃতির একটা সাধারণ এবং সার্বিক নিয়ম বা সিস্টেমকেই বোঝানো হয়েছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর কোনো আলাদা হুকুমকে নয়। যেমন, বলা হয়, আল্লাহর হুকুম ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না। আল্লাহ কিন্তু প্রত্যেকবারই প্রত্যেক গাছের পাতা নড়ার হুকুম দেন না। তিনি একটি সিস্টেম করে দিয়েছেন, যে সিস্টেমে গাছের পাতা নড়ে। এর অর্থই হলো–আল্লাহর হুকুম ছাড়া পাতা নড়ে না।

আধুনিক নিউরোসায়েন্স-এর গবেষণার আলোকে এ বিষয়টিকে আমরা বুঝতে পারি। বিজ্ঞানীরা এখন দেখছেন–চিন্তা বা অনুশীলনের স্টিমুলেন্ট প্রেরণের মাধ্যমে মস্তিষ্কের কর্মকাঠামো বদলে ফেলা সম্ভব। অর্থাৎ যখন একজন মানুষ কোনো চিন্তা মাথার মধ্যে ঢোকায় এবং ক্রমাগত এই চিন্তাটাকে তার অভ্যাসে রূপান্তরিত করে তখন মস্তিষ্কের কর্মকাঠামো বদলের মাধ্যমে তার আচরণ এবং কাজও বদলে যায়।

মাদকাসক্তদের ক্ষেত্রে ঠিক এ বিষয়টিই হয়। ক্রমাগত মাদক বা ড্রাগ নিতে নিতে তার মস্তিষ্কের কর্মকাঠামোতে যে পরিবর্তন হয় তার ফলেই মাদকের ওপর তার শারীরিক ও মানসিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয় এবং অনেকসময় না চাইলেও তাকে সেটি নিতে বাধ্য হতে হয়। এটা ধূমপানের ক্ষেত্রেও হতে পারে।

যেকোনো আচরণ-অভ্যাসের ক্ষেত্রেও এটি হতে পারে। যেমন, যে ঘুষ খায় প্রথমে কিন্তু সে লুকিয়ে টাকা নেয়। তারপর আর লুকোচুরি থাকে না। অবৈধ উপার্জনের নেশা তাকে পেয়ে বসে। অর্থাৎ একজন মানুষ যখন অন্যায় করতে থাকে, তখন সে যে অন্যায় করছে এ বোধটাই তার নষ্ট হয়ে যায়। এটিই হলো মোহর যে, এটি ছাড়া আর কোনো চিন্তাই তার মাথায় আসে না।

যখন কোনো ভুল আচরণ বা অভ্যাস কারো স্বভাব বা ফিতরাতের অংশ হয়ে যায় যে, সে সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। যাদের মন আবদ্ধ হয়ে গেছে, মন যাদের কোনো খারাপ চিন্তা বা বদ চিন্তার দাস হয়ে গেছে। তখনই বলা হয় মনে মোহর লেগেছে। অর্থাৎ মুক্তমনের অভাবই হচ্ছে মোহর। আর এ অবস্থাটা হেদায়েত পাওয়ার একটা প্রধান প্রতিবন্ধকতা। কারণ হেদায়েতের জন্যে প্রয়োজন মুক্তমন। দরকার প্রস্তুতি। শুধু কোরআন নয়, যেকোনো শিক্ষার জন্যেই প্রথম প্রয়োজন মুক্তমনে গ্রহণ করা এবং সেটা শিক্ষার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। তখনই একজন মানুষ সেটা শিখতে পারে।

আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মুক্তমনের অভাব। যখন কেউ মুক্তমন সৃষ্টি করতে পারবে তখনই আল্লাহ তাকে হেদায়েত দেবেন। অর্থাৎ সত্য বা মিথ্যার পার্থক্য করার জন্যে মনটাকে যখন সে মুক্ত করবে–প্রচলিত বিশ্বাস থেকে বের হওয়ার জন্যে অর্থাৎ পরিবার থেকে শুরু করে চারপাশের পরিবেশ থেকে সে যে দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে গ্রহণ করেছে, সেই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো ঠিক কি না এটাকে বিচার করার মতো মুক্তমন যতক্ষণ না সৃষ্টি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার হেদায়েত আসবে না।

আর আল্লাহ তাকেই হেদায়েত দান করেন, যে হেদায়েত চায়। ভালোটা গ্রহণ আর মন্দটা বর্জন করার মানসিক প্রস্তুতি যার রয়েছে। অর্থাৎ হেদায়েতের পথ সবার জন্যেই উন্মুক্ত–যে মুক্তমন সৃষ্টির মাধ্যমে তা গ্রহণের মানসিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে সে-ই হেদায়েত অর্জন করে।

এ মাসের অটোসাজেশন

জন্মগ্রহণকারীর মৃত্যু সুনিশ্চিত।
সকল কর্তব্য শেষ করে
আমি তৃপ্তি নিয়ে মারা যাবো।

প্রো-মাস্টার্স ওয়ার্কশপে গুরুজী

কোরআনের শিক্ষার সাথে একাকার হয়ে যান



পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যিনি আমাদেরকে তাঁর পবিত্র কালামের কিছু অংশের মর্মবাণী মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ করা এবং তা বাংলায় পাঠ করার তওফিক দিয়েছেন।

আমরা বিশ্বাস করি, এই মর্মবাণীতে সংকলিত আয়াতগুলোর শুধু শাব্দিক অনুবাদ নয়, বরং যে আয়াতে যা বোঝানো হয়েছে তা-ই ব্যক্ত করা হয়েছে মায়ের ভাষায়; যাতে একজন সাধারণ মানুষও তা সহজে বুঝতে এবং অনুধাবন করতে পারেন।

২৮ জুন ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি হলে অনুষ্ঠিত 'রমজানে থাকুন আল কোরআনের ছায়ায়' শীর্ষক প্রো-মাস্টার্স ওয়ার্কশপে কথাগুলো বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

গুরুজী আরো বলেন, যিনি কোরআনের মর্ম একবার উপলব্ধি করতে পারবেন, দেখা যাবে, তার জীবন কোরআনের সাথে একাকার হয়ে গেছে। আমরাও আমাদের জীবনের সাথে কোরআনকে একাকার করে ফেলতে চাই। এবং এটা খুব সম্ভব।

কোরআনের সাথে আমাদের দূরত্বের অন্যতম কারণ হলো, আমরা কোরআন বুঝি না বা বুঝতে চাই না। মনে ভয় ও অকারণ শঙ্কা, কী জানি কী হয়! আসলে ভয় পাওয়ার যে কিছু নাই বরং আনন্দিত হওয়ার আছে অনেক কিছু–বাংলা মর্মবাণী পড়লে এ বিষয়টিই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

এ সংকলনটি পুরোটাই বাংলায়, তাই এটি সবসময় সাথে রাখা যাবে। পাশাপাশি মোবাইলে কিংবা সিডি প্লেয়ারে বাজিয়ে শুনতে পারবেন।

যেকোনো কিছু থেকে যদি আপনি কল্যাণ চান তাহলে তার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। তেমনি কোরআন শোনার জন্যে, কোরআন অনুধাবন করার জন্যেও মনোযোগী হলেই আমরা কোরআন থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ উপকৃত হতে পারবো।

কোয়ান্টাম ওয়েবসাইটে কোরআনের মর্মবাণী

চলছে অব্যাহত ডাউনলোড ও শেয়ারিং



'আল কোরআন ॥ বাংলা মর্মবাণী (আমপারা ও সপ্ত সূরা)' শীর্ষক পবিত্র কোরআনের ৪৫টি সূরার মর্মবাণীর সংকলনটি সিডি ও পুস্তিকা আকারে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের আগে ২৪ জুন শবেবরাতের দিন থেকেই পাওয়া যাচ্ছিলো কোয়ান্টাম ওয়েবসাইটে। হোমপেজে গেলেই চোখে পড়েছে বিশেষ শিরোনামসহ ডাউনলোড লিংক দেয়া এই খবরটি।

অডিওর ওয়েব ফরম্যাট এবং পুস্তিকার পিডিএফ ফরম্যাট ডাউনলোড করার সুযোগের পাশাপাশি ছিলো পুস্তিকাটির অনলাইন বুক ভার্সনও। ফলে ডাউনলোড না করেও যারা পড়তে চান বা কপি করতে চান, তারা তা করতে পেরেছেন অনায়াসে।

ওয়েবসাইটে প্রকাশের পাশাপাশি ইনফরমেশন সেল থেকে ইমেইলেও এটাচ করা হয় ফাউন্ডেশনের সকল দায়িত্বশীলকে। ফলে স্বল্পতম সময়ে সিডি-টি পৌঁছে যায় অনেকের হাতে। বিশেষ করে শবেবরাতের দিন যারা রোজা রেখেছেন, ইফতারের সময় তাদের অনেকেই অডিও বাজিয়ে শুনেছেন। অনেকে রাতের ইবাদতে, প্রার্থনায় শুনেছেন, পড়েছেন পুস্তিকাটি।

বিশ্বের নানাপ্রান্ত থেকে এ পর্যন্ত অডিও ট্র্যাকটি ডাউনলোড হয়েছে ৬,৫৮৬ বার এবং পুস্তিকাটি ডাউনলোড হয়েছে ৩,৯৮৪ বার, মর্মবাণীর অনলাইন বুক ভার্সন পড়েছেন ৬৭০ জন (১৮ জুলাই বেলা ১২:০০টা পর্যন্ত)। এখনো অব্যাহতভাবে চলছে এ ডাউনলোড। চলছে সাইট এবং ইমেইলের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে শেয়ারিং।

কোয়ান্টামের অনলাইন ফোরাম 'কোরাম কমিউনিটি'তেও বেশ সাড়া পড়ে শবেবরাতের দিন থেকেই। অনেকেই এখানে লিখছেন এই মর্মবাণী শুনে বা পড়ে এমন ৫টি আয়াতের কথা যা তার মনে দাগ কেটেছে এবং ৫টি দিক-নির্দেশনামূলক আয়াতের কথা। উত্থাপন করছেন নানা প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ যার জবাব পাওয়া যাবে সরাসরি গুরুজীর কাছ থেকে।

রমজানে অর্জন করুন নৈশায়নের সওয়াব

কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের সমন্বিতভাবে কল্যাণ ভাবনা ও জ্ঞান অনুশীলনের একটি মাধ্যম কোরাম। গুরুজী বলেছেন, এ রমজানে কোরআন অনুশীলন নিয়ে নিজস্ব উপলব্ধি, অভিজ্ঞতার কথা, বিশ্লেষণধর্মী মতামত নিয়ে রাতে কোরামে লিখলে–এ অংশগ্রহণ নৈশায়নের ইবাদতের সমান বলে বিবেচিত হবে। তাই পবিত্র রমজানে রাতে পবিত্র আল কোরআন-এর চর্চা বিষয়ক আপনার উপলব্ধি অনুভূতির কথা লিখুন কোরাম-এ।

রমজানে লন্ডন রেডিও-তে ২৪ ঘণ্টা কোরআনের মর্মবাণী

কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি লন্ডন শাখার উদ্যোগে কোয়ান্টাম রেডিওর মাধ্যমে রমজান মাসব্যাপী সম্প্রচারিত হচ্ছে আল কোরআন ॥ বাংলা মর্মবাণী (আমপারা ও সপ্ত সূরা)-এর অডিও সিডি। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে এর এমপিথ্রি ফরম্যাটের লিংক পাঠিয়ে দিচ্ছেন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবসহ পরিচিত পরিমণ্ডলে।

রমজানের বিশেষ কার্যক্রম

মাটির ব্যাংক করসেবা

রমজানে যেকোনো ভালো কাজের সওয়াব কমপক্ষে ৭০ গুণ বেশি। বরাবরের মতো এ রমজানেও ফাউন্ডেশনে মাসব্যাপী আয়োজন করা হচ্ছে মাটির ব্যাংক করসেবা। এতে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা কর্মব্যস্ত সময় কাটাবেন নিজের ও পরিচিতদের মাটির ব্যাংক সংগ্রহ, জমাদান ও বিতরণে। এই রমজানে আপনার মাটির ব্যাংক নিকটস্থ সেন্টার শাখা সেলে জমা দিয়ে আপনিও যুক্ত হোন এ পুণ্যময় কাজে।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায় করুন

সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায় আল্লাহর নির্দেশ। তাই যাকাত দানে সমর্থ সদস্যরা কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ডে যাকাত জমা করেন, অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করেন। এ ফান্ডে জমাকৃত সব অর্থ শরিয়া নির্ধারিত খাতে ব্যয় করা হয়। এ রমজানে আপনার যাকাত জমা দিন কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ডে। এ বছর রুপার বিক্রয়মূল্য হিসেবে ৪২ হাজার টাকা জমা থাকলে যাকাত ফরজ হবে।

বিশেষ হিলিং

রমজানে মাসজুড়ে পরিচালিত হচ্ছে বিশেষ হিলিং। নিজের ও পরিবারের সদস্যদের সুস্থতা কামনা করে, বালা-মুসিবত দূরে, মৃত আত্মীয়স্বজনদের মাগফেরাত কামনা করে, রিজিক বৃদ্ধির জন্যে, সৎকর্মে সৎসঙ্গে একাত্ম থাকাসহ যেকোনো নিয়ত পূরণে নাম দিন রমজানের বিশেষ হিলিংয়ে।

রক্তদান করুন

মুমূর্ষু মানুষের জীবন বাঁচাতে রমজান মাসেও রক্ত দিন। শারীরিকভাবে সমর্থ হলে রোজা রেখে রক্তদান করলে রোজার কোনো ক্ষতি হয় না। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও রোজা রেখে রক্তদানে কোনো বাধা নেই। একব্যাগ রক্ত দিয়ে কমপক্ষে চার জন মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব। আর রমজানে যেকোনো সৎকর্মের সওয়াব ৭০ গুণ। তাই একব্যাগ রক্ত দান করে অর্জন করা যাবে ২৮০ জন মানুষকে বাঁচানোর সওয়াব।

কোয়ান্টামমে শুকরিয়া আর উপলব্ধির পহেলা রমজান



কোয়ান্টামম মসজিদে ইফতারের পূর্বমুহূর্তে দোয়ায় সমবেতদের একাংশ

পবিত্র রমজানের প্রথম দিনটিতে কোয়ান্টামমে গুরুজীর সাথে ইফতারে অংশ নেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের দায়িত্বশীলরা। এই বিশেষ ইফতার প্রোগ্রামে শামিল হতে সারাদেশের বিভিন্ন সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেল থেকে ৯ জুলাই তারা কোয়ান্টামমে উপস্থিত হন।

বছরের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মাস পবিত্র রমজান। এবারের রমজান হোক কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধির রমজান–এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে দুই দিনব্যাপী বিশেষ একটি প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টামমে। এই প্রোগ্রামে পুরুষরা মিলনায়তনে এবং মহিলারা ধ্যানঘরে অংশ নেন। মূলত কোরআনের বাণীতে একাত্ম হয়ে পবিত্র রমজানকে স্বাগত জানাতেই দায়িত্বশীলদের নিয়ে এই ব্যতিক্রমী আয়োজন।



সুশৃঙ্খলভাবে অল্প সময়ে দুই হাজার রোজাদারের মধ্যে ইফতার বিতরণ করা হয়

আল কোরআনের মর্মবাণী আমপারা ও সপ্ত সূরা থেকে বিশেষ বিশেষ আয়াত নিয়ে উপস্থিত দায়িত্বশীলরা তাদের উপলব্ধি তুলে ধরেন। এছাড়াও গ্রুপ ডিসকাশনের ভিত্তিতে উঠে আসে চমকপ্রদ অনেক অনুভূতি। তাদের প্রত্যেকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরো প্রোগ্রামটি পায় এক ভিন্ন মাত্রা।

অনেকেই উচ্ছ্বাস নিয়ে জানালেন, এতদিন যে সূরাগুলো নিয়মিত পাঠ করতাম সেগুলো যেন নতুনরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী পাঠের পর।

আবার কেউ কেউ ব্যথাতুর কণ্ঠে বললেন, সত্যি বলতে কী, কোরআনকে, আল্লাহর বাণীকে এতটা কাছে আগে কখনো অনুভব করি নি। এতদিন যেন এই মুখস্থ আয়াতগুলো ছিলো বহুদূরের। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এগুলো আমার একান্ত নিজের।

কারো কারো উপলব্ধি হলো, স্রষ্টা জীবনের প্রতিটি দিক নিয়ে এত সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন যে, কোনো কিছু নিয়েই দ্বিধাদ্বন্দ্বের সুযোগ নেই, তা হয়তো অজানাই রয়ে যেত যদি বাংলা ভাষায় মর্মবাণী না পড়তাম। যতবার আল কোরআনের মর্মবাণী পড়ছি বা শুনছি ততবার অনুভব করছি স্রষ্টা যে আমাদের জীবনকে সহজ করার জন্যে কত নেয়ামত দিয়েছেন!

কমবেশি সবারই অভিমত, আমরা অনেকেই নিয়মিত কোরআন পাঠ করি। কিন্তু কোরআনের বাণীকে সবসময় সাথে রাখার যে সুযোগ ফাউন্ডেশন করে দিয়েছে তা অতুলনীয়। পুস্তিকা সবার জন্যেই সহজে বহনযোগ্য আর প্রতিটি ট্র্যাকই মোবাইলে বা এমপিথ্রিতে নিয়ে শোনার সুযোগ তো রয়েছেই।

প্রায় সবাই জানালেন, আত্মশুদ্ধির মাস রমজানকে সামনে রেখে নিজেকে এভাবে প্রস্তুত করার সুযোগ পাওয়া সত্যিই জীবনে এক বিরল ঘটনা। সেইসাথে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সৎকর্মের সাথে প্রতিনিয়ত আমাদের এই সংযুক্তি পরম তৃপ্তির।

আল কোরআনের সংস্পর্শে এসে নিজেরা যে গভীর তৃপ্তি আর আলোর সন্ধান পেয়েছেন, তা যে চারপাশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, সেই প্রত্যয়ও ব্যক্ত করলেন তারা।

পারস্পরিক মতবিনিময় এবং বক্তব্য উপস্থাপনা সবাইকে অনুপ্রাণিত করে কোরআন অনুসরণের পথে অগ্রসর হতে। প্রত্যেকেই স্রষ্টাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিলেন, সৎসঙ্গের মাধ্যমে কোরআনকে এত নিবিড়ভাবে অনুভব এবং অনুসরণের এই অনন্য সুযোগ পাওয়ার জন্যে।

এছাড়াও অংশগ্রহণকারীরা সুযোগ পান আরোগ্যশালায় আত্মনিমগ্ন সময় কাটানোর। সেইসাথে ভোরের স্নিগ্ধ প্রকৃতিতে গ্রাউন্ড অলিম্পিয়ান আর আনারস বাগান ঘুরে দেখার সময়টাও ছিলো অত্যন্ত আনন্দমুখর।

কোয়ান্টামমে দায়িত্বশীলদের এই মিলনমেলায় উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে যখন ১০ জুলাই পশ্চিম আকাশে দেখা মেলে মাহে রমজানের চাঁদ। পুরো কার্যক্রম সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার প্রয়াসে এই বিশেষ প্রোগ্রামে অংশ নেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের এক দল তরুণ উদ্যমী কোয়ান্টিয়ার।

পহেলা রমজানে কোয়ান্টামম মসজিদে আসরের নামাজের পর রোজার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য নিয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত ও মর্মস্পর্শী দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা ছায়ীদুল হক।



সারাদেশ থেকে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

কোয়ান্টামম মসজিদে পহেলা রমজানে ইফতারে অংশ নেন দুই হাজারেরও বেশি নারী-পুরুষ। ফাউন্ডেশনের আর্ডেন্টিয়ার, কোয়ান্টিয়ার, কোয়ান্টামমের সর্বস্তরের কর্মীরা ছাড়াও এ ইফতার প্রোগ্রামে ছিলো এলাকাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

আগস্ট ২০১৩-এর কার্যক্রম

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম
বনশ্রী : ২৩ ও ২৪ আগস্ট

কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি কার্যক্রম
কেন্দ্র : ৩০ ও ৩১ আগস্ট

জীবনে সফল হওয়ার পথ প্রথমায়ন
কেন্দ্র : ২৩ ও ২৪ আগস্ট

কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রম
পুরুষ : ২৩ ও ২৪ আগস্ট
মহিলা : ৩০ ও ৩১ আগস্ট

কোয়ান্টামম গ্রাজুয়েট কোয়ান্টায়ন
: ২২, ২৩ ও ২৪ আগস্ট
: ২৯, ৩০ ও ৩১ আগস্ট

কোয়ান্টাম বুলেটিন : আগস্ট ২০১৩ ॥ সম্পাদক : কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইভোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 8319377, 8391391 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন

আমি এক অনন্য মানুষ আমরা এক মহান জাতি

সেপ্টেম্বর ২০১৩

মহাজাগতিক সফরে

আচার্য পরেশ চন্দ্র মণ্ডল



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক আচার্য ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল আর নেই। গত ২১ জুলাই রাত সাড়ে ৮টায় তিনি পাড়ি জমিয়েছেন অনন্ত জীবনের পথে। তার বয়স হয়েছিলো ৭৬ বছর।

গবেষক প্রাবন্ধিক সুবক্তা ও একাধিক গ্রন্থপ্রণেতা অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল ২০০১ সালে কোয়ান্টাম মেথডের ১০৭ ব্যাচে অংশ নেন পুত্র ইঞ্জিনিয়ার আশুতোষ মণ্ডলের অনুপ্রেরণায়। সেই থেকে এই এক যুগেরও বেশি সময় কোয়ান্টামের প্রায় সব কার্যক্রমেই তিনি ছিলেন নিয়মিত। সভাপতিত্ব করেছেন একাধিক স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে ও কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনার বিভিন্ন পর্বে। ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়ে তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোয় আলোকিত করেছেন ফাউন্ডেশনের সদস্যদের।

ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত বিনয়ী, নিরহংকারী ও নির্মল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল। মৃত্যুর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃত বিভাগের খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি বিটিভিতে 'পবিত্র গীতা পাঠ' অনুষ্ঠানের নিয়মিত আলোচক ছিলেন।

এই বর্ষীয়ান শিক্ষক ও ধর্মবেত্তার প্রয়াণে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন হারালো একজন অভিভাবক। আমরা তার সামগ্রিক অবদান আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞচিত্ততার সাথে স্মরণ করছি। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমরা জানাই গভীর সমবেদনা।

পরম করুণাময় তাকে অনন্ত প্রশান্তি দান করুন।

বিশিষ্ট সাংবাদিক নাজিম উদ্দিন মোস্তান



বিশিষ্ট সাংবাদিক দৈনিক ইত্তেফাক-এর সাবেক চিফ রিপোর্টার নাজিম উদ্দিন মোস্তান আর নেই (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। ১৮ আগস্ট বিকেল সাড়ে ৪টায় মিরপুরে নিজ বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিলো ৬৫ বছর।

১৯৯৩ সালে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে শিথিলায়ন ক্যাসেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক নাজিম উদ্দিন মোস্তান। পরদিন দৈনিক ইত্তেফাক-এর প্রথম পাতায় 'আচ্ছন্ন তন্দ্রায় নাকডাকা প্রশান্তি' শীর্ষক সাড়া জাগানো রিপোর্টটি ছিলো তারই করা। পরবর্তীতে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের প্রথম ব্যাচে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তার অবদান কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছে।

সাভার ট্র্যাজেডিতে আহতদের জন্যে রক্তদান

বিজিএমইএ-র সম্মাননা স্মারক পেলো কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন



২৪ এপ্রিল সাভারে রানা প্লাজায় ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মুমূর্ষু শ্রমিকদের চিকিৎসাসেবায় বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহের জন্যে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে। ১ আগস্ট ২০১৩, সাভারে এ দুর্ঘটনার শত তম দিনে এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারী ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন (বিজিএমইএ) এক বিশেষ স্মরণসভা ও সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন বিজিএমইএ-এর সভাপতি আতিকুল ইসলাম।

এ স্মরণসভায় প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক এমপি এবং বিজিএমইএ-এর সভাপতি আতিকুল ইসলামের কাছ থেকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান এবং মোমেন্টিয়ার ও শিল্পোদ্যোক্তা মিসেস মাসুদা আক্তার আবেদীন।

স্মরণসভায় উদ্ধার তৎপরতায় সহযোগিতার জন্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-কে স্মারক প্রদান করা হয়। চিকিৎসাসেবায় সহযোগিতার জন্যে স্মারক প্রদান করা হয় এনাম মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র সিআরপি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, পঙ্গু হাসপাতাল, আল মুসলিম গ্রুপ এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন-কে। এছাড়া লাশদাফন কার্যক্রমে সহায়তার জন্যে স্মারক প্রদান করা হয় আঞ্জুমান মাফিদুল ইসলাম-কে।

উল্লেখ্য, ২৪ এপ্রিল সাভার ট্র্যাজেডিতে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সাধ্যমতো দাঁড়িয়েছে দুর্গত মানুষের পাশে। বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে তিন দিনে আড়াই হাজার ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করে। আহত ও চিকিৎসাধীন মানুষের জন্যে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে প্রথম চার দিনেই কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে সরবরাহ করা হয় ৬৪৯ ব্যাগ রক্ত।

দুর্ঘটনার পর পরই কোয়ান্টাম ল্যাবে রক্ত দিতে চলে আসেন নিয়মিত স্বেচ্ছা রক্তদাতাসহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ। দুর্ঘটনায় আহত ও চিকিৎসাধীনদের কোয়ান্টাম ল্যাবের পক্ষ থেকে বিনা প্রসেসিং খরচে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহের ঘোষণা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও জাতীয় দৈনিকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তিও প্রচারিত হয়।

এছাড়াও দুর্ঘটনাস্থলে পাঁচ দিন ধরে চলা উদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নেয় ফায়ার সার্ভিসের অধীনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের ৪৬ জন দায়িত্বশীল ও কোয়ান্টিয়ার।

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব

মাসিক কার্যক্রম

১৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার থেকে বনশ্রী কার্যালয়ে শুরু হতে যাচ্ছে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব-এর মাসিক কার্যক্রম। হৃৎপিণ্ডের সুস্থতা ও এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে এখন থেকে প্রতিমাসে এটি অনুষ্ঠিত হবে। সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে সাজানো এ কার্যক্রমটি কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব সদস্যসহ সবার জন্যে উন্মুক্ত।

সময় : বিকেল ৪.৩০-রাত ৮টা পর্যন্ত

সেপ্টেম্বরের কর্মসূচি

গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ : ৬ সেপ্টেম্বর
বিষয় : সাফল্যের চোরাবালি

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স
ঢাকা : ৩৬৫ তম ব্যাচ
১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর

কোয়ান্টাম মেথড রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রাম
গ্রুপ-এ : ২০, ২১, ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর
গ্রুপ-বি : ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর
দ্রুত নাম রেজিস্ট্রেশন করুন



আচার্য ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল

সঙ্ঘপ্রেমী এক অনন্য মানুষ

আচার্য ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল। নামটা শুনলেই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে স্নিগ্ধতায় ভরা অমলিন এক হাসি মাখা মুখ। সদা হাস্যোজ্জ্বল, বিনয়ী ও সদাচরী এই মানুষটি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করেছিলেন ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত ১০৭ ব্যাচে। এরপর থেকেই কোয়ান্টামের সাথে তার গড়ে ওঠে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন। তিনি মমতার ডোরে যেমন বেঁধেছিলেন কোয়ান্টাম পরিবারকে তেমনি সবাইকে বেদনাসিক্ত করে অনন্তযাত্রায় পাড়ি জমালেন গত ২১ জুলাই, ২০১৩।

ফাউন্ডেশনের প্রতিটি অনুষ্ঠানে চোখে পড়তো আচার্য ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল স্যারের উজ্জ্বল উপস্থিতি। ছিলেন হাতিরপুল শাখার একজন উপদেষ্টা, সাংগঠনিক নানা বিষয়ে দিয়েছেন তার সুচিন্তিত পরামর্শ। শত ব্যস্ততার মাঝেও কোয়ান্টাম আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন নিয়মিত।

এই একাত্মতার পাশাপাশি আচার্য ড. পরেশ স্যার সঙ্ঘের প্রতিটি দিক-নির্দেশনা অনুসরণেও ছিলেন সমান তৎপর এবং আন্তরিক। ২০১১ সালে সুখী জীবন মেডিটেশন প্রকাশিত হওয়ার পর শ্রদ্ধেয় গুরুজী কোয়ান্টাম পরিবারের সবাইকে ছয় মাস তা অনুশীলনের আহ্বান জানান। এর কোনো ব্যত্যয় ঘটে নি স্যারের জীবনে। তিনি পরবর্তী ছয় মাস সুখী জীবনের মেডিটেশন অনুশীলন করেছেন একনিষ্ঠভাবে। স্রষ্টার করুণায় মেডিটেশনটি টানা ছয় মাস চর্চার ফলে নিরাময় লাভ করেছিলেন বার্ধক্যজনিত হাতকাঁপা থেকে। সুস্থতা আর প্রাণবন্ততা তাকে ঘিরে থাকতো সবসময়। তার পরিমিত জীবনবোধ আর নিয়মানুবর্তিতার কারণেই জীবন সায়াহ্নেও তিনি ছিলেন কর্মময় একজন মানুষ।

পেশাগত জীবনে ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি, সংস্কৃত বিভাগ ও বিশ্বধর্মতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক, গবেষক ও ধর্মবেত্তা। পালি ও সংস্কৃত বিভাগে তিন বছর বিভাগীয় প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষে শিক্ষকতাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন তিনি। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। জগন্নাথ হলের আবাসিক শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সুদীর্ঘ ২৫ বছর।

সততা এবং নিষ্ঠার ছাপ ছিলো তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। জীবনভর অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছেন, দিয়েছেন জীবন গড়ার সঠিক দিক-নির্দেশনা। নিজেও জ্ঞানের চর্চা করে গেছেন প্রতিনিয়ত।

তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রথম ব্যাচের ছাত্র। তিনি তৎকালীন বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মুহম্মদ আব্দুল হাই-এর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান। আর নিয়মিত পড়াশোনার ফলস্বরূপ অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবনে তিনি বরেণ্য দার্শনিক গোবিন্দ চন্দ্র দেব-এর অমূল্য সাহচর্য লাভ করেন। আচার্য পরেশ চন্দ্র মণ্ডল ১৯৭৯ সালে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনিই বাংলাদেশে সংস্কৃত-এর ওপর প্রথম পিএইচডি অর্জনকারী।

লেখালেখির ক্ষেত্রেও আচার্য পরেশ চন্দ্র মণ্ডল ব্যয় করেন জীবনের অনেকটা সময়। দুইটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থসহ মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট ২০টি পাঠ্যবই রচনা করেন তিনি। কালিদাসের নাটকের কারিগরি বিষয়ের ওপর 'Kalidasa as a dramatist : A Study' নামে তার পিএইচডি থিসিসটি পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এর একটি অধ্যায় Ancient and Medieval Literature Criticism-এর নবম ভলিউমে ইউ-কে থেকে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়।

এছাড়াও 'সংস্কৃত ছন্দের ধারা' তার আরেকটি অনবদ্য প্রকাশনা। মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন আটটি, ধর্ম বিষয়ে রচিত প্রবন্ধের সংখ্যা চল্লিশোর্ধ্ব। ডিগ্রি পর্যায়ের রচনার বইও তিনি সম্পাদনা করেছেন। দীর্ঘ গবেষণার পর বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে গীতার একটি আধুনিক সংস্করণের কাজও শেষ করেছিলেন, বইটি এখন প্রকাশের অপেক্ষায়।

শিক্ষকতা, জ্ঞানচর্চা, লেখালেখি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন আচার্য পরেশ চন্দ্র মণ্ডল। ১৯৭৮ সালে পিএইচডি সম্পন্ন করে দেশে ফেরার পর রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীর অনুরোধে সেখানে ধর্ম বিষয়ক আলোচনা শুরু করেন এবং সুবক্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। সত্তর দশক থেকে বিটিভিতে পবিত্র গীতা পাঠ অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত আলোচনা শুরু করেন। রেডিও ও টিভিতে নিয়মিত গীতা পাঠ করে সারাদেশে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।

জটিল তত্ত্ব সহজে বলার অসাধারণ এক সহজাত ক্ষমতা ছিলো তার। ফলে তার প্রাণবন্ত আলোচনা অনায়াসে গেঁথে যেত শ্রোতার হৃদয়ে। সংস্কৃত ভাষা ও সনাতন ধর্মের তাত্ত্বিক বিষয়ে শুধু দেশে নয়, সমগ্র উপমহাদেশে তার মতো জ্ঞানী সাধক বিরল। একারণেই সাধারণ এক বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও একাগ্র জ্ঞানচর্চার ফলে অর্জন করেন আচার্য বা গীতাপ্রজ্ঞাতীর্থ-র মতো উপাধি।

নতুন কিছু শেখার ক্ষেত্রে, জানার ক্ষেত্রে সবসময়ই তিনি ছিলেন অগ্রগামী। মুক্তমনে গ্রহণ করতে পারতেন কল্যাণকর যেকোনো কিছু। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সেও এসেছিলেন তার বড় ছেলে আশুতোষ মণ্ডলের অনুপ্রেরণায় মুক্তমনে ভালো কিছু জানার প্রয়াসেই।

পারিবারিকভাবেও আচার্য পরেশ চন্দ্র মণ্ডল ছিলেন একজন সফল মানুষ। তার সহধর্মিণী মিনু রাণী মণ্ডল একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। তাদের দুই ছেলে কানাডা প্রবাসী। বড় ছেলে আশুতোষ মণ্ডল কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, ছোট ছেলে বিজয় মণ্ডল কানাডার ব্যাংক অব মন্ট্রিলে কর্মরত আছেন।

কর্মজীবন, পারিবারিক জীবন, সাংগঠনিক জীবন–সবক্ষেত্রেই একজন সফল মানুষ ছিলেন আচার্য পরেশ চন্দ্র মণ্ডল। যেকোনো সাংগঠনিক কাজে সবার সাথে মিশে যেতে পারতেন হৃদ্যতা আর আন্তরিকতা নিয়ে। ফাউন্ডেশনের কাজে যখনই প্রয়োজন হয়েছে তিনি সময় দিয়েছেন, কোয়ান্টাম চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছেন তার জ্ঞানের আলোকে।

২০০৪ সাল থেকে শুরু হয় কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের প্রতিদিনের চর্চা 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' বলা। পরবর্তীতে পরিবারের সনাতন সদস্যদের জন্যে চমৎকার একটি শব্দ সংযোজিত হয়–'হরিওম'। আর এই শব্দটি অনুসন্ধানে ছিলো আচার্য পরেশ চন্দ্র মণ্ডলের সযত্ন প্রয়াস।

একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মেডিটেশন মেলা আয়োজনের উদ্দেশ্যে ভিসির সাথে দেখা করে প্রোগ্রামের অনুমতি চাইলেন। নিজের গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ থাকা সত্ত্বেও সেদিন কোয়ান্টিয়ারদের সাথে সেখানে গিয়ে তিনি দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করেন। অথচ নিজের ব্যক্তিগত কোনো কাজের জন্যে তিনি কখনো কোনো সুপারিশ করেন নি। সঙ্ঘের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যকে বড় করে দেখেছেন সবসময় আর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত থাকতে চেয়েছেন সঙ্ঘের সাথেই।



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ভগবদ্গীতা কণিকার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্বামী স্থিরাত্মানন্দজী মহারাজের সঙ্গে

স্রষ্টার করুণাধারায় সিক্ত হয়ে যে জীবন শুরু হয়েছিলো ১৯৩৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর, তার-ই জাগতিক সমাপ্তি ঘটলো ২১ জুলাই, ২০১৩ সালে।

যাপিত জীবনের টুকরো টুকরো শত স্মৃতি হয়তো ম্লান হবে। কিন্তু সময়ের স্রোতকে অতিক্রম করে ঠিকই টিকে থাকবে আচার্য পরেশ চন্দ্র মণ্ডলের সঙ্ঘপ্রেম আর মানবসেবায় তার নিঃস্বার্থ অবদান। স্রষ্টা এই সঙ্ঘপ্রেমী অনন্য মানুষের প্রতিটি সৎকর্মকে কবুল করুন।

মেদস্থূলতা ॥ সচেতনতা প্রয়োজন এখনই

মেদস্থূলতা : এ শতাব্দীর মহামারী!

মেদস্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজন। বিশ্বজুড়ে গত কয়েক দশকে এটি রূপ নিয়েছে ক্রমবর্ধমান এক স্বাস্থ্য-জটিলতায়, পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ইতোমধ্যেই এটি দেখা দিয়েছে মহামারী হিসেবে। অর্থাৎ কাগজে-কলমে এতদিন যা ছিলো বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, সেটাই আজ বাস্তবতা।

মেদস্থূলতার এই আগ্রাসন পাশ্চাত্যে শুরু হয়েছে মূলত দুই যুগেরও বেশি সময় আগে। সেখানকার স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি সর্বনাশা ক্যান্সারের মতোই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। তারা বলছেন, ব্যাপারটা এখন অনেকটা এমন, যেন ভিনগ্রহ থেকে অতিকায় কোনো অপ্রতিরোধ্য এলিয়েন-বাহিনী এসে জয় করে নিচ্ছে আমেরিকার একটির পর একটি রাজ্য।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই পরিস্থিতি গিয়ে ঠেকেছে আরো ভয়াবহ পর্যায়ে। যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংস্থার (সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন) একটি জরিপে (২০০৯-২০১০) বলা হয়েছে, তাদের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ (৩৫.৭%) অতিরিক্ত ওজনের শিকার। আবার এদের মধ্যে শতকরা ১৭ ভাগই বয়সে তরুণ।

এসব তথ্য-উপাত্ত নিয়ে তাই আমেরিকাসহ সারা বিশ্বেই স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞরা এখন সত্যিই খুব উদ্বিগ্ন; কারণ মেদস্থূলতার এই সাঁড়াশি আক্রমণ দিন দিন বাড়ছে বৈ কমছে না। আমেরিকান কলেজ অব ফিজিশিয়ানস থেকে প্রকাশিত চিকিৎসা-সাময়িকী আন্যাল্‌স অব ইন্টারনাল মেডিসিন-এ প্রকাশিত একটি গবেষণা-প্রতিবেদনে এর সত্যতা মেলে।

চার হাজার মানুষের প্রাত্যহিক জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করে প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এভাবে চলতে থাকলে সম্ভাবনা আছে যে, ৩০ বছর পর এদের প্রতি ১০ জন পুরুষের মধ্যে নয় জন এবং প্রতি ১০ জন নারীর মধ্যে সাত জন অতিরিক্ত ওজনের ভারে আক্রান্ত হবেন।

বাড়ছে রোগ, বাড়ছে চিকিৎসা ব্যয়

মেদস্থূলতার হার যত বাড়ছে তত পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হরেক রকম রোগ-ব্যাধি যেমন : হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, পিত্তথলির রোগ, স্লিপ এপনিয়া (ঘুমের সময় শ্বাসজনিত সমস্যা), হাড়ক্ষয় এবং কয়েক ধরনের ক্যান্সার।

শুধু তা-ই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের হেলথ এন্ড হিউম্যান সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট-এর একটি জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, সেদেশে প্রতিবছর তিন লক্ষ অকালমৃত্যুর কারণ হলো মাত্রাতিরিক্ত শারীরিক ওজন। এছাড়াও তাতে বলা হয়েছে, মেদস্থূলতার কারণে একজন মানুষের অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে বহুগুণ।

রোগ বাড়ছে, স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে চিকিৎসা ব্যয়। একটি হিসেবে দেখা গেছে, মাত্রাতিরিক্ত ওজনধারী মানুষের পেছনে বার্ষিক চিকিৎসা-ব্যয় হয় অতিরিক্ত চৌদ্দশ ডলার। এর ফলে ২০০৮ সালে শুধু এক বছরে মেদস্থূলতার কারণেই যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাখাতে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে মোট ১৪৭ বিলিয়ন ডলার, যা আমাদের মূল্যমানে ১১ লক্ষ ৪৫ হাজার ১৩০ কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থ।

স্থূলতার কারণ জানা জরুরি

পরিশ্রমহীন জীবনযাপন আর ভুল খাদ্যাভ্যাসকেই আজ পৃথিবীজুড়ে মেদবহুলতার প্রধানতম কারণ হিসেবে শনাক্ত করেছেন গবেষকরা। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ন্যূনতম পরিশ্রমের প্রয়োজনটুকু ফুরিয়ে গেছে অনেকখানিই। ফলে খাবারের মাধ্যমে যে ক্যালরি আমরা গ্রহণ করছি তার একটা বড় অংশই শারীরিক নিষ্ক্রিয়তার কারণে থেকে যাচ্ছে অব্যবহৃত, যা পরবর্তীতে রূপান্তরিত হচ্ছে ফ্যাট-এ।

আবার অন্যদিকে, আমাদের খাদ্যাভ্যাসে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। একসময় মানুষের দৈনন্দিন খাবারের প্রায় পুরোটাই ছিলো প্রাকৃতিক উৎসজাত; গত প্রায় ৫০ বছরের ধারাবাহিকতায় একটু একটু করে বদলে গেছে সেই চিত্রটি। অধিক চিনি আর উচ্চ ফ্যাটযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবারের দাপট এখন সারা বিশ্বজুড়ে। আর এর সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ছে অতিরিক্ত ওজন নিয়ে মেদস্থূলদের হাসফাঁস।

অতিরিক্ত ওজনের ক্ষেত্রে আছে স্ট্রেসেরও ভূমিকা। গবেষকরা বলছেন, দীর্ঘমেয়াদি মানসিক চাপে ভুগছেন যারা, তাদের অনেকেই এ থেকে বেরিয়ে আসার একটি ভ্রান্ত উপায় হিসেবে অস্বাস্থ্যকর মুখরোচক খাবারের প্রতি ঝুঁকে পড়েন।

স্ট্রেসের ফলে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস থেকে একটি নিউরোট্রান্সমিটার (নিউরোপেপটাইড ওয়াই) নিঃসৃত হয়, যা ক্ষুধার অনুভূতি বাড়িয়ে তোলে, বিশেষত শর্করা জাতীয় খাবারের প্রতি আসক্তি বেড়ে যায়। ফলে তখন খাওয়ার পরিমাণও হয় বেশি।

দীর্ঘদিনের মানসিক চাপের ফলে মানুষের শরীরে কিছু হরমোন, যেমন : স্টেরয়েড ও ইনসুলিনের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়। এটি শরীরে ফ্যাট-এর পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। আর এই ফ্যাট মূলত জমা হয় শরীরের মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ পেটের আশপাশে, বিভিন্ন রোগঝুঁকি বাড়ায় বলে তুলনামূলকভাবে এটি বেশি ক্ষতিকর। সৌন্দর্য-হানিকর তো বটেই।

প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ : সচেতনতা জরুরি

সম্প্রতি (৩ জুলাই, ২০১৩) ঢাকার আইসিডিডিআরবি-তে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। জাতীয় অধ্যাপক ডা. আব্দুল মালিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে বিশেষজ্ঞরা বলেন, বর্তমানে দেশের শহরাঞ্চলের ১৪ শতাংশ শিশু অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতার শিকার। ঢাকা শহরে এই হার ২১ শতাংশ। আর এর অন্যতম কারণ হলো অস্বাস্থ্যকর ও ক্ষতিকর খাদ্যাভ্যাস। এবং এসব শিশু তুলনামূলক কম সক্রিয়।

মেদস্থূলতা নিয়ে পরিচালিত দেশের প্রথম এই জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করতে গিয়ে খ্যাতনামা জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও পুষ্টিবিদরা বলেন, শিশু-কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অতিরিক্ত ওজন দেশে নতুন জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এর ফলে বাড়ছে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক ও বাতসহ নানারকম রোগ-ব্যাধি।

তাই শিশুসহ সব বয়সী মানুষকে শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।



নিয়মিত খেলাধুলা ও হাঁটাচলার কথা বলেছেন তারা। অতিরিক্ত তেল-চর্বিযুক্ত খাবার কম খাওয়া, বিশেষত ফাস্টফুড থেকে দূরে থাকা এবং শিশুরা যাতে অধিক সময় ধরে টিভি না দেখে ও ভিডিও গেম না খেলে সে ব্যাপারে অভিভাবকদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

সঠিক ওজন ॥ সুস্থ দেহ সতেজ মন

সার্বিক সুস্থতার জন্যে চাই দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণ। সঠিক ওজন মনোদৈহিক সুস্থতা নিশ্চিত করে। তাই এ ব্যাপারে সচেতন হোন এখনই।

আগে জানুন, উচ্চতা অনুসারে আপনার ওজন কত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি কাঙ্ক্ষিত ওজনের চেয়ে তা বেশি হয়ে থাকে তবে অতিরিক্ত ওজন কমানোর জন্যে একটি বাস্তবভিত্তিক লক্ষ্য নির্ধারণ করুন।

সাবধান! স্থূলতা কমাতে গিয়ে ভুলেও '৭ দিনে ৭ কেজি ওজন কমান' জাতীয় স্থূল বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পা দেবেন না। লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই তাতে বেশি। তাই ন্যূনতম লক্ষ্য স্থির করুন, যেমন : প্রতি মাসে এক থেকে দুই কেজি ওজন কমানো যুক্তিযুক্ত।

এ লক্ষ্যে একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন। দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় প্রাকৃতিক খাবার, যেমন : পর্যাপ্ত শাক-সব্জি, পরিমিত শর্করা, মাছ, তাজা ফলমূল, বাদাম ইত্যাদির প্রাধান্য দিন। আপনার স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করেই ভাজাপোড়া, তৈলাক্ত, অধিক চিনিযুক্ত খাবার, ফাস্টফুড, কোমল পানীয়সহ সব ধরনের কৃত্রিম ও প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং পানীয় যথাসাধ্য বর্জন করুন।

নিয়মিত ব্যায়াম করুন, দিনে অন্তত ৩০ মিনিট। ওজন কমাতে এটি সর্বোত্তম পন্থা। ব্যায়াম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুভাবেই দেহের ওজন কমাতে সাহায্য করে। নিয়মিত হাঁটুন। স্বল্প দূরত্বে রিকশা বা গাড়ি, লিফট এড়িয়ে চলুন; অর্থাৎ সারাদিনে যতটা সম্ভব সক্রিয় ও কর্মচঞ্চল থাকুন।

সবমিলিয়ে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হোন। ওজন থাকবে আপনার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। শরীর হয়ে উঠবে ঝরঝরে আর সতেজ। আপনি উপভোগ করবেন এক আনন্দ-উচ্ছল সুখী জীবন।

ডা. আতাউর রহমান

ডা. ডিন অরনিশ-এর নিউইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার গ্রন্থ 'দি স্পেকট্রাম' অবলম্বনে

গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

জীবনের শেষ দিনটিতেও থাকবো সুস্থ ও কর্মক্ষম

আঞ্জুমান আরা ভুঁইয়া



কোয়ান্টাম মেথড সম্পর্কে আমার তেমন ধারণা ছিলো না। কোর্সের প্রথমদিন থেকে একটু একটু ভালোলাগা শুরু হলো। আগে ভাবতাম, ৩৫ বছর ধরে একটি স্কুল পরিচালনা করছি, আর কত! কদিনই বা বাঁচবো! এর মধ্যে হাঁটু ব্যথা শুরু হলো। ঠিক মতো হাঁটতে পারি না। এরকম একটা সময় কোর্সে এসে ভর্তি হলাম। তিনদিন ক্লাস করার পর মনছবির ব্যাপারটা আমার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিলো। আমার বিশ্বাস জন্মালো, যতদিন বাঁচবো কর্মক্ষম থেকে কাজ করে যাবো।

আমার পা ব্যথা এখন অনেকটা সেরে গেছে। এখন মনে হয়, বৃদ্ধ বয়সে পঙ্গু হয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে–এটা ভ্রান্ত ধারণা। জীবনের সব প্রতিকূলতা জয় করে শেষ দিন পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকবো ইনশাল্লাহ–এই অনুপ্রেরণা নিয়েই আমার পথচলা অব্যাহত রাখবো।

[আঞ্জুমান আরা ভুঁইয়া, প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, নারায়ণগঞ্জ কিন্ডারগার্টেন। ৩৫৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

জীবনেও প্রথম হবো

সজীব কুমার বর্মন



আমি বই পড়তে খুব ভালবাসি। কোয়ান্টামের সব প্রকাশনা সংগ্রহ করি। এরই মধ্যে কোয়ান্টামের ওয়েবসাইটের ঠিকানা পেলাম। ওয়েবসাইট ভিজিট করে আমি রীতিমতো বিস্মিত! বাংলাভাষায় এত সমৃদ্ধ, এত চমৎকার ওয়েবসাইট হতে পারে! সেখানে কোরামে কোয়ান্টামের সদস্যরা তাদের সৃজনশীলতাগুলো খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেন।

ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার সময় আমার টাইফয়েড হওয়ায় আশানুরূপ বিষয় পাই নি। তীব্র একটা হতাশা ছিলো, আমি কেন এ বিষয় পড়বো? পড়াশোনায় ছন্দপতন শুরু হলো। ক্লাসে ভালো রেজাল্ট হচ্ছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোয়ান্টামের নিয়মিত প্রোগ্রাম হয়। সেখানে অংশ নিয়ে ভেতর থেকে অনুভব করলাম কোর্সটি করা প্রয়োজন।

মনছবি করলাম, এ বছরই কোর্স করবো। একসময় বিশ্বাস করতে শুরু করলাম, আমি পারবো। স্রষ্টার নিকট অশেষ ধন্যবাদ যে, আমি নিজের আয় করা টাকায় কোর্সটি করতে পেরেছি। আমি বরাবরই ক্লাসে প্রথম। এখন মনছবি সুদৃঢ় হয়েছে যে, জীবনেও প্রথম হবো।

[সজীব কুমার বর্মন। মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগ, অনার্স ১ম বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৬১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সফলতা ধরে রাখার জন্যেও মেডিটেশন প্রয়োজন

মো. মাজহারুল ইসলাম



বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় 'সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড' বইটি দেখে মেডিটেশন চর্চা করতাম। এতে আমার মনোযোগ বেড়ে যায়। সে সময় খুব ভালো রেজাল্ট করছিলাম, এছাড়াও সারাদেশে ডিবেট, নাটক করেছি। আমার একটা নেতিবাচক ধারণা ছিলো যে, সফল মানুষের মেডিটেশন কোর্স করার প্রয়োজন নেই। যারা হতাশ, ব্যর্থ তারাই এটি করবে।

গত সাড়ে তিন বছরে পেশাগত চাপ আর পারিবারিক নানা সংঘাতে আমার শারীরিক কিছু সমস্যা তৈরি হয়। এর একটি হলো স্থায়ী ঘাড়ব্যথা। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখিয়েছি। তারা কোনো সমস্যা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু ব্যথায় আমি কম্পিউটারের দিকে তাকাতে পারতাম না। অন্য এক ডাক্তার বললেন, ব্যথার কারণ মানসিক। তখনই অনুভব করেছি, আমার কোর্সটি করা উচিত।

কোর্সের তৃতীয় দিন আমার ঘাড়ব্যথা ৯০ ভাগ কমে যায়। তখন মনে হলো, ১০ বছর আগে যদি কোর্সটি করতাম, তাহলে ঘাড়ব্যথা নিয়ে কোর্সে আসতে হতো না। সফলতার যে অবস্থানে তখন ছিলাম সেটাকে আরো বড় জায়গায় নিয়ে যেতে পারতাম। তাই শুধু ব্যর্থরা মেডিটেশন করবে তা নয়, সফলতা ধরে রাখার জন্যেও মেডিটেশন প্রয়োজন।

[মো. মাজহারুল ইসলাম, একটি বেসরকারি ব্যাংকে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার হিসেবে কর্মরত। ৩৬২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছি

মাহবুবা ইসলাম রাখি



কোর্সে এত মানুষের সামনে অনুভূতি ব্যক্ত করতে পেরে নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে হয়েছে। প্রথমদিন কোর্স শেষে বাসায় গিয়ে যখন আয়নায় নিজের মুখ দেখলাম, মনে হচ্ছিলো সেখানে কোনো ক্লান্তি নেই। বাসায় অন্যরাও বললো, আমাকে বেশ সতেজ আর প্রাণবন্ত লাগছে।

ছোটবেলা থেকেই মেডিটেশনের বিভিন্ন বই পড়ে এর প্রতি আমার আগ্রহ জন্মায়। আত্মীয়স্বজনদের দেখেও উদ্বুদ্ধ হয়েছি। কোর্স করার পর থেকে আমার মধ্যে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন অনুভব করছি। আশা করি, কোয়ান্টামের দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করলে আরো পরিবর্তন আসবে। এছাড়া আমি এখন দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছি। আত্মনিয়ন্ত্রণ করার শক্তিও বেড়েছে।

[মাহবুবা ইসলাম রাখি, অভিনেত্রী। ৩৬১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ঝরঝরে অনুভূতি নিয়ে ঘুম ভাঙলো

ওবায়েদ আকাশ



কিছুদিন আগে আমার হঠাৎ করে খুব সর্দি হলো। এক্স-রে করে দেখা গেল ফুসফুসে পানি জমেছে। ১৮ দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম। এছাড়া আমার হাত-পাসহ সমস্ত শরীর ফুলে যেত। কোর্সেও দ্বিতীয় দিন আমার হাত ও পায়ের কিছু অংশ ফুলে যায়। বাসায় যাওয়ার পর দেখলাম আমার সমস্ত শরীর ফুলে গেছে। আমার স্ত্রী বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাকে আশ্বস্ত করে আমি অটোসাজেশন অনুশীলন এবং মেডিটেশনে নিজেকে নিরাময় শুরু করলাম। আমি অনুভব করলাম, আমার শরীর হালকা হয়ে যাচ্ছে। সকালবেলা সম্পূর্ণ ঝরঝরে অনুভূতি নিয়ে ঘুম ভাঙলো।

আমি ঘুমের জন্যে নিয়মিত একটি ওষুধ খেতাম। কোর্সের প্রথম দিন থেকেই কোর্সে শেখা টেকনিক অনুসরণ করে ওষুধ ছাড়াই ঘুম হচ্ছে। যেসময় ঘুম থেকে ওঠার জন্যে প্রোগ্রাম দিচ্ছি ঠিক সে সময়ই উঠতে পারছি। আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়েছে, এলোমেলো ভাবনাগুলো শৃঙ্খলার মধ্যে এসেছে। আমি মনে করি আমার সুস্থতার জন্যে আমার ইচ্ছাশক্তি, আমার আত্মবিশ্বাসই যথেষ্ট।

[ওবায়েদ আকাশ, সাংবাদিক, দৈনিক সংবাদ। ৩৬২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আর কষ্ট বয়ে বেড়াবো না

ফৌজিয়া আফরিন ফাইজা



ছোটবেলা থেকেই আমি স্বপ্ন দেখি আমি নাসার একজন বিজ্ঞানী হবো। আমার বিশ্বাস, আমি অবশ্যই তা হতে পারবো। কোয়ান্টাম আমার সে বিশ্বাসের ভিত্তিকে আরো মজবুত করেছে। এ নিয়ে আমার চারপাশের মানুষ আমাকে তাচ্ছিল্য করলেও এখন তা সহজভাবে নিতে পারবো আমি।

ছোটবেলা থেকে আমি অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ক্লাস ফাইভে আমি ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পাই। কিন্তু জেএসসি-তে জেনারেল গ্রেডে বৃত্তি পাওয়ায় অনেক কষ্ট পেয়েছি। বেশ কয়েকদিন কষ্টটা বয়ে বেড়িয়েছি। কোর্সে এসে শিখলাম, বয়ে বেড়িয়ে কোনো লাভ নেই। আমার সামনে বিশাল ভবিষ্যৎ রয়েছে। আমি কেন ছোট বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করবো! যেখানে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের মূল্য অনেক বেশি। আর জীবনে পথচলাটা যে এত সুন্দর হতে পারে সেটা বুঝতে পেরেছি এ কোর্সে এসে।

[ফৌজিয়া আফরিন ফাইজা, ৯ম শ্রেণী, ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ। ৩৫৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কোরআনের জ্ঞান অর্জন সবার জন্যেই সহজ



গ্রাজুয়েট আখেরি দোয়ায় মেডিটেশন পরিচালনা করছেন শ্রদ্ধেয়া মা-জী নাহার আল বোখারী

সঠিক জীবনদৃষ্টি লাভ ও জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় সব নির্দেশনা রয়েছে পবিত্র কোরআনে। আর কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মানুষের জন্যেই খুব সহজ। এর জন্যে প্রয়োজন মুক্তমন। কোরআন এই মুক্তবুদ্ধির চর্চাকেই সবসময় উৎসাহিত করেছে। যে কারণে নবীজীর সময়ে নিরক্ষর সাহাবীরা শুধু শুনে শুনে কোরআন আত্মস্থ করেছেন, কোরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী হয়েছেন, কোরআনকে অনুসরণ করেছেন এবং শত শত মানুষের কাছে সেই জ্ঞানের আলো পৌঁছে দিয়েছেন।

১৯ ও ২০ জুলাই গ্রাজুয়েট কমপ্যাক্ট আখেরি দোয়ায় কথাগুলো বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। কোরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে এর সার্বজনীনতা, এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার, প্রাত্যহিক জীবনে কোরআনচর্চা, রসুলুল্লাহ (স)-এর জীবনে কোরআনের বাস্তব প্রভাব ইত্যাদি আলোচনাসমৃদ্ধ দুই দিনব্যাপী এ গ্রাজুয়েট কমপ্যাক্ট আখেরি দোয়া অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তনে।

গ্রাজুয়েট কমপ্যাক্ট আখেরি দোয়ায় গুরুজী রসুলুল্লাহ (স) প্রসঙ্গে বলেন, কোরআন যে মহামানবের ওপর নাজিল হয়েছিলো, তাঁর ব্যক্তিত্বের মতো সত্য সুন্দর ও মানবিকতার এত চমৎকার সম্মিলন ইতিহাসে আর দেখা যায় না। হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন মজলুম মানুষের ত্রাণকর্তা। বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক হিসেবে নবুয়ত লাভের আগেই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আল-আমিন বা সত্যের প্রতীক রূপে। জীবনাচারে বিশ্বস্ততা সততা আমানতদারিতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

কোরআনের জ্ঞান অর্জন অবশ্য কর্তব্য

আখেরি দোয়ায় গুরুজী আরো বলেন, কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। কারণ ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, সত্যমিথ্যা সম্পর্কে খুব সুস্পষ্ট জ্ঞান রয়েছে কোরআনে। কোরআন নাজিল হওয়ার সময় সূরা আলাক-এর প্রথম পাঁচটি আয়াতে বলা হয়েছে, 'পড়! তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নিষিক্ত ডিম্ব থেকে। পড়! তোমার প্রতিপালক মহান দয়ালু! তিনি মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন কলমের। আর শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।' অর্থাৎ মানুষকে জ্ঞানী করা, মুক্তবুদ্ধি চর্চার মাধ্যমে মানুষকে অবিদ্যা থেকে মুক্ত করাই কোরআনের উদ্দেশ্য।

কোরআন জানা ও মানা–দুটিই ফরজ

আমাদের দীর্ঘদিনের একটি ভুল ধারণা যে, জানার পর না মানলে গুনাহ বেশি। আর না জানলে দায়মুক্ত থাকতে পারবো যে, আমি তো জানি না। আসলে জানা এবং মানা দুটিই ফরজ। জানলে একটা ফরজ আদায় হবে, মানলে আরেকটি ফরজ আদায় হবে। অর্থাৎ না মানলে একটা ফরজ লঙ্ঘন হচ্ছে ঠিকই কিন্তু যদি না জানেন এবং না মানেন তাহলে দ্বিগুণ গুনাহ। অতএব অজ্ঞতা হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বড় ফাঁদ। আর কোরআন না জানা হচ্ছে মানবজীবনের সবচেয়ে বড় গুনাহ। যে কারণে নবীজী বলেছেন, 'জ্ঞানযুক্ত অল্প আমলও অনেক উপকারী, অজ্ঞতামিশ্রিত অনেক আমলও নিষ্ফল হয়ে যায়'।

সুখী জীবনের ম্যানুয়াল ॥ কোরআন

এক কথায় কোরআন হলো সুখী জীবনের ম্যানুয়াল। কোরআন বুঝে অনুসরণ করার জন্যে কারো বিশেষজ্ঞ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যে-কেউ কোরআন পাঠ করে বা শুনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। কেননা ম্যানুয়ালের প্রকৃতিই হলো এমন যে, এটি তৈরি করা হয় সবচেয়ে সহজ ভাষায় যাতে যেকোনো মানুষ এটি বুঝতে পারে এবং অনুসরণ করতে পারে।

কোরআনের চ্যালেঞ্জ

কোরআনের অনুসরণ মানুষকে ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত সুপ্রতিষ্ঠিত করবে–এটি কোরআনের চ্যালেঞ্জ। কোরআন অনুসরণ করে খুব অল্প সময়ের মধ্যে নবীজী (স)-এর অনুসারীরা রূপান্তরিত হন অনন্য মানুষে, কোরআন নাজিল হওয়ার ৩০ বছরের মধ্যে তৎকালীন দুই পরাশক্তি রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য জয় করেন তারা। অথচ এ আরবরাই ছিলো কুসংস্কার শোষণ অবিদ্যা নৈতিক অবক্ষয়ের চরম পর্যায়ে। তারা ছিলো ৩৬০টি গোত্রে বিভক্ত এবং পরস্পর বিবাদমান। আর এ আরবরাই কোরআনের অনুসারীতে রূপান্তরিত হয়ে পরিণত হন শক্তিমান ও সঙ্ঘবদ্ধ এক জাতিতে। সৃষ্টি করেন নতুন বিশ্বাস, নতুন মানবিকতা, নতুন এক আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা।

কোরআনের আবেদন শাশ্বত

কোরআনের শাশ্বত আবেদন প্রসঙ্গে গুরুজী বলেন, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর কোরআন নাজিল হওয়ারও আগে যুগে যুগে যত নবী-রসুল এসেছেন, তাদের মাধ্যমে মানবজাতির হেদায়েতের জন্যে যত বাণী আল্লাহ পাঠিয়েছেন এর সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ রূপ হচ্ছে কোরআন। আপনি কোরআন যত পড়বেন তত জীবনের সহজ সত্যকে উপলব্ধি করবেন। কারণ এর আবেদন শাশ্বত। মুক্তমন নিয়ে আপনি যত শুনবেন তত এ সত্যকে অনুধাবন করতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, কোরআন সার্বজনীন এক মহাগ্রন্থ। কোরআন কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ নয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ভাষা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের অধিকার রয়েছে এটি পাঠ করা, শোনা, চর্চা করা ও অনুধাবন করার। আরবি বোঝেন বা না বোঝেন, কোরআন তেলাওয়াত শোনার প্রাথমিক প্রাপ্তি হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক নিরাময়।

তৃতীয়ত, কোরআন ইসলামের ভিত্তি। আর নবীজী (স)-এর সমগ্র জীবন কোরআনের শিক্ষারই বাস্তব রূপ।

গভীর ধ্যানেই এর উপলব্ধি সম্ভব

কোরআন নাজিল হওয়ার সময় রসুলুল্লাহ (স) অবস্থান করতেন ধ্যানের এক বিশেষ স্তরে। যেহেতু কোরআন নাজিল হয়েছে ধ্যানের স্তরে, এর মর্মার্থ উপলব্ধি করার জন্যেও প্রয়োজন গভীর ধ্যান বা নিবিষ্ট মনোযোগ। ধ্যানের স্তরে কোরআন শোনার অনুরণনই সৃষ্টি করে কোরআনকে মানার আকুতি। এ জন্যেই আল্লাহ ধ্যানকে বর্ণনা করেছেন জ্ঞানীদের সিফাত বা গুণ হিসেবে। কোরআনের পরতে পরতে আল্লাহ মানুষকে বলেছেন–দেখ, ভাবো, চিন্তা করো। সূরা আলে ইমরানের ১৯০-১৯১ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, '.....তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয় এবং বলে হে আমার প্রতিপালক, তুমি এই সব অনর্থক সৃষ্টি কর নি।'

সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায়

আখেরি দোয়ায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায় প্রসঙ্গে গুরুজী বলেন, সমাজের একটা বড় নির্ভরতা হচ্ছে এর অর্থনীতি। আর অর্থনীতিকে গতিশীল করাই যাকাতের লক্ষ্য। কোরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী সঙ্ঘবদ্ধভাবে যদি যাকাত আদায় করা হয় তাহলে যেকোনো সমাজে ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে যাকাত গ্রহণ করার মতো কেউ থাকবে না। কারণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায় অর্থনীতিতে এই মাত্রার গতিশীলতা সৃষ্টি করবে। এ কারণেই কোরআনে যতবার সালাতের কথা বলা হয়েছে প্রায় ততবার যাকাত আদায়ের তাগিদ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশনা থেকেই অনুধাবন করা যায় যথাযথভাবে যাকাত আদায়ের গুরুত্ব, কর্মের গুরুত্ব এবং সেইসাথে প্রাচুর্যবান হওয়ার গুরুত্ব।

কোরআনের জ্ঞান এভাবেই মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে করতে পারে আলোকিত আর সাফল্যমণ্ডিত। আর এই জ্ঞান অর্জনকে আমাদের জন্যে সহজ করে দিতে এই রমজানে প্রকাশিত হয়েছে আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী (আমপারা ও সপ্ত সূরা) পুস্তিকা ও অডিও সিডি।

কোরআনের বাণীকে নিজের জীবনে ধারণ করতে কোরআনের মর্মবাণী বার বার পাঠ করার ও শোনার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় গুরুজী। সেইসাথে চারপাশের মানুষের সমস্যা জর্জরিত জীবনে কোরআনের রহমত আর শেফার পরশ ছড়াতে যত বেশি সম্ভব বিতরণ করার আহবান জানিয়েছেন এ পুস্তিকা ও সিডি।

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : অনেককে বলতে শুনেছি, দিনে নিয়মিত দুই পেগ হার্ড ড্রিংকস খেলে শরীর ভালো থাকে। এটা কি সত্য?

উত্তর : হার্ড ড্রিংকস খেয়ে শরীর ভালো থাকলে আল্লাহ এটাকে আমাদের জন্যে হালাল করে দিতেন। কারণ সেই জিনিসগুলোই হালাল যা আমাদের শরীরের জন্যে উপকারী আর হারাম সেই জিনিসগুলো যা শরীরের জন্যে ক্ষতিকর। শরীরের জন্যে ক্ষতিকর বলেই এটাকে হারাম করা হয়েছে।

একইভাবে এনার্জি ড্রিংকস, সফট ড্রিংকস এগুলোও এই ক্যাটাগরির মধ্যেই পড়ে। একমাত্র ঘরে তৈরি করা ফলের রস ছাড়া অন্যান্য যত ধরনের কৃত্রিম পানীয় আছে, হোক তা হার্ড অথবা সফট বা এনার্জি ড্রিংকস–এগুলো সবই সমানভাবে ক্ষতিকর। অতএব এগুলো পুরোপুরি বর্জনীয়।

মনে রাখবেন, এই হার্ড ড্রিংকস, এনার্জি ড্রিংকস কোল্ড ড্রিংকস-এর চেয়ে আপনার প্রস্রাবও আপনার জন্যে অনেক নিরাপদ। একবার ইসরাইলীরা জর্ডানে ফিলিস্তিনি ক্যাম্পের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করেছিলো। এমনভাবে আক্রমণ করেছিলো যে, ওখানে খাবার পানির তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়েছিলো। তখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) পরামর্শ দিয়েছিলো যে, পানি না পাওয়া পর্যন্ত একজন মানুষ যদি তার নিজের প্রস্রাব পান করে, এতে তার পানির তৃষ্ণা মিটবে এবং এটা তার জন্যে ক্ষতিকর হবে না। এবং এটি প্রচারও করা হয়েছিলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পানি না পাচ্ছেন, আপনার প্রস্রাব পান করুন।

অতএব আপনার প্রস্রাবও আপনার জন্যে নিরাপদ এই হার্ড ড্রিংকস, এনার্জি ড্রিংকস, কোল্ড ড্রিংকস, সফট ড্রিংকসের চেয়ে। আমরা আসলে চারপাশের মানুষের নেতিবাচক কথা দ্বারা প্রভাবিত হই। কিন্তু মানুষের ভালো কথা দ্বারা প্রভাবিত হই না। যারা বলছেন যে, এসব পানীয় আপনার জন্যে ক্ষতিকর–তাদের কথায় আমরা প্রভাবিত হচ্ছি না। যারা বলছে যে, এসবে উপকার আছে–তাদের কথা বিশ্বাস করছি। কিছু কিছু মানুষ সবসময় দুর্ভোগে ভোগে, দুর্ভাগ্য তাদের পিছু ছাড়ে না। কারণ, তারা সবসময় প্রতারক ভণ্ড এবং স্বার্থপর মানুষদের কথা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

আসলে মানুষের প্রতি আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের মমতা, ভালবাসা অসীম। আল্লাহ যে মানুষের প্রতি কী পরিমাণ মমতাময় এবং ক্ষমাশীল–তা এত নেয়ামত ভোগ করার পরও যদি আমরা না বুঝি তাহলে বুঝতে হবে যে, আমাদের বোধশক্তি কাজ করছে না। তাই আল্লাহ-নির্ধারিত হালাল এবং হারাম বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে আমাদের নিজেদের কল্যাণেই। এক্ষেত্রে কে কী বললো তাতে কান না দেয়াই মঙ্গলজনক।

প্রশ্ন : নিজেকে সমর্থন দেয়ার জন্যে অনেক ধূমপায়ী একধরনের সিগারেট পান করে। তারা বলে, এটা নাকি বিভিন্ন মশলা দিয়ে তৈরি এবং অন্যান্য সিগারেটের মতো এটা ক্ষতিকর নয়। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর : এটি যদি সিগারেট হয় এবং নেশাকারক হয় তবে তা সবসময় হারাম। অর্থাৎ মাদক জাতীয়, নেশা জাতীয় যত দ্রব্য আছে সবটাই হারাম। আমরা আসলে অনেক কিছুকে ন্যায্যতা দেয়ার জন্যে অনেক কিছু করি। মানুষ ভুল করে এই জায়গায়। ভুলটাকে সত্য প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। ভুল স্বীকার ও অনুশোচনা করে, সে ভুল পুনরায় না করে সঠিক কাজটি করাই হচ্ছে মানুষের কর্তব্য।

এখন বলাই হচ্ছে যে, ধূমপান বিষপান। অর্থাৎ এটা কতটা প্রমাণিত হলে সিগারেট কোম্পানি লিখতে বাধ্য হচ্ছে যে, ধূমপান মৃত্যু আনে! ইউরোপ আমেরিকায় ধূমপান অনেক কমে গেছে। সমস্ত সিগারেট এখন ডাম্পিং হচ্ছে আমাদের তৃতীয় বিশ্বে।

প্রশ্ন : আমার স্বামী অনেকদিন ধরে অসুস্থ। খিটখিটে মেজাজী এবং নেতিবাচক মানুষ। তার আসলে শারীরিক তেমন কোনো অসুস্থতা নেই। দৈনন্দিন জীবনাচার এবং খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করলেই সে সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু আমার কোনো কথাই সে শুনতে চায় না, মানতেও চায় না। উপরন্তু কারণে অকারণে সে আমাকে অভিশাপ দেয়। আমি কী করতে পারি?

উত্তর : আপনি প্রতিদিন দুবার আপনার স্বামীকে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসবেন। তাকে যে কত ভালবাসেন এটা বলবেন। বলার সময় আপনাদের যত সুখের স্মৃতি আছে সেগুলো স্মরণ করবেন। স্বামীর প্রতি গভীরভাবে ভালবাসা এবং মমতা অনুভব করবেন। সম্পর্কের গভীরতাকে অনুভব করবেন।

কমান্ড সেন্টারে স্বামীকে নিয়ে এসে তাকে প্রেমিক মনে করে কথা বলবেন। কারণ প্রেমিক বা প্রেমিকার সাথে কথা অনেক নমনীয় হয় আর স্বামী-স্ত্রীর সাথে কথা হয় সরাসরি। ভাবি যে, আমারই তো স্ত্রী বা আমারই তো স্বামী। আসলে বিষয়টা সেরকম নয়। তাই প্রতিদিন দুবার তাকে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসুন। তাকে অনুভব করুন এবং তার জন্যে দোয়া করুন। আসলে পরস্পরের জন্যে এই দোয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী। আমরা প্রত্যাশা করি, আপনারা বিষয়গুলো অতিক্রম করতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমার লক্ষ্য হচ্ছে, এক নম্বর ধ্যানী জ্ঞানী ও ধনী হয়ে এমন কিছু ভালো কাজ করা যার কার্যকারিতা কেয়ামতের আগ পর্যন্ত থাকবে।

উত্তর : আসলে ধ্যানী এবং জ্ঞানী হওয়ার ক্ষেত্রে আপনি কখনো এক নম্বরে পৌঁছতে পারবেন না। ধনীদের নাম্বারিং আছে। কারণ, ধন মাপা যায়। কিন্তু ধ্যান এবং জ্ঞান কখনো মাপা যায় না। এটা মাপার কোনো মানদণ্ডও নেই। তাই আপনি কখনো এখানে এক নম্বরে যেতে পারবেন না। যখনই আপনি এক নম্বর ধ্যানী এবং জ্ঞানী হওয়ার জন্যে প্রতিযোগিতা করবেন, দিন দিন আপনার মূর্খতা বাড়তে থাকবে।

আপনি যদি সত্যিকারের ধ্যানের রাজ্যে, জ্ঞানের রাজ্যে যেতে চান, যত গভীরে যাবেন–পেঁয়াজের যে-রকম একটা পরত খুললে আরেকটা পরত বের হয় সেরকম ধ্যান এবং জ্ঞান পরতে পরতে খুলতে থাকবে। এর কোনো নির্ধারিত সীমানা নেই। যত আপনি জানবেন তত আপনি বুঝতে পারবেন, কত কিছু যে জানার বাকী থেকে যাচ্ছে। অন্যদিকে যত কম জানবেন তত নিজেকে আপনি এক নম্বর জ্ঞানী মনে করবেন। এবং প্রত্যেক আহাম্মকই নিজেকে জ্ঞানের রাজ্যে এক নম্বর মনে করে।

অতএব ধ্যানী বা জ্ঞানী হওয়ার ক্ষেত্রে এক নম্বর হওয়াটা লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, আমি ধ্যান এবং জ্ঞানের মাধ্যমে নিজেকে উপলব্ধি করবো। নিজেকে বোঝার চেষ্টা করবো। নিজের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবো নিজের ও মানুষের কল্যাণে। তাহলে সম্ভাবনা আছে যে, আপনি একটা স্তরে পৌঁছতে পারবেন। নাম্বারিংয়ের চিন্তা করবেন না। একটা স্তরে পৌঁছতে পারাটাই অনেক বড় সাফল্য।

প্রশ্ন : নিরাময়ের মেডিটেশনে কি আমি সব সমস্যা সমাধানের মনছবি একসাথে করবো নাকি একটার পর একটা নিরাময় কামনা করবো? দয়া করে জানাবেন।

উত্তর : সবসময় মনে রাখবেন যে, সমস্যাকে একটা একটা করে ধরতে হয়। একাধিক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অনেকটা সেরকমই। তাই রোগ নিরাময় করতে হবে একটা একটা করে আর শুরু করতে হবে সেটা দিয়ে যা সহজে নিরাময়যোগ্য। ফলে ছোটখাটো রোগের হিলিং করে যখন দ্রুত নিরাময় হয়ে যাবেন তখন আপনার ভেতরের শক্তি আর বিশ্বাস বাড়তে থাকবে।

এরপর বড় রোগটাকে ধরবেন তারপরে তার বড়টাকে। অর্থাৎ যতগুলো রোগ থাকুক সবসময় একটা একটা করে ধরবেন এবং একটাতে যখন দেখছেন যে অগ্রগতি হচ্ছে তারপরে দ্বিতীয় এবং তারপরে তৃতীয়টা। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে একটা রোগের নিরাময় শুরু করলে অন্যগুলো নিরাময় হয়ে যায়। তবে নিরাময় করবেন একটা একটা করে।

প্রশ্ন : গুরুজী, আপনি সবসময় পারিবারিক সেতুবন্ধনের কথা বলেন কিন্তু যারা সরলতার সুযোগ নিয়ে ঠকায় তাদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? আমার ছোটবোন শেয়ার ব্যবসা করে এবং তার স্বামী চাকরিজীবী। ওদের আর্থিক কোনো সমস্যা নেই। আমি পড়াশোনা করি। বাসা থেকে আমাকে যে হাতখরচ দেয় তা দিয়ে আমি চলি। আমার বোন নিজের টাকা জমায় আর বিভিন্ন প্রয়োজনে আমার টাকা খরচ করে। উপরন্তু আমারই বদনাম করে। আমাকে সবসময় টেনশনে রাখার এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা তার। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বলি না। এ অবস্থায় পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় থাকতে পারে কি? আমাকে শোষণ করা কেন, দয়া করে উত্তর দেবেন।

উত্তর : আপনার দুর্দশার কারণ হচ্ছে আপনার বোকামি। আসলে সরলতা এবং বোকামি কিন্তু এক জিনিস নয়। বোনের সাথে ঝগড়া করার প্রয়োজন নেই। আপনাকে বুঝতে হবে যে, আপনার কাছে টাকা চাওয়া আপনার বোনের স্বভাব। আপনি বুদ্ধি প্রয়োগ করুন কীভাবে বিষয়টিকে এড়ানো যায়। তাহলে আপনাকে কেউ ঠকাতে পারবে না। আর সবসময় ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্ম থাকুন, মেধাকে শাণিত করার চেষ্টা করুন–আপনি শোষিত হবেন না এবং আপনি কাউকে শোষণও করবেন না।

এ মাসের অটোসাজেশন

নিয়মিত মেডিটেশনে
আমার চেতনা মুক্ত হবে
সকল শৃঙ্খল থেকে।

‘আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী’ পুস্তিকা বিতরণের অনুভূতি

‘লক্ষ্য ছিলো তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছানো’

শ্রদ্ধেয় গুরুজীর গ্রন্থনায় ‘আল কোরআন ॥ বাংলা মর্মবাণী’ (আমপারা ও সপ্ত সূরা) পুস্তিকা ও সিডি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয় ২৮ জুন প্রো-মাস্টার্স ওয়ার্কশপে। এর পূর্বে ২৪ জুন শবেবরাতে কোয়ান্টাম ওয়েবসাইটে এটি আপলোড করা হয়। এর পর পুরো রমজান মাস কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা আল কোরআনের বাংলা মর্মবাণী নিজেরা চর্চা করেছেন এবং পৌঁছে দিয়েছেন চারপাশের লাখো মানুষের কাছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কোরআনের মর্মবাণী পরিচিত পরিমণ্ডলে পৌঁছে দিতে পেরে হৃদয়ে অনুভব করেছেন পরম তৃপ্তি। সুদৃশ্য প্রচ্ছদ আর সচ্ছন্দে সবসময় সাথে রাখার মতো বাংলায় কোরআনের ৪৬টি সূরার মর্মবাণীসমৃদ্ধ এ পুস্তিকাটি হাতে পাওয়ার পর গ্রহীতাদের কৃতজ্ঞদৃষ্টি বিতরণকারীদের উৎসাহকে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। ঈদের উপহার হিসেবেও আত্মীয়স্বজনদের বিতরণ করেছেন এ পুস্তিকা। বিতরণকারীদের নানা অনুভূতি নিয়েই আমাদের এবারের আয়োজন।



অধ্যাপক নিলুফার আখতার

ঢাকা কলেজ-এর পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট নিলুফার আখতার পুস্তিকা বিতরণ প্রসঙ্গে বলেন, আমার লক্ষ্য ছিলো তরুণ প্রজন্মের কাছে যত বেশি সম্ভব কোরআনের বাণী পৌঁছে দেয়া। মূলত পুস্তিকার উৎসর্গপত্রের গুরুজীর লেখাটাই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে যে, ‘মুক্তমনে সত্য জানতে আগ্রহী নতুন প্রজন্মকে’। দীর্ঘদিন অধ্যাপনার সাথে জড়িত থাকায় তরুণদের কাছে পৌঁছানোর কাজটা সহজ হয়েছে। সহকর্মীরাও সহায়তা করেছেন আন্তরিকভাবে।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অনেক শিক্ষার্থীও উৎসাহ নিয়ে সংগ্রহ করেছে কোরআনের মর্মবাণী। পুরো কাজটায় অন্যরকম এক তৃপ্তি পেয়েছি। আর পবিত্র রমজানে এরকম কল্যাণময় একটা কাজে শরিক হতে পারাটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সৌভাগ্যের।



তসলিম উদ্দীন মাহমুদ

চট্টগ্রামে বসবাসরত ৩৩০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ব্যবসায়ী তসলিম উদ্দীন মাহমুদ বলেন, এ পর্যন্ত অনেকগুলো কোরআনের বাংলা মর্মবাণী বিতরণ করেছি। লামায় পয়লা রমজানের প্রোগ্রামে কোরআন বিতরণে দারুণ উজ্জীবিত হই এবং চট্টগ্রামে ফিরেই পুস্তিকা সংগ্রহ করি। পুস্তিকা নিয়ে যার কাছেই গিয়েছি প্রতিমুহূর্তে আল্লাহর রহমত অনুভব করেছি। স্রষ্টার কাছে শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে কোরআনের বাণী ছড়িয়ে দেয়ার মতো এত চমৎকার একটি কাজের সাথে যুক্ত করেছেন।

ন্যাশনাল কলেজ-এ ব্যবহারিক শিল্পকলা–বিষয়ে সম্মান ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী ৩২৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ফাতিমা জাহান মীম বলেন, ফাউন্ডেশন থেকে আল কোরআনের মর্মবাণী বিতরণের আহ্বান শুনেই, আমি নিঃসংকোচে বিতরণের কাজ শুরু করলাম। বিশ্বাস নিয়ে কোরআন পাঠের কথা বলতে লাগলাম চারপাশের সবার কাছে। পরিচিত অনেকে মর্মবাণী পাঠের পর আগ্রহী হয়ে উঠেছেন কোয়ান্টাম মেথড-এর ব্যাপারেও, যা আমাকে আরো অনুপ্রাণিত করেছে। স্রষ্টার বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয়ার যে কাজ নবী-রসুলরা করেছেন, সেরকম একটি কাজ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।



ফাতিমা জাহান মীম

দিনাজপুরে বসবাসরত ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট চাকরিজীবী ফণিরঞ্জন সরকার আকাশ বলেন, রমজানে আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী’র পুস্তিকাটি হাতে পেয়েই মনে হয়েছে, এটি বিতরণের কাজে আমি সক্রিয়ভাবে অংশ নেবো। বিতরণের ক্ষেত্রে যাকেই বলেছি আগ্রহ করে নিয়েছেন। আমি মনে করি প্রতিটি ধর্মের শিক্ষাই হলো মানুষকে আলোকিত করা। আমার মাধ্যমে কোরআনের মর্মবাণী পাঠ করে যদি একজন মানুষও উপকৃত হন, সৎপথে আসেন, সেটাই আমার জন্যে অনেক বড় পাওয়া। মূলত এই অনুপ্রেরণা থেকেই পুস্তিকা বিতরণ করে যাচ্ছি।



ফণিরঞ্জন সরকার আকাশ



জিশান আরা

১৬৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট গৃহিণী জিশান আরা বলেন, আল কোরআনের মর্মবাণী পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই অনুভব করছি এর আকর্ষণী ক্ষমতা। যাকেই বলছি, আগ্রহ করে নিয়েছেন। ভালোলাগার যেকোনো জিনিস অন্যদের দিতে ইচ্ছে করে, এটাই স্বাভাবিক। আল কোরআনের মর্মবাণী নিজে যত পড়ছি তত উৎসাহ বাড়ছে যে, আরো কত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া যায়। আমার বিশ্বাস আল কোরআনের মর্মবাণী যত বেশি আমরা বিতরণ করতে পারবো তত সহজ হবে কল্যাণের এই জ্ঞান নিজের মধ্যে ধারণ করা।

১৩৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ব্যবসায়ী ইব্রাহীম খলিল মন্টু বলেন, এ পর্যন্ত যতগুলো করসেবায় অংশ নিয়েছি, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আনন্দ আর তৃপ্তি পেয়েছি আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী বিতরণের কাজে। শাখা থেকে আমরা ৭-৮ জনের একটি টিম একসাথে কাজ করেছি। টিমের প্রত্যেকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অনেক সংখ্যক পুস্তিকা বিতরণ সম্ভব হয়েছে।



ইব্রাহীম খলিল মন্টু

কাজ করতে গিয়ে কোনো প্রতিকূলতা অনুভব করি নি বরং কোরআনের কথা বলতেই সবাই কৃতজ্ঞতার সাথে নিয়েছেন। এমনও হয়েছে যে, দিতে গিয়েছি একজনকে কিন্তু চারপাশের সবাই আগ্রহ নিয়ে ছুটে এসেছেন। ফাউন্ডেশনের প্রতিটি কাজেই আমি সাধ্যমতো সম্পৃক্ত থাকার চেষ্টা করি শুধু স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যেই।

খুলনার ফুলতলা এম এম কলেজ-এর ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক, ১৭৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ফিরোজা আক্তার বানু বলেন, রমজানে আখেরি দোয়ায় শরিক হয়ে উপলব্ধি করি, কোরআনের মর্মবাণী বিতরণের কাজটি স্রষ্টার কত পছন্দের! কেননা এর মধ্য দিয়ে আমরা নিজেরা কোরআন সম্পর্কে জানতে পারছি আবার অন্যদেরও সুযোগ করে দিচ্ছি কোরআনের জ্ঞান অর্জনে। শারীরিক সুস্থতার নিয়তে বহু পুস্তিকা বিতরণ করেছি এবং আমি এখন অনেকটা সুস্থ। আমার বিশ্বাস কোরআনের বাণী ছড়িয়ে দেয়ার এ কাজে একাত্ম হবার কারণেই স্রষ্টা আমাকে নিরাময় করেছেন।



ফিরোজা আক্তার বানু



ডা. হামিদ ইবনে আব্দুল্লাহ

৩৫১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ডা. হামিদ ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, কাউকে ভালো কাজে উৎসাহিত করলে আল্লাহ সেই সওয়াব উৎসাহদাতাকেও দেন সমানভাবে। তেমনি মনে হয়েছে আমার উৎসাহে যদি আরেকজন মানুষ কোরআনের অর্থ বুঝতে আগ্রহী হয়, নিশ্চয়ই এর বিনিময়ও স্রষ্টা আমাকে দেবেন একইভাবে। সেন্টার ও সেল থেকে টিমের সাথে কোরআনের মর্মবাণী বিতরণ করেছি আবার ব্যক্তিগতভাবেও করেছি। ভালো লেগেছে যখন পরিচিতরা একটি পুস্তিকা নেয়ার পর নিজেরাই যোগাযোগ করে আরো পুস্তিকা নিয়ে গেছেন। অনেকেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন যে, সূরাগুলোর বাংলা অর্থ অনুভব করার মধ্য দিয়ে নামাজে মনোযোগ আর তৃপ্তি বেড়েছে বহুগুণে।

ঈদ মোলাকাত ২০১৩

আনন্দ আলো ছড়িয়ে যাক চারপাশে ৪০ ঘরে





ঈদুল ফিতরের আনন্দকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে কোয়ান্টাম পরিবার প্রতিবছর আয়োজন করে ঈদ মোলাকাতের। এতে গুরুজী ও মা-জী কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য ও অতিথিদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এবছর ৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত ঈদ মোলাকাতে ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি হল পরিণত হয় কোয়ান্টাম পরিবারের মিলনমেলায়।

নির্ধারিত সময় সকাল ১০টার পরিবর্তে এবারই প্রথম গুরুজী ও মা-জীর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ মেলে সকাল সাড়ে ৯টা থেকেই। অপেক্ষমাণ পুরুষ ও মহিলা অতিথিদের পৃথক দুটি সারি আইডিইবি ভবনের চত্বর ছাড়িয়ে চলে যায় পার্শ্ববর্তী রাস্তা পর্যন্ত। গত বছরের মতো এবারও প্রবীণ অতিথিদের জন্যে ছিলো পৃথক সারির ব্যবস্থা। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর ছিলো আপ্যায়ন পর্ব।

পুরো অনুষ্ঠানটি কয়েকটি প্রজেক্টরের মাধ্যমে হলের ভেতরে ও বাইরে অপেক্ষমাণ অতিথিরা উপভোগ করেন। ঈদ মোলাকাত এত সুশৃঙ্খল আর সুন্দর করার নেপথ্যে ছিলেন এক ঝাঁক উদ্যমী কোয়ান্টিয়ার, যারা হাসিমুখে নিরন্তর সেবা দিয়ে গেছেন আগত অতিথিদের।

ঈদ মোলাকাতে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার ও অতিথিরা এসেছেন সপরিবারে। ঢাকার বাইরে থেকেও অনেকেই এসেছেন গুরুজী ও মা-জীর সান্নিধ্যে ঈদ উদযাপন করতে।

এবার ঈদ মোলাকাতে আইডিইবি ভবনের ভেতরে প্রবেশ করেই কিছুটা চমকে যেতে হয়েছে ইট-পাথরের দালানের মাঝে টলটলে পানির ছোট্ট লেক দেখে। লেকের পানিতে ফুটে থাকা শাপলা যেন হাসছে। এই লেক পেরিয়েই গুরুজীর সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতে হবে। স্বস্তি মেলে পারাপারের জন্যে কাঠের সাঁকোটা দেখে। অভিনব এই অভ্যর্থনার ধরন সবাই বেশ উপভোগ করেন। সাঁকো পেরিয়ে এক পাশে দিগন্ত প্রসারিত আকাশে নানা রঙের মেঘের খেলা। আরেকপাশে এক পশলা সবুজ আর সবুজের বুক চিরে বয়ে গেছে পাহাড়ি ঝর্না। আলোর চমৎকার প্রতিফলন ভালো করে না দেখলে মনে হয় ঝর্নার পানিতে রৌদ্র ছায়ার লুকোচুরি।

ওদিকে হলের ভেতরে স্টেজের বিশাল দেয়াল ছিলো যেন সূর্য ওঠার আগ মুহূর্তের সোনালী আকাশ। একপ্রান্তে ত্রিমাত্রিক অবয়বে আরোগ্যশালার মঞ্চ। সোনা রঙা আকাশের বুকে লেখা–'আনন্দ আলো ছড়িয়ে যাক চারপাশে ৪০ ঘরে'।

বিনোদনের নামে বোকাবাক্সের বন্দিত্ব আর আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে ঈদের আনন্দকে চারপাশের সবার সাথে ভাগ করে নেয়ার জন্যেই কোয়ান্টামের এবারের ঈদ বার্তা–'আনন্দ আলো ছড়িয়ে যাক চারপাশে ৪০ ঘরে'। এই শুভবার্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা ঈদ মোলাকাতের পর অনেকেই বেরিয়ে পড়েন প্রতিবেশী, আত্মীয় আর বন্ধুদের বাসার উদ্দেশ্যে।

যান্ত্রিক সময়ের আবর্তে ঈদের এই অমলিন আনন্দ আর হৃদ্যতার জন্যেই ঈদ মোলাকাত পরিণত হয়েছে কোয়ান্টাম পরিবারের প্রাণের উৎসবে।

এশিয়ান যুব আরচ্যারিতে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল

১ থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত এশিয়ান আরচ্যারি ফেডারেশনের কারিগরি সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হলো 'ন্যাশনাল আর্চার টেকনিক্যাল কোচিং কোর্স'। আর্মি এভিয়েশনের আরচ্যারি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত মাসব্যাপী এ ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশ নেয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, আনসার, বিজিবি, বিকেএসপির পাশাপাশি কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের তিন জন কোয়ান্টা পেননয় মুরং, ভানরুম বম ও আরিফুল ইসলাম।

সারাদেশ থেকে বাছাইকৃত ৪৮ জন আর্চার নিয়ে কোরিয়ান কোচ কিম জং হো-এর অধীনে মাসব্যাপী এ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। যুব আর্চার পুরুষ বিভাগে চূড়ান্ত বাছাইয়ে পাঁচ জনের মধ্যে পেননয় মুরং ও ভানরুম বম নির্বাচিত হয়। প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যুব আর্চার বিভাগে পেননয় মুরং প্রথম স্থান অধিকার করে।

উল্লেখ্য, কোয়ান্টারা এ ক্যাম্পেই প্রথম রিকার্ভ আরচ্যারিতে খেলে অর্জন করে এ সাফল্য। এর পূর্বে ৮ম বাংলাদেশ গেমসে তারা অংশ নিয়েছিলো ব্যাম্বো বো আরচ্যারিতে। এতে সারাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তিন জন চূড়ান্তভাবে বাছাই হয়েছে–তাদের মধ্যে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের পেননয় মুরং একজন। অক্টোবর-নভেম্বরে চীন ও চাইনিজ তাইপেতে এশিয়ান যুব আরচ্যারি ও বিশ্ব যুব অলিম্পিকের কোয়ালিফায়িং রাউন্ডে অংশ নেবে তারা।

৩০ জুলাই প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের সমাপনী অনুষ্ঠানে আর্চারদের মাঝে সার্টিফিকেট প্রদান করেন আরচ্যারি ফেডারেশনের সভাপতি লে. জেনারেল মো. মইনুল ইসলাম। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন আর্মি এভিয়েশনের প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আবদুল হামিদ।



পুরস্কার গ্রহণ করছে যুব আর্চার বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারী কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর কোয়ান্টা পেননয় মুরং

কোয়ান্টাম বুলেটিন : সেপ্টেম্বর ২০১৩ ॥ সম্পাদক : কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 8319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858 ■

E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন

আমি এক অনন্য মানুষ
আমরা এক মহান জাতি

অক্টোবর ২০১৩

‘পারিবারিক সমস্যা উত্তরণ’ ওয়ার্কশপ নভেম্বরে

১ নভেম্বর ঢাকার আইডিইবি মিলনায়তনে গুরুজীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হবে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ। আসন সীমিত। দ্রুত নাম রেজিস্ট্রেশন করুন।

প্রথমায়ন-এর শততম ব্যাচ নভেম্বরে

৮ ও ৯ নভেম্বর ঢাকার কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জীবনে সফল হওয়ার পথ প্রথমায়ন কার্যক্রম-এর শততম ব্যাচ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সফল জীবনের পথে চলার দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং ফাউন্ডেশনে সৃষ্টির সেবামূলক কাজে আগ্রহী কোয়ান্টিয়ারদের মেধার বিকাশ, দক্ষ ও চৌকস করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মে ২০০৮ থেকে ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমানের পরিচালনায় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতি মাসে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এই প্রথমায়ন কার্যক্রম।

কোয়ান্টাম প্রকাশনা নিয়মিত পড়ুন

কোয়ান্টামের আলোকিত চেতনাকে নিজের জীবনে ধারণ করতে ও চারপাশের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে নিয়মিত কোয়ান্টাম প্রকাশনা পড়ুন। দৈনন্দিন জীবনের আচরণের ভুলভ্রান্তিগুলো দূর করতে ও নতুন পরিমণ্ডলে সুন্দর ও সঠিক আচরণ আয়ত্ত করতে প্রতিদিন অনুশীলন করুন শিষ্টাচার ১ ও ৪ কণিকা।

এছাড়া মেডিটেশন সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্নের উত্তর সাবলীলভাবে উপস্থাপন করার জন্যে নিয়মিত পড়ুন ‘হাজারো প্রশ্নের জবাব’ ১ম খণ্ডের ‘মেডিটেশন’ অধ্যায়টি।

অক্টোবরের কার্যক্রম

কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী কার্যক্রম
: ১১ ও ১২ অক্টোবর

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম
: ২৫ ও ২৬ অক্টোবর

কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রম
: ২৫ ও ২৬ অক্টোবর
পুরুষ – যাত্রাবাড়ি কার্যালয়
মহিলা – প্রশান্তি হল, শান্তিনগর

কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি কার্যক্রম
উত্তরা : ২৫ ও ২৬ অক্টোবর

কোয়ান্টাম বেসিক কম্পিউটিং প্রোগ্রাম
কোয়ান্টাম বেসিক হার্ডওয়্যার প্রোগ্রাম
: ৪, ৫, ৬ ও ৭ অক্টোবর
: ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ অক্টোবর

‘সাফল্যের চোরাবালি’ ওয়ার্কশপে গুরুজী

সন্তানকে দিন সঠিক জীবনদৃষ্টি



মা-বাবা হিসেবে সন্তানকে শুধু উপহার নয় তাকে প্রয়োজনীয় সময়, মনোযোগ ও মমতা দিতে হবে। পাঠ্যবইয়ের জ্ঞানের পাশাপাশি তাকে দিতে হবে সঠিক জীবনদৃষ্টি। এজন্যে আগে মা-বাবার সদাচারী ও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কারণ সন্তান সবসময় মা-বাবাকে অনুসরণ করে। তাকে যা করতে বলা হয় সেটি নয় বরং সে তা-ই করে, যা সে মা-বাবাকে করতে দেখে।

৬ সেপ্টেম্বর ‘সাফল্যের চোরাবালি’ শীর্ষক গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে কথাগুলো বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে চোরাবালিতে পড়ে যাই এবং এ থেকে উত্তরণের পথ নিয়ে দিনব্যাপী ওয়ার্কশপটি অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তনে।

ওয়ার্কশপে গুরুজী আরো বলেন, পরিবারে মা-বাবার প্রধান লক্ষ্য হলো, আমার সন্তান ভালো মানুষ হবে। ভালো হওয়ার জন্যে আমরা সন্তানকে বলি–ভালোভাবে পড়, মানুষ হও। আসলে মানুষ হওয়ার জন্যে সন্তানকে এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। ‘ভালো মানুষ’ কী, লেখাপড়ার উদ্দেশ্য কী–এই বিষয়গুলো ছোটবেলা থেকেই তাকে বোঝাতে হবে।

মা-বাবা হিসেবে ব্যর্থতার আরেকটি চোরাবালি হলো, সন্তানকে ভালো স্কুলে দিয়েই মনে করা যে, দায়িত্ব শেষ। কিন্তু ভালো মানুষ হওয়ার জন্যে শুধু স্কুল বা পাঠ্যবই যথেষ্ট নয়। কারণ, এখানে মানবীয় গুণাবলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ খুব কম।

তাই মা-বাবার করণীয় প্রসঙ্গে গুরুজী বলেন, সঠিক জীবনদৃষ্টি গঠনের জন্যে সন্তানকে মহামানবদের জীবনী, ধর্মগ্রন্থ, কোরআনের মর্মবাণী আমপারা ও সপ্তসূরা পড়তে অভ্যস্ত করুন। সন্তানের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলুন বন্ধুর মতো। তার সাথে গল্প করুন। আপনার পরিশ্রম আর কষ্টের কথা তাকে বলুন। তাহলে সে সমমর্মী হবে, অন্যায় অযৌক্তিক আবদার করা থেকে বিরত থাকবে।

সন্তানকে কখনো নিজের সম্পত্তি ভাবা যাবে না। সন্তান হলো মা-বাবার কাছে আল্লাহর আমানত। সন্তান লালন করতে হবে নিঃস্বার্থভাবে। তার জন্যে সবসময় দোয়া করা উচিত। তাহলে সন্তান কখনো মা-বাবার অবাধ্য হওয়ার চোরাবালিতে পড়বে না। মা-বাবাসহ সবার প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল হবে, ভালো মানুষ হবে।

পরিশেষে গুরুজী বলেন, সম্প্রতি আমাদের চারপাশে অনাকাঙ্ক্ষিত যে ঘটনাগুলো ঘটছে এর জন্যে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয় বরং সামগ্রিক পরিবেশেরই ইতিবাচক পরিবর্তন প্রয়োজন। আর এ লক্ষ্যেই যত বেশি সম্ভব আমাদের চারপাশের মানুষের কাছে প্রশান্তির বাণী পৌঁছে দিতে হবে। সবাইকে মেডিটেশন চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সঠিকভাবে সন্তান লালনের কথা, আলোকিত জীবনদৃষ্টির কথা পৌঁছে দিতে হবে ঘরে ঘরে।

সুস্থতার জন্যে প্রয়োজন মেডিকেশন ও মেডিটেশন

প্রফেসর ডা. জহির উদ্দিন আহমাদ



মানসিক নানা ধরনের সমস্যা নিয়ে যারা আমার কাছে আসেন, তাদের প্রেসক্রিপশনে আমি গুরুজীর লেখা ‘আত্মনির্মাণ’ বইটার কথা লিখে দেই। তাদের আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের কথা বলি। কারণ একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি জানি, শুধু ওষুধে কাজ হয় না। সুস্থতার জন্যে মেডিকেশন ও মেডিটেশন দুটোই প্রয়োজন। মেডিটেশন একজন মানুষের বিশ্বাসকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

আমার অনেক সহকর্মী খুব অবাক হয়ে বলেন, রোগীদের কোয়ান্টামে পাঠালে তারা তো আর চিকিৎসা করাতে আসবে না। আমি বলি, তাতে কী? আমি তো মানুষের উপকার করার জন্যে কাজ করছি। একজন মানুষও যদি আমার পরামর্শে মেডিটেশন করে সুস্থ হয়, ভালো থাকে, এটাই তো আমার জন্যে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

কোয়ান্টাম মেথডের সবচেয়ে ভালো দিক হলো, এটা যে কেউ খুব সহজেই চর্চা করতে পারে। মেডিটেশনের শুরুতেই যে দমচর্চা করতে হয় তা সুস্থতার জন্যে অত্যন্ত সহায়ক। আমার পরামর্শে অনেকে কোর্স করে ভালো আছেন। তারা পরে এসে বলেন, ‘আমার আর ঘুমের ওষুধ খেতে হয় না, আমি এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি’। অনেকে বলেন, ‘খুব বদরাগী ছিলাম, এখন সবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে পারি’।

এখানে এসে আমি নতুন অনেক কিছু শিখলাম। মনে হচ্ছে আমার ভেতরেও আত্মবিশ্বাসটা আবার নতুন করে জেগে উঠলো।

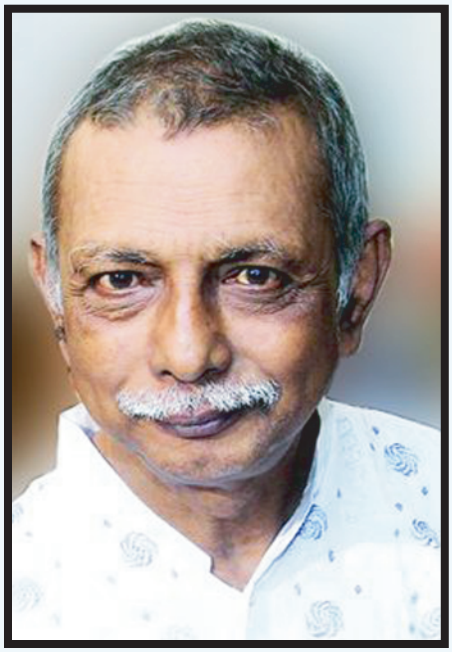
[প্রফেসর ডা. জহির উদ্দিন আহমাদ, মানসিক ও স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ, ইউনাইটেড হাসপাতাল লি.। কোয়ান্টাম মেথড ৩৬৬ ব্যাচের প্রত্যয়নে তিনি একথা বলেন]

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

৩৬৭ তম ব্যাচ
৪, ৫, ৬ ও ৭ অক্টোবর
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

৩৬৮ তম ব্যাচ
১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ নভেম্বর
(বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ও রবিবার)

নির্মোহ ও স্পষ্টভাষী সাংবাদিক
নাজিম উদ্দিন মোস্তান



নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা করেছিলেন। বিষয় ছিলো তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান। বিশিষ্ট লেখক ও কথাশিল্পী আহমদ ছফা সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না, পরদিন তিনি দৈনিক ইত্তেফাকে এর ওপর একটি প্রতিবেদন পড়লেন। এবং এতটাই আপ্লুত হলেন যে, তার মনে হলো, বাংলাদেশে এমন সাংবাদিকও আছেন–যিনি বিজ্ঞানের কঠিন তত্ত্ব এমন সহজ ভাষায় লিখতে পারেন! সেই রিপোর্টটি ছিলো নাজিম উদ্দিন মোস্তানের করা।

ছফার সেদিন মনে হয়েছিলো, এমন একজন 'কামেল' মানুষকে এখনই গিয়ে সালাম করে আসা দরকার, নইলে তাকে অপমান করা হবে। ছফা ছুটে গেলেন ইত্তেফাক অফিসে। মোস্তান তখন কিছু একটা লিখছিলেন। ছফা তার সামনে গিয়ে সালাম দিলেন, নিতান্তই সাধারণ বেশভূষার মানুষটির চোখের দিকে তাকিয়ে ছফার মনে হলো, এই চোখে আছে অন্যরকম কিছু একটা, যা সচরাচর চোখে পড়ে না। এমন আকস্মিক পরিচয় থেকে সূচিত হয়েছিলো যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব, সেটি অটুট ছিলো ছফার আমৃত্যু। আর মোস্তানকে ছফা উৎসর্গ করেছিলেন বাংলা কথাসাহিত্যে তার এক অসাধারণ সৃষ্টি 'পুষ্প বৃক্ষ ও বিহঙ্গ পুরাণ' বইটি।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় তিন দশক ধরে দৈনিক ইত্তেফাকের খ্যাতনামা রিপোর্টার, বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ, সাপ্তাহিক রাষ্ট্র পত্রিকার প্রকাশক-সম্পাদক, উদ্যমী সমাজকর্মী–এমনি বহুমুখী পরিচয় তার; কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত নাজিম উদ্দিন মোস্তানের পরিচয় হয়ে ওঠে একটাই–নির্মোহ, স্পষ্টভাষী ও ন্যায়নিষ্ঠ একজন সাংবাদিক।

গত ১৮ আগস্ট বিকেলে ঢাকার মিরপুরে সাংবাদিক কলোনীর নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন প্রথিতযশা এই সাংবাদিক। ইন্না লিল্লাহে .... রাজিউন। আমরা তার আত্মার অনন্ত প্রশান্তি কামনা করি।

কর্মজীবনের শুরু থেকেই নাজিম উদ্দিন মোস্তান সাংবাদিকতাকে গ্রহণ করেছিলেন মনেপ্রাণে, সর্বান্তকরণে। সেইসাথে কঠোর পরিশ্রম ও কর্তব্যনিষ্ঠা, গভীর দেশপ্রেম, গণমানুষের কল্যাণচিন্তা, অসাধারণ ক্ষুরধার লেখনী তাকে সাংবাদিকতার জগতে করে তুলেছিলো অনন্য, দিয়েছিলো এক বিশিষ্ট স্থান। সাংবাদিকতায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে রাষ্ট্রীয় একুশে পদকসহ একাধিক সম্মাননা ও পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি।

নাজিম উদ্দিন মোস্তান ছিলেন একজন আপাদমস্তক সার্বক্ষণিক সাংবাদিক। তার এক সহকর্মী সাংবাদিকের ভাষায়, 'মোস্তান ভাই যখন হাঁটতেন, মনে হতো কোনো সংবাদ সংগ্রহের জন্যে দৌড়ে চলেছেন। যখন রিকশায় চড়তেন, পারতপক্ষে একা চড়তেন না। পয়সা বাঁচানোর জন্যে নয়, বরং সত্যিকারের এক জাত সাংবাদিক বলেই তিনি এটা করতেন। তার উদ্দেশ্য থাকতো একজন অপরিচিত লোকের সাথে পরিচিত হওয়া, তারপর তার পেশা ও কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে জানা। বুঝতে চাইতেন, সেখানে কোনো সমস্যা আছে কি না; থাকলে এর শেকড় কোথায় এবং সমাধান কীভাবে হতে পারে। দেখা গেছে, এভাবেই তিনি পেয়ে যেতেন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের উৎস।'

একটা সময় দৈনিক ইত্তেফাকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার অসংখ্য সাড়াজাগানো ও আলোচিত রিপোর্ট, যাতে চমৎকার ভাষাশৈলী আর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উঠে এসেছে নানাবিধ সমস্যা ও এর সম্ভাব্য সমাধানের কার্যকর পন্থা এবং সমসাময়িক বিচিত্র বিষয়ের আদ্যোপান্ত।

নাজিম উদ্দিন মোস্তান ইত্তেফাকে যোগ দেন ১৯৭৫ সালে। এর মধ্য দিয়ে সাংবাদিকতা জগতের বৃহত্তর পরিসরে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পান তিনি এবং তার কাজের ধরনেও আসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, যা আমরা জানতে পারি তার নিজের বয়ানেই–

'তখন সবে ইত্তেফাকে যোগ দিয়েছি। ডিসেম্বরের ৫ তারিখে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান কভার করতে পাঠানো হলো আমাকে। পত্রিকায় প্রকাশের আগে রিপোর্টটি যথারীতি তৎকালীন বার্তা সম্পাদক আসাফউদ্দৌলা রেজার কাছে গেল। দূর থেকে দেখলাম, রেজা সাহেব আমার রিপোর্টটিতে চোখ বোলালেন এবং তারপর পাশে রাখা বাস্কেটে ফেলে দিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন; জিজ্ঞেস করলেন, অনুষ্ঠান কভার করতে কে গিয়েছিলো? বললাম, আমি। এবার তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন ওখানে এসেছিলেন তখন তুমি কোথায় ছিলে? আমি তো হতভম্ব। পুনরায় উনি একই প্রশ্ন করে আমার নোট দেখতে চাইলেন। দৌড়ে গিয়ে নোট নিয়ে এলাম। তিনি দেখলেন। তারপর বললেন, তোমার নোট দেখো, কোনো এক বক্তার বক্তৃতার একপর্যায়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেব জীবন্ত হয়ে উঠেছিলেন, সেটাকেই 'ইন্ট্রো' করো। বুঝতে পারলাম, আমার ইতোপূর্বের বিরস সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা ইত্তেফাকে কোনো কাজে আসবে না।'

সেই শুরু। তারপর একের পর এক অসাধারণ সব রিপোর্ট করেছেন তিনি। মূলত অর্থনীতি বিষয়ক রিপোর্টার হলেও, তার তীক্ষ্ণ লেখনীতে উঠে এসেছে সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। বোদ্ধা পাঠকের মতে, চমৎকার সব উপমা ব্যবহার করে সাবলীল ভাষায় দ্রুত রিপোর্ট লেখার এক সহজাত ক্ষমতা ছিলো তার। অনেকেই তাকে আখ্যায়িত করেছেন একজন ধ্রুপদী সাংবাদিক হিসেবে।

দেশে কম্পিউটার শিল্প ও প্রযুক্তির বিকাশের লক্ষ্যে প্রথম থেকেই তিনি লিখেছেন সাপ্তাহিক বিজ্ঞান চর্চা, মাসিক কম্পিউটার জগৎ, কম্পিউটার বিচিত্রা ইত্যাদি পত্রিকায়। ১৯৮৭-৮৮ সালে ইত্তেফাকের বিশেষ ক্রোড়পত্রে তিনিই প্রথম কম্পিউটার নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন লেখেন।

১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে কোয়ান্টাম মেথডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও শিখিলায়ন ক্যাসেটের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাজিম উদ্দিন মোস্তান। অনুষ্ঠানের বিস্তারিত নিয়ে পরদিন ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় প্রকাশিত 'আচ্ছন্ন তন্দ্রায় নাকডাকা প্রশান্তি' শীর্ষক রিপোর্টটি ছিলো তারই করা। পরবর্তীতে তিনি কোয়ান্টাম মেথডের প্রথম ব্যাচে অংশ নেন।

কৃতি সাংবাদিক নাজিম উদ্দিন মোস্তানের জন্ম ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। বাবা হাফিজ উদ্দিন মোস্তান ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাবিলদার, মা সায়েরা খাতুন ছিলেন তার প্রেরণার উৎস। নিজ বাড়ি চাঁদপুর সদর উপজেলার পশ্চিম সকদি গ্রামে তার পড়াশোনা শুরু এবং সেখান থেকেই মেট্রিকুলেশন। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম থেকে ইন্টারমিডিয়েট সম্পন্ন করে স্থানীয় দৈনিক সমাচার-এ প্রুফ রিডার হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন।

পরে ঢাকায় এসে পয়গাম, সংবাদ ও মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত 'হক কথা' পত্রিকায় রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে যোগ দেন ইত্তেফাকে। মোস্তানের জীবন ছিলো সংগ্রামমুখর, বরাবরই তাকে চলতে হয়েছে চরম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি ১৯৬৯ সালে বিএ পাশ করেন। এরও এক দশক পর ১৯৭৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্র হিসেবে অর্থনীতিতে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। অনুবাদ করেছেন অর্থনীতিসহ সমাজবিজ্ঞান ও রাজনীতিবিজ্ঞানের বেশ কিছু বই।

নাজিম উদ্দিন মোস্তান ছিলেন এক দরদী সমাজকর্মী। লেখক আহমদ ছফার সাথে মিলে ছিন্নমূল পথশিশুদের জন্যে একটি বৈকালিক স্কুলও খুলেছিলেন। ১৯৯৮-এর বন্যার সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্টিংয়ের কাজে অহোরাত্র পরিশ্রম করেছেন তিনি। এর পর পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। তারপরও তিনি অবসর যাপনের কথা ভাবেন নি। ইত্তেফাকে কাজের পাশাপাশি নিজস্ব উদ্যোগে চালিয়ে গেছেন সাপ্তাহিক রাষ্ট্র পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজ।

আমরা তার সামগ্রিক অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

আপনিও দীর্ঘায়ু হবেন...

বাবা-মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জিনগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই শুধু নয়, আপনার কিছু অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেও আপনি আপনার দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারেন। আধুনিক কালের মনোবিজ্ঞানীদের নিরন্তর গবেষণায় সে বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।



মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দেবে দীর্ঘজীবন

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আর বিবেকবান হৃদয় আপনাকে দেবে দীর্ঘজীবন। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, এটি দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা অনেকখানি বাড়িয়ে দিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানী ডা. লুইস টারম্যান ১৯২১ সালে একটি দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা কার্যক্রমের সূচনা করেন, এতে ১৯১০ সালে জন্ম নেয়া ১৫০০ শিশুর ব্যক্তিগত জীবনাচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়। পরবর্তীকালে এ গবেষণার কাজ এগিয়ে নেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজিস্ট প্রফেসর হাওয়ার্ড ফ্রেডম্যান ও বিংশ শতাব্দীর আরেক খ্যাতিমান এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট লেসলি মার্টিন।

গবেষণার ফলাফলে তারা দেখান, সেসব শিশুদের মধ্যে যারা পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পর বা জীবনের বিভিন্ন সময়ে অধিকতর বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, অধ্যবসায়, নিয়ন্ত্রিত জীবনাচারের পরিচয় দিয়েছেন এবং সবমিলিয়ে একটি মানবিক আর দায়িত্বশীল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তারা দীর্ঘায়ু হয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, সবদিক থেকেই তাদের জীবন ছিলো সুখী আর তৃপ্তিময়।

এমনটা হওয়ার উপায় কী? এ প্রশ্নের উত্তরে লেসলি মার্টিনের পরামর্শ–এ ধরনের একজন মানুষে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে ছোট ছোট পদক্ষেপ গ্রহণ করে আজ থেকেই চেষ্টা শুরু করতে পারেন। আর আপনার চারপাশে এরকম মানুষজন যারা আছেন, বেশি বেশি তাদের সংস্পর্শে থাকুন।

বৃত্ত ভেঙে বাইরে আসুন

রবীন্দ্রনাথের গান আছে, 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।' তাই নিজস্ব গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসুন। ইতিবাচক ও জীবনে নির্মল আনন্দের যোগান দিতে পারে এমন বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠুন। নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হোন, চারপাশের মানুষের সাথে আপনার যোগাযোগ বাড়ান, আপনার পরিচিত বলয়টা আরো বিস্তৃত হয়ে উঠুক। লাভ আপনারই। আপনি দীর্ঘায়ু হবেন।

গবেষকরা বলছেন, চারপাশের মানুষের সাথে মমতাপূর্ণ আন্তরিক সম্পর্ক আপনার দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা বাড়ায়। দীর্ঘদিন বাঁচার ইচ্ছা-আকুতিকে সুতীব্র করে। জীবনের সাথে যোগ করতে পারে অতিরিক্ত কিছু দিন। কারণ ভালবাসা আর মমতার মতো মানবিক অনুভূতিগুলো মানুষকে ইতিবাচকতার দিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে, জীবন হয়ে ওঠে অর্থপূর্ণ।

অন্যদিকে সামাজিক বিচ্ছেদ বা একাকীত্ব মানুষকে নেতিবাচক ও বিষণ্ণ করে তোলে। হৃদরোগের আশঙ্কা বাড়ায়। মনোবিদ লেসলি মার্টিন বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে, যারা সহজেই অন্যের সাথে মিশতে পারেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন তারা তুলনামূলক দীর্ঘজীবী হন।

আশাবাদী হোন, সুস্থ থাকবেন

পৃথিবীজুড়ে বহু শতবর্ষী মানুষের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মিল খুঁজে পেয়েছেন মনোবিজ্ঞানীরা; সেটি হলো, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা বেশ আশাবাদী ছিলেন। আর আশাবাদী মানুষেরা জীবনের প্রতি উৎসাহী হন। তাই দেখা যায়, রীতিমতো স্ব-উদ্যোগেই তারা স্বাস্থ্যকর জীবন-অভ্যাসগুলো মেনে চলতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং ধূমপানসহ নানারকম স্বাস্থ্যঘাতী আচরণ-অভ্যাসগুলো থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হচ্ছে, এরা স্ট্রেস-এ ভোগেন কম, স্বভাবতই অন্যদের সাথে তাদের পার্থক্যটাও হয় উল্লেখযোগ্য এবং স্ট্রেসজনিত স্বাস্থ্য-জটিলতা থেকে তারা প্রায়শই মুক্ত থাকেন।

মনোবিদরা বলছেন, একজন মানুষ জীবনের শুরু থেকেই এরকম না হলে যে কখনোই তিনি এটি আয়ত্ত করতে পারবেন না, বিষয়টি কিন্তু সেরকম নয়; বরং এমনও দেখা গেছে, সত্তরোর্ধ্বদের মধ্যেও অনেকেই সচেতন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নিজেকে আশাবাদী করে তুলেছেন, হয়ে উঠেছেন একজন আপাদমস্তক ইতিবাচক মানুষ।

নিঃস্বার্থ সেবা দিন, অন্যের জন্যে কিছু করুন

দীর্ঘায়ু হওয়ার উপায় নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে যারা গবেষণা করেছেন, তাদেরই একজন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশাল সাইকোলজিস্ট সারা কনরাথ। তার মতে, কেবল নিজের জন্যে নয়, বরং অন্যের জন্যে, বিশেষত নিঃস্বার্থভাবে যারা অন্যকে সহযোগিতার কথা ভাবেন, এমনকি অচেনা-অপরিচিত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে যান, কাজে নেমে পড়েন, তাদের দীর্ঘায়ু হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

গবেষণার এমনতরো ফলাফলে কনরাথ নিজেই বিস্মিত। কারণ, দেখা গেছে, এই শ্রেণীর মানুষেরা অন্যদের চেয়ে তুলনামূলক চার বছর অবধি বেশি বাঁচতে পারেন। তিনি বলেন, এর কারণ বুঝি এটাই যে, অন্যের জন্যে নিঃস্বার্থ সেবায় মনে যে আনন্দ-অনুভূতির সঞ্চার হয়, তার ফলে শরীরে অক্সিটোসিন হরমোনের প্রবাহ বাড়ে। আর এ হরমোনটি শরীরের স্ট্রেস হরমোনগুলোর কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় এবং শরীরকে টেনশন, অস্থিরতার প্রভাবমুক্ত রাখে।

চাই সুখী দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন

দীর্ঘায়ুর পথে বিয়ে, বিশেষত সুখী দাম্পত্য জীবনও হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। মনোবিজ্ঞানী মার্টিন বলেন, সুস্থ সুখী দাম্পত্য জীবনযাপন করেন যারা, তাদের জীবন অনেকাংশেই শান্তিপূর্ণ হয়। দীর্ঘায়ু অর্জনে এটি সহায়ক বটে।

তাই দাম্পত্য সম্পর্ক এবং সুখী পারিবারিক জীবনের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রফেসর হাওয়ার্ড ফ্রেডম্যান। মমতাময় পারিবারিক পরিবেশে প্রত্যেকের মানসিক যোগাযোগ, শেয়ারিং আর পারস্পরিক সহযোগিতার একটি চমৎকার আবহ থাকে, টেনশনমুক্ত স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্যে যা দারুণ কার্যকর।

শ্রমসহিষ্ণুতা ও সফল কর্মজীবন

কাজে আনন্দ পান যারা, তাদের জন্যে সুসংবাদ–তাদের তুলনামূলক বেশিদিন বাঁচার সম্ভাবনার কথা জানাচ্ছেন গবেষকরা। বিজ্ঞানীদের মতে, আলস্যপূর্ণ দিনযাপনের মধ্যে নয়, বরং যেসব মানুষ তাদের কাজ, কর্মক্ষেত্র আর বিভিন্ন ধরনের শ্রমনির্ভর কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জীবনের অর্থ খুঁজে পান এবং কোনোরকম অবসর যাপনের কথা ভাবেন না, তারা সত্যিই দীর্ঘায়ু হতে পারেন।

নিজের ক্যারিয়ার আর সামগ্রিক কর্মজীবন নিয়ে আত্মতৃপ্তিতে ভুগছেন যারা, তারাও হাসতে পারেন আনন্দের হাসি। কোমর বেঁধে এবার লেগে যেতে পারেন দীর্ঘ জীবনযাপনের প্রস্তুতি নেয়ার কাজে। কর্মক্ষেত্রে নানারকম সাফল্য আর অর্জনের ফলে মনে যে তৃপ্তি আসে, তা জীবনে বাড়তি পাঁচ বছর পর্যন্ত আয়ু যোগ করতে পারে বলে গবেষকরা জানান।

জীবনযাপনে সচেতন হোন

জাপানের বার্ধক্য বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান টোকিও মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট অব জেরোন্টোলজি। এর গবেষক ইউকি মুসাই ১০০ থেকে ১০৬ বছর বয়সী টোকিও'র ৭০ জন অধিবাসীকে নিয়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

তাতে দেখা যায়, যারা প্রায়শই তাদের বয়স নিয়ে ভীত ছিলেন কিংবা কোনো না কোনোকিছু নিয়ে খুঁতখুঁতে বা ক্ষ্যাপাটে আচরণ করেছেন তারা বিষণ্ণতাসহ নানাবিধ মানসিক জটিলতায় আক্রান্ত হয়েছেন, স্নায়ুবৈকল্যে ভুগেছেন, যা তাদের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে।

গবেষকরা বলছেন, বয়স নিয়ে অযথা ভীত হবেন না, একে জীবনের আর দশটা বিষয়ের মতো সহজ ও ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করুন। এটি যারা পারেন, দেখা গেছে, তাদের জীবনযাপন সত্যিই বেশ নিয়মতান্ত্রিক আর পরিমিত।

তাই ভয় নয়, বরং সচেতন হোন। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা, ধৈর্য্যের সাথে ধীরে সুস্থে কাজকর্ম করা ইত্যাদি সুন্দর জীবনাচার অনুসরণে উৎসাহ বোধ করুন। আর দীর্ঘায়ুর জন্যে এটিই দরকার বলে মনে করছেন আধুনিক ধারার চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা।

তথ্যসূত্র : এমএসএন হেল্‌দি লিভিং ডট কম

গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

তরুণদের এ কোর্সে উদ্বুদ্ধ করতে হবে

মোছাররাত জাহান



জীবনকে আরেকটু সুন্দর করতে কিছু ছোট ছোট পরিবর্তন আমি প্রত্যাশা করছিলাম এবং এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমার কোর্সে আসা। মেডিটেশন কেন নিয়মিত করবো, সেই অনুপ্রেরণাটা আমি কোর্সে এসে পেয়েছি এবং আমি এখন অনেক ভালো বোধ করছি।

কোয়ান্টামের এত সেবামূলক কার্যক্রম আছে তা জেনে আমি বিস্মিত! আমি শিক্ষকতা করছি, তাই অনুভব করেছি যে, বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের জীবনে সঠিক দিক-নির্দেশনার বড় অভাব। কোর্সে অংশ নিয়ে মনে হয়েছে যে, কিশোর-তরুণদের যদি এই কোর্সে আনা যায়, তা হতে পারে এক বড় অর্জন। তরুণরা এই কোর্স থেকে জীবনের সঠিক দিক-নির্দেশনা পাবে। আমি আমার আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিতদের উদ্বুদ্ধ করবো যেন, পরিবারের তরুণ সদস্যদের এ কোর্স করতে তারা উৎসাহিত করেন।

[মোছাররাত জাহান, অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৬২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

পেয়েছি এক বিশাল পরিবার

হৃদয় খান



শৈশব থেকেই আমি সুর, গান–এগুলোতে অনেক সময় দিতাম। বলা যায়, আমি একরকম ধ্যানেই চলে যেতাম এসব নিয়ে। সংগীত নিয়েই আমার পথচলা। মাত্র ১৬ বছর বয়সে সংগীত জগতে আমার গান সিডি আকারে প্রকাশ হয়।

মিউজিকের জন্যে অনেক মানুষের ভালবাসা আমি পেয়েছি। কিন্তু জীবনের প্রাপ্তিগুলো আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি কোর্সে এসে। কোর্সের প্রতিটি আলোচনা, মেডিটেশন আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে আরো এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। কোর্সে আসার আগে এভাবে উপলব্ধি করি নি যে, স্রষ্টা আমাকে সুর দিয়েছেন, কণ্ঠ দিয়েছেন। সবকিছুর জন্যে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি হাজার হাজার মানুষের সামনে গান গেয়েছি, কথা বলেছি কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এত মানুষের সামনে নিজের উপলব্ধি অনুভূতির কথা তুলে ধরার অনুভূতিটা অন্যরকম। এখানে এসে মনে হচ্ছে, আমি বিশাল বড় একটা পরিবার পেয়েছি।

[হৃদয় খান, সংগীত শিল্পী। ৩৬২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আমার মেয়েকে ২৯ বছর এগিয়ে দিলাম

মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান আফনান



২০০১ সালে আমার একটা অপারেশন হয় এবং আমি প্রায় ছয় মাস প্যারালাইজড ছিলাম। তারপর থেকেই আমার বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা ছিলো। বেশি সময় বসে থাকতে পারতাম না, বলা যায় সে সাহসও পেতাম না। অথচ কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে চারদিন ১০ ঘণ্টা করে বসে থেকেছি এবং কোর্সটিও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি।

এই চার দিনে আমার প্রাপ্তি প্রত্যাশার চাইতে অনেক বেশি। আমার বয়স ৪৪ আর আমার সাথে কোর্স করতে এনেছি আমার ১৫ বছরের মেয়েকে। আমি মনে করছি যে, আমার মেয়েকে আমার চেয়ে ২৯ বছর সামনে এগিয়ে দিলাম। এখানে ভালো আর উন্নত চিন্তার একতরফা কোনো ব্যাখ্যা হয় নি। আমার মনে হয়েছে, গুরুজী এখানে একা কোনো কথা বলেন নি বরং পুরো সময় আমি অংশগ্রহণ করেছি। লেকচারের এই ধরনটি, এই পদ্ধতিটি এক কথায় অসাধারণ।

[মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান আফনান, জেনারেল ম্যানেজার, ইউনাইটেড ল্যান্ড পোর্ট, টেকনাফ। ৩৬২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ওষুধ ছাড়াই তৃপ্তি নিয়ে ঘুমিয়েছি

লতিফা সিরাজ



প্রায় চার পাঁচ বছর আগে আমার সবসময় খুব পালপিটিশন হতো। ওষুধ খেলে ভালো থাকতাম, ওষুধ বন্ধ করলেই পালপিটিশন শুরু হতো। এ কারণে আমি হাঁটতে পারতাম না। আস্তে আস্তে এমন অবস্থা হলো যে, আমি বেডরুম থেকে ডাইনিং স্পেসেও আসতে পারতাম না। দেয়াল ধরে আসতে হতো অথবা কেউ আমাকে সাহায্য করতো।

আমার এক প্রতিবেশীর উৎসাহে আমি কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের প্রোগ্রামে অংশ নিই। যেখানে আমি আরেকজনের সাহায্য নিয়ে চলাফেরা করতাম, সেই আমি এরপর থেকে একাই সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা এমনকি জগিংও শুরু করলাম। আরো সুস্থতার প্রত্যাশা নিয়ে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আসা। বহুদিন ধরে আমার ঘুমের সমস্যা ছিলো, ওষুধ খেয়েও ঘুম আসতো না। কিন্তু কোর্সের পর থেকে আমি কোনো ওষুধ ছাড়াই তৃপ্তি নিয়ে ঘুমাই এবং সময়মতো ঘুম থেকে উঠি।

[লতিফা সিরাজ, গৃহিণী। ৩৬২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

গলায় আর কোমরে এখন বেল্ট পরতে হয় না

সাবিনা আজফার



উচ্চ রক্তচাপ, ঘাড়ব্যথা, কোমরব্যথা ইত্যাদি আমার নানা সমস্যা। প্রায় ১৮-১৯ বছর ধরে এই উচ্চ রক্তচাপ আর অস্থিরতা, কোনো কাজে মনোযোগ দিতে পারতাম না। দুইবার দেশের বাইরে গিয়েছি চিকিৎসা করাতে, ঝুড়ি ভরে তারা আমাকে ডিপ্রেশনের ওষুধ দিয়েছে। এতদিন ধরেই আমি ওষুধগুলো খাচ্ছিলাম।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে প্রথমদিন আমার প্রচণ্ড মাথাব্যথা আর রক্তচাপ ছিলো ১৬০/১০০। তাই ঘাড়ে 'কলার' বেঁধে এসেছিলাম। ২য় দিন কলারটা খুলে ফেলেছি এবং সেটা আর গলায় দেই নি। বাসায় গিয়ে নামাজ পড়েছি, মেডিটেশন করেছি–অনুভব করেছি, আগের মতো আর খারাপ লাগছে না। সেইসাথে অনুভব করলাম, আমার কোমরে ব্যথাটা নেই। কোমরেও তাই বেল্ট পরতে হয় না।

কোর্সে এসে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো, আমি আমার রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি। গুরুজীকে ধন্যবাদ জানাই যে, এ কোর্সের মাধ্যমে শারীরিক মানসিক সমস্যা এখানে ফেলে গিয়ে এক নতুন মানুষে পরিণত হয়েছি।

[সাবিনা আজফার, সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সরকারি কবি নজরুল কলেজ। ৩৬২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

জটগুলো খুলে গেল আলোচনা শুনতে শুনতে

আব্দুল্লাহ আল রাকিব



ছোটবেলা থেকে বরাবরই পড়াশোনায় ভালো ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একটা সময় আমি নেতিবাচকতার সাগরে হাবুডুবু খেতে শুরু করলাম। পড়াশোনায় কোনো মনোযোগই দিতে পারছিলাম না। নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত হতে অনুপ্রেরণাদায়ক অনেক বই পড়েছি। বইগুলো পড়লে আমার ভেতরে স্বপ্ন জেগে উঠতো কিন্তু আমি স্বপ্নের সে পথে হাঁটতে পারতাম না। কীভাবে লক্ষ্যে পৌঁছবো তা বুঝতাম না।

কোয়ান্টামের কথা জানার পর থেকে নিয়মিত অংশ নিতে লাগলাম সাদাকায়নে। কোর্সে এসে যখন মনছবির মেডিটেশন করলাম, আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমার জীবনের লক্ষ্য। ভেতরে যে নেতিবাচকতার জট ছিলো তা খুলে গেল আলোচনা শুনতে শুনতেই। এখন আমি জানি, লক্ষ্য অর্জনে কীভাবে আমাকে এগুতে হবে আর কী করতে হবে।

[আব্দুল্লাহ আল রাকিব, একাদশ শ্রেণী, ঢাকা কলেজ। ৩৬২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

প্রযুক্তিগত জ্ঞান বাড়িয়েছে আত্মবিশ্বাস

তথ্যপ্রযুক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কম্পিউটার সম্পর্কিত জ্ঞান। দৈনন্দিন জীবনে শিক্ষা কর্মক্ষেত্র বিনোদনসহ প্রতিটি কাজে ক্রমশই বাড়ছে এর ব্যবহারের বিস্তৃতি। আধুনিক সময়ে কম্পিউটার সম্পর্কিত জ্ঞান তরুণ প্রজন্মের দক্ষতা সৃষ্টির পাশাপাশি বাড়িয়ে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বমানের টেকনোটিয়ার গড়ার লক্ষ্যে ২০১১ সাল থেকে পরিচালিত হচ্ছে কোয়ান্টাম আইসিটি কার্যক্রম। অডিও-ভিজুয়াল পদ্ধতিতে সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষকের উপস্থিতিতে চার দিনের দুটি প্রোগ্রাম–বেসিক কম্পিউটিং ও হার্ডওয়্যার প্রোগ্রাম। এতে অংশগ্রহণ করে কম্পিউটার নামক এক সময়ের ভীতিকর সে যন্ত্রটি সবার কাছে এখন হয়ে উঠছে বন্ধুর মতো আপন। ভবিষ্যৎ টেকনোটিয়াদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্ত করা উপলব্ধি, অনুভূতির কথা নিয়েই আমাদের এবারের আয়োজন।



সাবিকুন নাহার

বর্তমান যুগ প্রযুক্তিনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও কম্পিউটার ব্যবহার সম্পর্কে আমি কিছুটা অনভিজ্ঞ ছিলাম। সবসময় একটা ভীতি কাজ করতো আমার মধ্যে। গত বছর কলেজ থেকে নায়েম-এ দেড় মাসের একটি ট্রেনিংয়ের চিঠি আসে। পেশাগত জীবনে এটি একটি বড় সুযোগ হলেও কম্পিউটারের ধারণা না থাকায় কর্তৃপক্ষকে আমার অপারগতা জানাই। সেই থেকে নিজেকে এ ব্যাপারে দক্ষ করার চেষ্টা করছি।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স তিন মাসের যা আমার পক্ষে করা কঠিন। চার দিনের এই প্রোগ্রামটি আমার জন্যে তা অনেক সহজ করে দিয়েছে। এখন ভাবছি, আরো আগে কোর্সটি সম্পন্ন করলে আমি সে ট্রেনিংয়ে অংশ নিতে পারতাম।

[সাবিকুন নাহার, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]

এড. মো. কামরুল ইসলাম মিলন

বর্তমানে আইন পেশায় কম্পিউটারের ব্যবহার জানা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের দৈনিক কার্যতালিকা, আইনের রেফারেন্স, মামলার ফাইলের বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি এখন অনলাইনে জানা যায়। এসব বিষয়ে নিজের দক্ষতা বাড়ানোর জন্যেই বেসিক কম্পিউটিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করি। এ প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। কিছুদিন অনুশীলন করলে প্রয়োজনীয় সব কাজ নিজে নিজেই করতে পারবো। এ সেবায় জড়িত সবাইকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

[এড. মো. কামরুল ইসলাম মিলন, আইনজীবী, সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশ। ২১৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

তাজরীনা তাবাসসুম মৌরী

শিক্ষার্থীদের জন্যে বেসিক কম্পিউটিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা খুবই জরুরি। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আসলেই কম্পিউটারের বেসিক সম্পর্কে জানা যায়। এ প্রোগ্রামটি করার পর আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। আগে কম্পিউটার ব্যবহার করতে ভয় হতো। বেসিক কম্পিউটিং প্রোগ্রাম করার পর সেই কম্পিউটারকেই এখন বন্ধু মনে হয়। আমি এখন কম্পিউটার সম্পর্কিত জ্ঞানকে পড়াশোনার একটি অংশ মনে করি। এর মাধ্যমে আমরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবো।

[তাজরীনা তাবাসসুম মৌরী, শিক্ষার্থী। ৩৩১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আসমা খাতুন

আগে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। বায়াস ব্যাটারি পরিবর্তনের জন্যেও অন্যকে ডাকতে হতো। উইন্ডোজ সেটআপ করতে গিয়ে সমস্যা হতো। সিপিইউ খুলে যে ধুলা পরিষ্কার করবো তাতেও একধরনের ভীতি কাজ করতো।

বেসিক হার্ডওয়্যার প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে দারুণ উপকৃত হয়েছি, সিপিইউ সম্পর্কে ভীতি তো দূর হয়েছেই, এখন র‍্যাম, প্রসেসর এবং অন্যান্য ডিভাইসগুলো পরিবর্তন ও চেকআপ করতে পারি। সঠিকভাবে কানেকশন করতে পারি।

[আসমা খাতুন, শিক্ষক, ইলেক্ট্রিকাল ডিপার্টমেন্ট, মিরপুর ইনস্টিটিউশন অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি। ৩২৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মো. সাইফ ইকবাল মাহমুদ

সিপিইউ খোলা, এসেম্বলিং করাসহ হার্ডওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ অনেক কিছুই জটিল মনে হতো। বেসিক কম্পিউটিং ও হার্ডওয়ার প্রোগ্রাম দুটিতে অংশ নেয়ার পর দারুণভাবে উপকৃত হয়েছি। মাত্র চার দিনে অনেক বিষয়ে শেখার সুযোগ হয়েছে। এখন নিজেই কম্পিউটার এসেম্বল করা, ল্যাপটপ ব্যবহার, নেটওয়ার্কিং, সফটওয়ার ইনস্টল, ব্যাকআপ দেয়া, প্রিন্টার, টোনার ও স্ক্যানার ব্যবহার করা এবং ট্রাবল শুটিংয়ের কাজ করাও অনেক সহজ হয়েছে।

[মো. সাইফ ইকবাল মাহমুদ, জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ম্যাশিনিস্ট) টিএসসি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

চন্দন দাস

বছর দুয়েক আগে বাসায় কম্পিউটার এনেছি। এছাড়া ১৯৯৬ সাল থেকে পেশাগত কারণে কম্পিউটারে প্রচুর কাজ করতে হয়েছে। সবই টাকার বিনিময়ে করিয়েছি। এটি শেখা সময়ের অপচয় মনে হতো। কিন্তু একটা সময় পর প্রযুক্তিগত জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাটা আমার মনছবির সাথে সাংঘর্ষিক মনে হতে লাগলো। যে জ্ঞানের অভাবে জীবন অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে, দেশের বাইরে যাওয়াসহ অনেক সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। কোয়ান্টামে বেসিক কম্পিউটিং ও হার্ডওয়্যারের প্রোগ্রামগুলো করে আমার বিশ্বাস, প্রযুক্তির সাথে নিজেকে যুক্ত করে আমার মনছবি বাস্তবায়নের পথে এখন দ্রুততার সাথে এগিয়ে যেতে পারবো।

[চন্দন দাস, চাকরিজীবী, ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নিশাত আফরোজ

কম্পিউটার এসেম্বল করা, উইন্ডোজ, অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করার জন্যে অন্যের সাহায্য নিতে হতো। একবার একজন একভাবে সেটআপ করে দিতেন, পরের বার প্রয়োজন হলে আরেকজন হয়তো আরেকভাবে করে দিতেন। তখন নিজের ওপরই বিরক্ত হতাম যে, নিজে পারলে তো এ সমস্যায় পড়তে হতো না।

বেসিক কম্পিউটিং প্রোগ্রাম করার পর এখন নতুন কোনো ডিভাইস কেনার সময় যাচাই করে কিনতে পারবো। সার্ভিসিং-এর জন্যে বসে থাকা অথবা অর্থ ব্যয়ের হয়রানি হবে না। নিজস্ব ডকুমেন্ট সিকিউরডভাবে রাখা যাবে। পিসিতে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল দেয়ার সময় ব্যাকআপ ও স্টোরেজ দিয়ে তথ্য পুনরুদ্ধার করতে পারবো। এছাড়া প্রিন্টার, স্ক্যানার ব্যবহার করতে পারবো অনায়াসে।

[নিশাত আফরোজ, শিক্ষার্থী, এমএস ফার্মাসিউটিক্যালস সায়েন্স, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ২৩৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

তাছলিমা হক মুন্নী

কম্পিউটার সম্পর্কে সাধারণ ধারণা নেয়ার জন্যে বেসিক কম্পিউটিং প্রোগ্রামে অংশ নিতে আগ্রহী হয়েছি। এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্রাউজ করে ম্যাগাজিন, গানসহ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ডাউনলোড করা, বাংলা ও ইংরেজি টাইপ করা, কম্পিউটার অন-অফ করা, বিভিন্ন ক্যাবল লাগানো এবং প্রিন্ট করা খুব সহজ হয়েছে। আগে কম্পিউটার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে কিছু বলতে পারতাম না। ইনশাল্লাহ এখন অনেকটা বুঝতে পেরেছি এবং বিশ্বাস করি, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বুঝতেও পারবো, বলতেও পারবো।

[তাছলিমা হক মুন্নী, শিক্ষার্থী, অনার্স ৩য় বর্ষ, ইকনোমিক্স, ইডেন মহিলা কলেজ। কোয়ান্টাম এসোসিয়েট]

মো. মনিরুজ্জামান মনির

কম্পিউটার নিয়ে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতাম। এর মধ্যে অন্যতম হলো, ডকুমেন্ট বা কম্পিউটারে কোনো সমস্যা হলে মনে হতো–আমার সব কাজ বন্ধ, অন্য কারো সাহায্য ছাড়া এখন আমার আর কিছু করার নেই। সময়, অর্থ ইত্যাদির অপচয় হতো। এসব কিছুর সমাধানের জন্যেই কোয়ান্টাম বেসিক কম্পিউটিং প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছি। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া, যতটুকু শেখার প্রত্যাশা ছিলো তার চেয়েও অনেক বেশি শেখার সুযোগ হয়েছে।

[মো. মনিরুজ্জামান মনির, ব্যবসায়ী, ৩৪৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *আপনি বলেছেন, সবাই ভালবাসা পেতে চায় আর ব্যতিক্রমীরা ভালবাসা দিতে চায়। আমি প্রথম দলের। কিন্তু আমি ব্যতিক্রম হতে চাই। ভালবাসা কীভাবে দেয়া যায়–ব্যাখ্যা করবেন। আমি আনন্দিত থাকতে চাই, চাওয়ার পর না পেয়ে দুঃখী থাকতে চাই না। যদি দেয়াতে সুখ হয়–কীভাবে সেটা দেয়া যায়?*

উত্তর : সাধারণত আমাদের ধারণা হচ্ছে যে, বিপরীত লিঙ্গের কাউকে পাওয়ার নামই ভালবাসা বা প্রেম। আসলে এটা প্রেম নয়, এটা হচ্ছে একটা জৈবিক চাহিদা, আবেগীয় চাহিদা। 'প্রেম' শব্দের এটি একটি সংকীর্ণ অর্থ। পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই এই ভালবাসা রয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। এটাই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

ব্যতিক্রম হচ্ছে কোনো প্রত্যাশা ছাড়া যে প্রেম। যেমন–আল্লাহ প্রেম, দেশ প্রেম, মানব প্রেম–যেখানে জৈবিক কোনো চাওয়াপাওয়া নেই। যেখানে শুধু দেয়ার আছে। একজন মুক্তিযোদ্ধা নিজের জীবন দিয়ে দেশকে রক্ষা করার জন্যে যখন সংগ্রাম করেছেন তখন তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কিছু পাওয়ার জন্যে করেন নি। নিজের দেশকে বাঁচানোর জন্যে এবং শুধু দেয়ার জন্যে জীবন দিয়েছেন। এটাই হচ্ছে দেশ প্রেম।

সাভার দুর্ঘটনায় উদ্ধার তৎপরতায় নিয়োজিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার কায়কোবাদ। যিনি গার্মেন্টস কর্মী শাহীনাকে বাঁচানোর জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি এ যুগের একজন বীর। জাতীয় জীবনেও আমাদের এই রকম বীরের প্রয়োজন। কত শ্রদ্ধার সাথে আমরা এই নামটা স্মরণ করি!

দেশের জন্যে জীবন দিয়েছেন সেই যোদ্ধাদের আমরা যেমন ভুলি নি, একইভাবে আমরা ভুলবো না ইঞ্জিনিয়ার কায়কোবাদ-কেও, তিনি একটি মানুষকে বাঁচানোর জন্যে প্রাণ দিয়েছেন। এটাই হচ্ছে ভালবাসা। এটাই হচ্ছে প্রেম। আপনি যদি প্রকৃত অর্থেই নিঃস্বার্থভাবে মানুষের উপকার করেন, আপনি কোনোদিন দুঃখিত হবেন না। আপনাকে মানুষ স্মরণ করবে শ্রদ্ধার সাথে। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণে আপনি যে কাজটুকু করবেন এটাই হচ্ছে প্রেম।

প্রশ্ন : *স্বামী ও স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান ৩০-এর ওপরে। সেক্ষেত্রে স্বামী যদি সত্তরোর্ধ্ব বয়সে মারা যান তবে স্ত্রী কি তার একাকীত্ব বা অবলম্বনের জন্যে আবার বিয়ে করতে পারবে?*

উত্তর : এখানে আইনগত বা ধর্মীয় কোনো বাধা নেই। তবে বিয়েটা যেহেতু শুধু ব্যক্তিগত নয়, পারিবারিক একটি ব্যাপার–তাই কোনো মহিলার যদি সন্তান থাকে, সন্তানদের ইতিবাচক সম্মতি নিয়ে বিয়ে করা উচিত। সন্তানরা যদি বিয়েতে সম্মতি না দেয় তাহলে মহিলার জীবনে চরম অশান্তি সৃষ্টি হবে। কারণ, একজন মহিলা ছেলে-মেয়েকেও ছাড়তে পারবেন না আবার স্বামীকেও ছাড়তে পারবেন না। একজন মায়ের পক্ষে বিষয়টি খুব চ্যালেঞ্জিং।

কারণ, সন্তানরা মাকে কারো সাথে শেয়ার করতে চায় না। এটা হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক একটি দিক যে, আপনি আপনার সন্তানকে ছাড়তে পারবেন না। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তান আপনার একাকীত্বও ঘোচাতে পারবে না। সন্তান বড় হলে বিয়ে করবে, নিজেকে নিয়ে, সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তাই আপনার একাকীত্ব সন্তান ঘোচাতে পারবে না।

আপনি যদি মনে করেন, সন্তানের দূরত্ব আপনাকে ব্যথিত করবে না–আপনি সহজে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ধর্মীয় এবং আইনগতভাবে কোনো বাধা নেই। আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, সন্তানের দূরত্ব কতটুকু সহ্য করতে পারবেন। আর সন্তান যদি সম্মতি দেয়, আনন্দিত চিত্তে অনুভব করে যে, তার মারও একটি জীবন আছে, তার জীবনের যেকোনো সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারেন। আসলে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সমমর্মিতা যত গড়ে উঠবে তত পরিবারগুলো সুখের হবে।

আর 'অবলম্বন' আসলে একটি ভ্রান্ত চাওয়া। আল্লাহ ছাড়া মানুষের আর কোনো অবলম্বন নেই, সে নারী হোন অথবা পুরুষ। স্বামী আপনার অবলম্বন না-ও হতে পারেন। তিনি আপনার কষ্টের কারণও হতে পারেন। অতএব কেউ কারো অবলম্বন হয় না। অবলম্বন একমাত্র আল্লাহ। তাঁর ওপর ভরসা রাখুন।

প্রশ্ন : *আমার রুমমেট আমার সাফল্যে সবসময় হিংসা করে। তার হিংসা কি আমার সাফল্যের পথে অন্তরায় হতে পারে?*

উত্তর : অন্যের হিংসা কখনোই আপনার সাফল্যের পথে অন্তরায় হতে পারে না। আপনি সবসময় প্রার্থনা করবেন যে, আল্লাহ, আমাকে হিংসুকের হিংসা থেকে রক্ষা কর। দ্বিতীয়ত, তার জন্যে দোয়া করবেন। যখনই মেডিটেশন করবেন তাকে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝাবেন যে, আপনি তার মঙ্গল চান, তার কল্যাণ চান এবং আপনাকে হিংসা করার কোনো কারণ নেই। সবসময় আপনি নিজের ভেতরে এই ইতিবাচক অনুরণন সৃষ্টি করুন। দেখবেন ধীরে ধীরে তার হিংসুটে ভাবটা দূর হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : *আমার বেতন এবং সামর্থ্য অনুসারে মা-বাবাকে তেমন কিছু দিতে পারি না। কিন্তু তারা মাঝে মাঝে কিছু পাওয়ার আশা করেন। আমি যে দিতে পারছি না–এটা কীভাবে তাদের বোঝাবো যাতে তারা কষ্ট না পায়?*

উত্তর : আসলে মা-বাবাকে বোঝানো খুব সহজ। মা-বাবা অবশ্যই বুঝবেন। আপনার চেহারা দেখলেই তারা বুঝবে যে, আপনার আর্থিক সামর্থ্য আছে কি না। মাঝে মাঝে আপনি কি মায়ের পাশে গিয়ে তার হাতটা ধরে কিছুক্ষণ বসেছেন? বাবার হাতটা ধরে কি কিছুক্ষণ বসে থেকেছেন? এর জন্যে তো অর্থের প্রয়োজন হয় না। ছেলে যদি মা-বাবার সাথে একান্তে সময় কাটায়, আন্তরিকভাবে তাদের খোঁজখবর নেয়, তাদের কি চাওয়ার আর কিছু থাকে?

আমরা মনে করি, শুধু বস্তু দিলেই বোধহয় সবাই খুশি হবেন। মা-বাবাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে, বোঝানোর জন্যে অর্থ লাগে না। আপনার চেহারা দেখেই তারা বুঝতে পারবেন যদি আপনার ভেতরে মমতা থাকে, আপনি যদি তাদের ভালবাসেন।

প্রশ্ন : *যাকাত আদায়ের জন্যে সাড়ে ৫২ তোলা রুপার পরিবর্তে সাড়ে সাত তোলা সোনার মূল্য ধরা হলো না কেন?*

উত্তর : রসুলুল্লাহ (স)-এর যুগে সাড়ে সাত তোলা সোনার দাম এবং সাড়ে ৫২ তোলা রুপার দাম সমান ছিলো। সেই জন্যে সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা ৫২ তোলা রুপার কথা বলা হয়েছে। দুটোর বিক্রয় মূল্য এবং ক্রয় মূল্যও ছিলো সমান। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে সোনার দাম বেড়ে গেছে, রুপার দাম কমে গেছে।

স্বর্ণের দাম যেহেতু তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি তাই রুপার মূল্য ধরেও আমরা যাকাতদাতা হতে পারি। আর যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সবার দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত, যেকোনোভাবে হোক যাকাতদাতা হওয়া। আসলে আপনি শোকরগোজার কি না এটা বোঝা যাবে–আপনি দাতা হতে পেরেছেন কি না, আপনি নিঃসংকোচে দিতে পারেন কি না তার ওপর। কোনো গ্রহীতা কখনো শোকরগোজার হতে পারে না। গ্রহীতা সবসময় না-শোকর মানুষ। আপনি যত পাবেন তত আপনার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বাড়তে থাকবে। আর দাতা যত দেন তত তার দেয়ার আকাঙ্ক্ষা বাড়তে থাকে।

গার্মেন্টসকর্মী বিলকিসকে আমরা অভিনন্দন জানাই যে, তিনি প্রতিদিন তার টিফিনের ২০ টাকা মাটির ব্যাংকে দান করতেন অভাবী বঞ্চিতের জন্যে। আল্লাহ তাকে কতগুণ বেশি প্রতিদান দিয়েছেন! সাভার ট্র্যাজেডিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে তাকে অক্ষত ও সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। এটা তার দাতা হওয়ার কারণে। অর্থাৎ একটি মেয়ে কতটা শোকরগোজার হলে কিশোরী বয়স থেকে কাজ শুরু করেছেন স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে। পরিবারের ভরণপোষণ করছেন নিজে উপার্জন করে। সেখান থেকে প্রতিদিন ২০ টাকা করে দান করছেন।

এই দাতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা যাদের থাকে তারাই আসলে পৃথিবীতে তাদের পায়ের চিহ্ন রেখে যেতে পারেন। আর গ্রহীতা বা ভিক্ষুক কোনোদিন তার পায়ের চিহ্ন রেখে যায় নি। অতএব আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যাকাতদাতা হওয়া যাতে করে আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আমরা থাকতে পারি। যাতে আমাদের সম্পদে আরো বরকত হতে পারে। আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখছি, প্রথম বছর যারা যে পরিমাণ যাকাত দিয়েছেন, পরের বছরগুলোতে তাদের যাকাত দেয়ার পরিমাণ বেড়েছে বিস্ময়করভাবে।

অতএব দাতা হোন অন্তর থেকে, দান করুন প্রশ্ন ছাড়া। দান করার ক্ষেত্রে নিজেকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। আর দেয়ার মালিক হলেন শুধু আল্লাহ। আপনি দিয়ে তাঁর দেয়ার পথটা আপনার জন্যে উন্মুক্ত করছেন। কারণ আপনি যা দেবেন আল্লাহ দেবেন তার কমপক্ষে সাতশ গুণ বেশি।

অনেকে বলতে পারেন, আমার তো যাকাত আদায়ের মতো যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হয় নি। এক্ষেত্রে আমরা আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে যেটা করতে পারি, আগামী বছর যাকাতদাতা হওয়ার নিয়তে এ বছর দান করতে পারি। অর্থাৎ জীবনে দাতা হবেন। আল্লার রহমতের ছায়ায় সবসময় থাকবেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

নিজের কাছে স্বচ্ছ থাকলে কোনো কুৎসা কাউকে কালিমালিপ্ত করতে পারে না। আমি সবসময় নিজের কাছে স্বচ্ছ থাকবো।

৪২ তম জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হ্যান্ডবল (ছাত্র)

জাতীয় স্কুল হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন কোয়ান্টারা



৪২ তম জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার হ্যান্ডবল ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের কোয়ান্টারা। গত ২৭ আগস্ট থেকে দেশব্যাপী শুরু হওয়া এ প্রতিযোগিতায় থানা, জেলা, উপ-অঞ্চল ও অঞ্চল পর্যায়েও চ্যাম্পিয়ন হয় তারা।

থানা পর্যায়ে ২৭ আগস্ট লামায় অনুষ্ঠিত লামামুখ উচ্চ বিদ্যালয়কে ১৯-০ গোলে হারিয়ে কোয়ান্টারা প্রতিযোগিতার শুভসূচনা করে। জেলা পর্যায়ে ৩ সেপ্টেম্বর বান্দরবান স্টেডিয়ামে বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়কে হারায় ৩৪-৩ গোলে।

৭-৯ সেপ্টেম্বর উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল মডেল হাই স্কুলের বিপক্ষের খেলাটি কোয়ান্টাদের জন্য ছিলো বড় একটি চ্যালেঞ্জ। ৯ সেপ্টেম্বরের এই খেলায় চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল মডেল হাই স্কুল তাদের বহু বছরের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। ঐদিন খেলার প্রথমার্ধে কোয়ান্টারা ২-৪ গোলে পিছিয়ে থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে দলীয় অধিনায়ক ছাড়াই ৯-৫ গোলের জয় লাভ করে।

১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা। এদিন কোয়ান্টারা সিলেট বিভাগকে পরাজিত করে ১৯-৫ গোলে। বিকেলের ফাইনাল খেলায় গত বছরের ৪১ তম জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা হ্যান্ডবল খেলার রানার আপ দল কুমিল্লা বিভাগের ঐতিহ্যবাহী ইস্পাহানী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের সাথে ২৪-৪ গোলের ব্যবধানে জয় লাভ করে। বিপুল ব্যবধানে হারলেও খেলা শেষে কুমিল্লা বিভাগের খেলোয়াড়রা কোয়ান্টাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানায়।

চূড়ান্ত পর্বে ১৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে কোয়ান্টারা তাদের প্রথম খেলায় খুলনার ঐতিহ্যবাহী খুলনা নেভি স্কুলের সাথে প্রতিযোগিতা করে। দারুণ প্রতিযোগিতার এই খেলায় কোয়ান্টারা জয়ী হয় ১২-১১ গোলে। ১৬ সেপ্টেম্বর কোয়ান্টারা চূড়ান্ত পর্বে ঢাকা অঞ্চলের নবাবগঞ্জের বান্দুরা হলিক্রস স্কুলের সাথে প্রতিযোগিতা করে। বিগত বছরে বহুবার জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া বান্দুরা হলিক্রস স্কুলকে ২১-১৮ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কোয়ান্টারা।



১৭ সেপ্টেম্বর রাজশাহীর চাঁপাই নবাবগঞ্জ স্কুলের সাথে কোয়ান্টাদের সর্বশেষ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এতে কোয়ান্টারা ৩১-৯ গোলে জয় লাভ করে সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করে এ প্রতিযোগিতা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষার্থী ওয়ার্কশপ



২৮ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর. সি. মজুমদার অডিটোরিয়ামে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট এবং প্রো-মাস্টারদের নিয়ে এক বিশেষ ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বুয়েট, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ৭৫ জন শিক্ষার্থী এতে অংশগ্রহণ করেন।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের অর্গানিয়ার রাবিয়া নাজরীনের পরিচালনায় সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত চলে এ ওয়ার্কশপ। এতে শিক্ষার্থী জীবনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রাক্তন শিক্ষার্থী কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী কার্যক্রমের মডারেটর শাফিয়া নাজরীন। 'ফাউন্ডেশন আমার এগিয়ে যাওয়ার সিঁড়ি' এ বিষয়ে আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র অর্গানিয়ার মারুফ ইবনে মাহবুব। শিক্ষার্থী জীবনে মনছবির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল।

ওয়ার্কশপে আলোচনার পাশাপাশি 'শিক্ষার্থী মনছবি' ও 'আমার প্রিয়' মেডিটেশন দুটো ছাড়াও ছিলো আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তর পর্ব।

সেপ্টেম্বরে ব্লাড ক্যাম্পে দারুণ সাড়া





হলসিম-এর ১০১ তম বছর পূর্তি উপলক্ষে ৮ সেপ্টেম্বর মেঘনা ঘাটে এক ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সহযোগিতায় দিনব্যাপী এ ক্যাম্পটি পরিচালিত হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের এমডি রজনীস কাপুর ও ভাইস প্রেসিডেন্ট (ম্যানুফ্যাকচার) সোয়াং জেসোলিয়ার রক্তদানের মাধ্যমে ক্যাম্প কার্যক্রম উদ্বোধন হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও বেশ উদ্দীপনার সাথে ৬২ জন কর্মকর্তা কর্মচারী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

৯ সেপ্টেম্বর পারটেক্স গ্রুপ রক্তদান কার্যক্রমের আয়োজন করে। প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এইচ আর এন্ড এডমিন মো. আল মহসিন পাটোয়ারী এ রক্তদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এতে ৭২ জন সিনিয়র অফিসার রক্তদান করেন।

১৭ সেপ্টেম্বর ৪র্থ বারের মতো কেরানীগঞ্জ



জেলা পরিষদ মার্কেটে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কয়েকজন দায়িত্বশীলের উদ্যোগে একটি ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ব্যাপক আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়ে মার্কেটের কর্মীরা রক্তদান করেন। এ ক্যাম্প থেকে মোট ২০২ ব্যাগ রক্ত সংগৃহীত হয়।

এছাড়াও কারিতাস বাংলাদেশ, হোটেল র‍্যাডিসন ব্লু, ইমপেরিয়াল কলেজ, ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি (বিইউএফটি), সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন, গাউসিয়া সুপার মার্কেট ইত্যাদি স্থানেও ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।



ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনের জন্যে যোগাযোগ করুন
স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
ফোন : ০১৭১৪-০১০৮৬৯

লন্ডনে প্রবাসী গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে গুরুজী

দক্ষতা বাড়িয়ে সর্বোত্তম সেবা দিতে হবে



দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও কর্মব্যস্ততা মানুষকে সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে সহায়তা করে। তাই পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন দক্ষ হোন, দক্ষতা বাড়িয়ে সর্বোত্তম সেবা দিন। একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হিসেবে আপনার অনন্যতাকে আরো বিকশিত করুন। জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সবার ভরসাস্থলে পরিণত করুন নিজেকে।

২৪, ২৫ ও ২৬ আগস্ট লন্ডন আইকন কলেজ-এ এক বিশেষ সেমিনারে কথাগুলো বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। উল্লেখ্য, কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি লন্ডন আয়োজিত বেশ কিছু কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে গুরুজী এবং মা-জী ২১ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লন্ডনে অবস্থান করেন। সেখানে গুরুজী ও মা-জী কর্মব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেন।

২৬ আগস্ট লন্ডন প্রবাসী গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টারদের সাথে শ্রদ্ধেয়া মা-জীর বিশেষ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ ও ২৯ আগস্ট লন্ডনে যথাক্রমে গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টারদের নিয়ে গুরুজীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ ওয়ার্কশপ।

৩০ আগস্ট মা-জী কোয়ান্টাম টিভি স্টুডিও উদ্বোধন করেন এবং ফিতা কেটে কোয়ান্টাম টিভির লাইভ স্টুডিও উদ্বোধন করেন। একই দিনে গুরুজী ও মা-জী একটি লাইভ-ট্রান্সমিশন পর্যবেক্ষণ করেন।

৩১ আগস্ট গুরুজীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ জালালি দোয়া। একই দিনে কোয়ান্টিয়ারদের সাথে গুরুজীর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

৩ সেপ্টেম্বর মা-জী নাহার আল বোখারী অস্ট্রেলিয়া মালয়েশিয়া সুইজারল্যান্ড ইউএসএ বেলজিয়াম কানাডা আবুধাবি এবং টরেন্টো ও ইউএই-তে অবস্থিত সেলগুলোর আহ্বায়কদের সাথে টেলিফোনে কুশল বিনিময় করেন।

প্রোগ্রামগুলোর মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম পরিবারের লন্ডন প্রবাসী সদস্যরা দারুণ উজ্জীবিত হন। যাদের আত্মিক বন্ধন, স্নেহ, মমতা আর পথনির্দেশনা প্রবাসে প্রতিদিনের সঞ্জীবনী যোগায়–তাদেরকে কাছে পাওয়ার অনুভূতিও ছিলো অভাবনীয়।

সন্তান আলোকিত হোক মা-বাবার শ্রমে মমতায় প্রচেষ্টা আর দোয়ায়



সন্তান মা-বাবার অস্তিত্বের একটি অংশ। তাই পৃথিবীর সব মা-বাবারই প্রত্যাশা থাকে যে, তার সন্তান জ্ঞানে গুণে মেধায় মননে হোক একজন পরিপূর্ণ মানুষ। পৃথিবীর প্রতিটি শিশুর আলোকিত সন্তান হয়ে বেড়ে ওঠাকে নিশ্চিত করতে পারে মা-বাবার শ্রম, মমতা, প্রচেষ্টা আর দোয়া।

৩ সেপ্টেম্বর কাকরাইলে কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে অভিভাবক ও সন্তানের সম্পর্ক নিয়ে কোয়ান্টাম পরিবারের মায়েদের জন্যে এক বিশেষ প্রোগ্রামে কথাগুলো বলেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান। 'আলোকিত সন্তান গড়তে মায়ের ভূমিকা' নিয়েও তিনি দিক-নির্দেশনা দেন।

তিনি আরো বলেন, সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখানো থেকে শুরু করে হাত ধরে পৃথিবীকে চিনিয়ে দেয়ার কাজ একজন মাকেই করতে হয়। মায়ের এই চেনানো পথেই সন্তান সারা জীবন এগিয়ে যায়। জীবনে অনেক পরিস্থিতিতে পড়লেও যে শিক্ষা সে মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে, সেটাই তাকে চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত করে।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, একটি শিশুর প্রথম তিন বছরেই তার জীবনের নৈতিক ভিত্তি তৈরি হয়। তাই তখন ইতিবাচক পারিবারিক পরিবেশ এবং মায়ের সঙ্গ তার জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় সন্তানের ভালো-মন্দ, নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ–এর ভিত্তিটা পাকাপোক্তভাবে গড়ে তুলতে হয়। কারণ এ সময়ে শিশুর মস্তিষ্কের বৃদ্ধি হয় খুব দ্রুত। ফলে পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান শিশুর মস্তিষ্কে ও মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে।

'অভিভাবক ও সন্তানের সম্পর্কের যুগ যন্ত্রণা' বিষয়ে আলোচনায় অর্গানিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল বলেন, মায়েদের অবশ্যই নিয়মিত মেডিটেশন করা উচিত। ব্যস্ততার অজুহাতে কখনো যেন মেডিটেশন বাদ না পড়ে। কেননা মায়ের ইতিবাচক ও নেতিবাচক মানসিক অবস্থা সরাসরি সন্তানের ওপর প্রভাব ফেলে। মায়ের মনে যদি প্রশান্তি থাকে তাহলে সন্তান প্রশান্ত হবে। সন্তান দুরন্ত হতে পারে, চঞ্চল হতে পারে কিন্তু উদ্ধত বা অবাধ্য হবে না।

৭ সেপ্টেম্বর একই ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টাম এসোসিয়েট মা-বাবাদের জন্যে আরেকটি প্রোগ্রাম। এতে 'অভিভাবক ও সন্তানের সম্পর্কের টানাপোড়েন' বিষয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর অধ্যাপক ড. শাহ আলম। আলোকিত সন্তান গড়তে প্যারেন্টিং-এর দায়িত্ব মা-বাবা দুজনকেই ভাগ করে নেয়ার কথা বলেন তিনি। এছাড়া ছোটবেলা থেকেই সন্তানের কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। নতুবা সে একজন অলস আর দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে বেড়ে উঠবে, ঝুঁকে পড়বে সময় নষ্ট করার ক্ষতিকর মাধ্যমে।

'মা-বাবার সাথে সন্তানের সম্পর্কের সেতুবন্ধন' বিষয়ে আলোকপাত করেন অর্গানিয়ার নাঈম আহমেদ। সন্তানের রোল মডেল হওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, সন্তানকে সুযোগ্য করে গড়ে তুলতে হলে মা-বাবাকে তার রোল মডেল হতে হবে। কারণ, সন্তান তা-ই শেখে যা সে তার মা-বাবাকে করতে দেখে। অর্থাৎ সন্তানকে ভালো কিছু করাতে চাইলে তা আগে নিজেকে করতে হবে।

প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে অভিভাবক ও সন্তানের সম্পর্কের সমস্যা এবং বাস্তব অবস্থা যেমন স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে তেমনি উত্তরণের উপায় নিয়েও ছিলো দিক-নির্দেশনা। এ প্রসঙ্গে পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান বলেন, সন্তানকে নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে ছোটবেলা থেকেই। কারণ ছোট শিশুরা থাকে একেবারে কাদামাটির মতো। তার ভেতরে আদর্শ মানুষের একটা ছোট্ট মূর্তি আছে। সেই মূর্তিটাকে বের করে আনতে হয় মূলত মা-বাবাকে।

আলোকিত সন্তান গড়তে মায়ের করণীয়

১. প্রত্যেক মা নিয়মিত মেডিটেশন করুন। নিয়মিত মেডিটেশন করলে মায়েরা প্রো-একটিভ থাকতে পারবেন এবং সন্তানকে বুঝতে পারা এবং সন্তানের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া অনেক সহজ হবে।

২. প্রতিদিন পরিবার কণিকা পড়ুন।

৩. সপ্তাহে একদিন পরিবারের সবাইকে নিয়ে সুখী পরিবার মেডিটেশন করুন।

৪. আলোকিত পরিবার কার্যক্রমে নিয়মিত সপরিবারে, সবান্ধব অংশ নিন।

৫. সৎসঙ্গ মানুষকে আলোকিত হতে সাহায্য করে। তাই সন্তানকে সৎসঙ্গে একাত্ম করুন।

৬. প্রতিদিন মেডিটেশনে, নামাজে, উপাসনায় সন্তানের জন্যে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করুন।

অনেকে মনে করেন, সমস্যা নেই, দোয়ার প্রয়োজন কী? কিন্তু দোয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সন্তানের সাথে মা-বাবার বন্ধন হলো আত্মিক। প্রতিদিনের দিনযাপনে যে মমতার সেতু মা-বাবা গড়তে চান, তার ভিত সুদৃঢ় হয় যখন তারা দোয়ায় বা প্রার্থনায় লীন হন।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : অক্টোবর ২০১৩ ॥ সম্পাদক : কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইভোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 8319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন

নভেম্বর ২০১৩

১৫ নভেম্বর ২০১৩

আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানের শততম আয়োজন

১৫ নভেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানের শততম আয়োজন। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানে ৫০০ জন আজীবন রক্তদাতাকে সম্মাননা জানানো হবে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ গোলাম হোসেন।

কোয়ান্টাম ল্যাবে ন্যূনতম তিনবার রক্তদান করেছেন এমন আজীবন রক্তদাতাদের সম্মাননা জানানোর এ ধারাটি এক দশক আগে শুরু করে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম। সেই থেকে গত দশ বছরে ৯৯টি অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে দশ সহস্রাধিক স্বেচ্ছা রক্তদাতাকে বিশেষ ক্রেস্ট, আইডি কার্ড ও সার্টিফিকেট প্রদান করে সম্মাননা জানানো হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রথমসারির বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর উপাচার্য ও অধ্যক্ষসহ দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদগণ।

৬ ডিসেম্বর

পারিবারিক ওয়ার্কশপ

৬ ডিসেম্বর ঢাকার আইডিইবি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিশেষ গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ 'সফল পরিবার ॥ পর্ব-২'। আসন সীমিত। দ্রুত নাম নিবন্ধন করুন।

নভেম্বর ২০১৩-এর কর্মসূচি

কোয়ান্টাম বেসিক কম্পিউটিং প্রোগ্রাম
১, ২, ৩ ও ৪ নভেম্বর

কোয়ান্টামম গ্রাজুয়েট কোয়ান্টায়ন
৭, ৮ ও ৯ নভেম্বর

কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রম
মহিলা : ৮ ও ৯ নভেম্বর (শান্তিনগর)

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম
৮ ও ৯ নভেম্বর (মিরপুর)

কোয়ান্টামম প্রো-মাস্টার্স কোয়ান্টায়ন
১৪, ১৫ ও ১৬ নভেম্বর

অর্গানিয়ারদের উদ্দেশ্যে গুরুজী

লক্ষ্য সুস্পষ্ট হলে কাজই হয়ে ওঠে আনন্দের উৎস

ফাউন্ডেশনে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে। সে কাজগুলো আমরা সবাই সাধ্যমতো আন্তরিকতা নিয়ে করছি, করার চেষ্টা করছি। কারণ, আমাদের কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আমাদের কাছে পরিষ্কার। আর লক্ষ্য সুস্পষ্ট হলে কাজই হয়ে ওঠে আনন্দের উৎস।

২৩ অক্টোবর ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় অর্গানিয়ার ট্রেনিং প্রোগ্রাম 'অর্গায়ন'-এ গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক এ কথা বলেন।

গুরুজী বলেন, আমাদের কাছে আমাদের লক্ষ্য যত সুস্পষ্ট হবে আমরা তত আনন্দ নিয়ে কাজ করতে পারবো। আর এ আনন্দই আমাদেরকে আরো কাজের শক্তি যোগাবে, উদ্যমী করে তুলবে। আমরা আনন্দলোকে বিচরণ করতে পারবো। আমাদের কাজই তখন পরিণত হবে আমাদের আনন্দের উৎসে।

আসলে একজন মানুষ যখন জানে যে, সে কেন কাজ করছে এবং তার কাজের ফলাফল আর উদ্দেশ্যটাই-বা কী, তখন কাজটাই হয়ে যায় তার প্রথম ভালবাসা। কাজই তখন হয়ে ওঠে তার প্রেম। আসলে সেই কাজই ইতিহাস সৃষ্টি করে। সভ্যতাকে আলোকিত করে।

তিনি বলেন, ফাউন্ডেশনের শক্তিটা এখানেই। আমরা জানি, আমরা কেন কাজ করছি–নিজের ও অন্যের কল্যাণের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনই আমাদের লক্ষ্য। তাই আমাদের কাজই আমাদের আনন্দ।

আমরা যে একটু একটু করে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায় বিকশিত হচ্ছি, তার কারণও এটাই। কারণ আমরা যেকোনো কাজ যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে করার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বয়ে চলা ঝর্নার পানি যেমন জানে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে কীভাবে সমুদ্রে গিয়ে মিশতে হয়, তেমনি আমরাও জানি আমাদের গন্তব্য। আর এই জানাটাই আমাদের শক্তি। অন্যদের সাথে আমাদের পার্থক্যটাও মূলত এখানেই।

আমাদের চলার পথটা সবসময় মসৃণ নয়, কিন্তু আমরা হোঁচট খেলেও যেখানে পড়ি সেখানে থেমে থাকি না, আমরা পথ করে নিই। এই পড়াটা বরং আমাদের গতিটাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। গন্তব্যে পৌঁছার জন্যে নতুন পথের সন্ধান দেয় আমাদের। গতিকে কমায় না।

আমাদের মিশন আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট বলেই এটা আমরা পারি। তাই আমরা বলতে পারি, শুধু সাংগঠনিক জীবনেই নয়, ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক–যেকোনো পর্যায়েই এ বিষয়টি অর্থাৎ কাজের লক্ষ্য যার কাছে যত স্বচ্ছ থাকবে তিনি তত আনন্দলোকে বিচরণ করবেন।

গুরুজী বলেন, ফাউন্ডেশন দুদশক আগে তার যাত্রা শুরু করেছে। সেই থেকে এ পর্যন্ত লাখো জীবন বদলের পথ ধরে ফাউন্ডেশনের আজকের সাফল্যযাত্রা, অগণিত মানুষের আস্থা অর্জন এবং সঙ্ঘবদ্ধ অংশগ্রহণে নানামুখী সেবাধর্মী কাজ–এর সবই সম্ভব হয়েছে এই একটি কারণে। কারণ, প্রথম থেকেই আমাদের কাছে আমাদের লক্ষ্যটি ছিলো সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার। ফলে আমাদের চেতনা আর কাজই আমাদের কাছে সর্বাগ্রে প্রাধান্য পেয়েছে।

আমরা পরম করুণাময়ের কাছে শুকরিয়া জানাই যে, কাজ কখনো আমাদের ক্লান্ত করে নি, বরং আমাদের আনন্দ আর গতিকেই দিন দিন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

কোয়ান্টামে এসে তরুণরা আশা আর স্বপ্ন খুঁজে পাবে

অধ্যাপক সালমা আক্তার



একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে আমি শিশুদের নিয়ে ভাবি, আমাদের তরুণদের নিয়ে ভাবি। দেখি, তাদের অনেকের সামনেই কোনো লক্ষ্য নেই, কোনো ভবিষ্যৎ নেই, কেউ কেউ হতাশাক্রান্ত হয়ে মাদকে আসক্ত।

এর কারণ হিসেবে আমি মনে করি, আমাদের যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছে, সামাজিক কোনো প্রতিষ্ঠানও আর সেভাবে মানুষকে সহায়তা দিতে পারছে না, ফলে তরুণরা বুঝতে পারছে না–তারা কোথায় যাবে।

আমরা আসলে পরস্পর থেকে কেমন যেন ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছি, সবাই কাছে আছি, কিন্তু কেউ পাশে নেই। তাই অনেকদিন ধরে আমি এমন একটি প্লাটফরম খুঁজছিলাম, যেখানে গেলে আমাদের তরুণরা তাদের স্বপ্ন খুঁজে পাবে, বিশ্বাস ফিরে পাবে।

কোয়ান্টামে এসে আমি সেই প্লাটফরমটিই পেলাম, যেখানে এলে একজন মানুষ তার ব্যক্তিগত প্রত্যাশা, আশাবাদ আর প্রশান্তির একটা জায়গা খুঁজে পাবে, তরুণরা বাঁচতে শিখবে। আমরা সবাই পরস্পরের পাশাপাশি থাকতে পারবো।

এ ব্যাপারে এতটা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছি যে, কোর্সের প্রথমদিন থেকেই আমি বন্ধু-আত্মীয়স্বজনদের ফোন করে বলেছি–তারা যেন কোয়ান্টাম মেথডের পরবর্তী ব্যাচটি কোনোভাবেই মিস্ না করে।

[অধ্যাপক সালমা আক্তার, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৬৭ ব্যাচের প্রত্যয়নে তিনি এ কথা বলেন]

কোয়ান্টাম মেথড

৩৬৮ তম কোর্স

১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ নভেম্বর
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

৩৬৯ তম কোর্স

১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

ভেন্যু : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

অধ্যাপক ডা. আবিদ হোসেন মোল্লা। বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিওন্যাটোলজি বিভাগের প্রধান। শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা তিনটি। এছাড়াও দেশে-বিদেশে বিভিন্ন জার্নালে তার একশটিরও বেশি গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি তিনি যশোরে নিজ গ্রামে স্ব-প্রতিষ্ঠিত আমেনা-শাহাদাৎ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছেন। অধ্যাপক আবিদ কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩২৮ ব্যাচে অংশ নেন। কোয়ান্টাম বুলেটিনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন শিশু চিকিৎসক হিসেবে তার অভিজ্ঞতার নানা দিক এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন নিয়ে তার আশা ও উপলব্ধির কথা।

শিশু-কিশোরদের কল্যাণচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে কোয়ান্টাম মেথড

অধ্যাপক ডা. আবিদ হোসেন মোল্লা

কয়েকদিন আগে এক ভদ্রলোক তার মেয়েকে নিয়ে আসেন আমার চেম্বারে। তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার দোয়া নিতে মেয়েকে নিয়ে এলাম। ওর ছোটবেলায় আপনি ওর চিকিৎসা করতেন।'

এমন ছোট ছোট অসংখ্য ঘটনা আমার চিকিৎসক-জীবনের অনুপ্রেরণা, যা আমাকে প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ করে, আরো কাজ করার শক্তি যোগায়।



চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছাটা আমার খুব ছোটবেলা থেকেই। আমি যখন ক্লাস সেভেন-এ পড়ি তখন সদ্য বিলেত ফেরত ডা. শেখ নেছারউদ্দিন আহমেদ আমাদের স্কুলে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। খ্যাতিমান এই চিকিৎসক ছিলেন আমাদের এলাকারই একজন কৃতবিদ্য ও সফল চিকিৎসক, যিনি পরবর্তীকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হয়েছিলেন।

তার সেদিনের কথাগুলো আমার ভেতরে একটা শিহরণের জন্ম দেয়, আমি খুব আলোড়িত হয়ে উঠি। আমার মধ্যে একটা স্বপ্ন জেগে ওঠে–আমি চিকিৎসক হবো। মূলত তখন থেকেই আমি সে লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিতে থাকি। আমার কাছে আমার লক্ষ্যটা ছিলো স্পষ্ট। তাই ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর আমি কেবল মেডিকেল কলেজেই পরীক্ষা দিয়েছিলাম। এবং পরবর্তীতে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হই।

প্রথম থেকেই আমি শিশু-চিকিৎসক হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম। কারণ, আমার মনে হয়েছিলো, শিশুদের সামনে রয়েছে দীর্ঘ ভবিষ্যৎ, তাদেরকে সুস্থ ও ভালো রাখতে পারলে তারা তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারবে। তাদের জীবনটা সুন্দর হবে। ফলে সমাজ ও দেশকে অনেক বেশি কিছু দিতে পারবে ওরা। অর্থাৎ আমার কাজের ফলাফলটা হতে পারে দীর্ঘমেয়াদী।

প্রায় ৩০ বছর ধরে আমি শিশুদের চিকিৎসা করছি, শিশুদের নিয়ে কাজ করছি; কিন্তু আজও প্রতিদিন সকালবেলা হাসপাতালে গিয়ে যখন কোনো অসুস্থ শিশুর কষ্ট দেখি, ওদের অসহায় দৃষ্টি দেখি–কেউ হয়তো খেতে পারছে না, কারো হয়তো পেটে ব্যথা–তখন নিজের কাজের প্রতি, নিজের পেশার প্রতি আরো দায়বদ্ধতা অনুভব করি।

আমি মনে করি, আমরা ডাক্তাররা মানুষের সুখের অংশীদার হতে না পারলেও যেন তার দুঃখের অংশীদার হই, তার দুঃখের পাশে দাঁড়াতে পারি, সেই চেষ্টাই আমাদের সবসময় করা উচিৎ। একটি ঘটনা এখনো মনে আছে। আমি তখন নবীন চিকিৎসক, সবে ইন্টার্নশিপ শেষ করেছি। হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডে একটা বাচ্চা ভর্তি হলো। মেনিনজাইটিস। আমরা চিকিৎসা শুরু করার ঘণ্টা কয়েক পরেই বাচ্চাটি মারা গেল।

বাচ্চাটির মায়ের সে কী কান্না, আর্তচিৎকার আর আহাজারি; তার আগের তিনটি বাচ্চার একটি পানিতে ডুবে আর একটি রোগে ভুগে মারা যায়। একটি বাচ্চা নষ্ট হয় গর্ভপাতে। পরে শুনেছি, তীব্র শোকে সেই মা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। চিকিৎসক-জীবনের এই দীর্ঘ সময়ে এমনি নানা ধরনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি।

আবার যখন দেখি, অসুস্থ একটি শিশুকে নিয়ে হাসপাতালে বা চেম্বারে এসেছেন উদ্বিগ্ন মা-বাবা, অন্য অভিভাবকরাও বেশ উৎকণ্ঠিত, কিন্তু চিকিৎসা দেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো শিশুটি কিছুটা সুস্থ বোধ করতে শুরু করেছে, খেলাধুলা করছে, মা-বাবাও স্বস্তি অনুভব করছেন; তখন সত্যিই খুব আনন্দ হয়, তৃপ্তি পাই।

আসলে শিশুর পরিপূর্ণ সুস্থতা ও সুষম মনোদৈহিক বিকাশের জন্যে চিকিৎসকদের পাশাপাশি শিশুর মা-বাবা-অভিভাবক-স্বজন সবার সচেতনতা জরুরি। অনেক সময় শুধুমাত্র সচেতনতার অভাবেই আমরা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারি না, ফলে ভোগান্তি বাড়ে।

তাই একসময় মনে হলো, আমি তো শিশুর মা-বাবা-অভিভাবকদের কিছু বিষয়ে আগেই সচেতন করে তুলতে পারি। সেই ভাবনা থেকেই 'সোনামনির সুস্বাস্থ্যে মা : কিছু প্রশ্ন কিছু উত্তর' ও 'শিশুদের অ্যাজমা ও তার চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা' বই দুটি সংকলন করি, যেখানে শিশুপালন ও শিশুদের অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

একটি শিশুর লালনপালন ও তার স্বাভাবিক বিকাশের অনেকগুলো পর্যায় আছে। যেমন, শিশুর বয়স যখন তিন মাস তখন সে চারদিকে তাকাবে, কারণ এ সময়টাতে তার দৃষ্টিশক্তি বিকশিত হয়; কিন্তু তখন যদি তাকে দিনের পুরোটা সময় অন্ধকার ঘরে রেখে দেয়া হয়, পর্যাপ্ত আলো থেকে দূরে রাখা হয় তাহলে তার দৃষ্টিশক্তি ভালোভাবে বিকশিত হতে পারে না।

ঠিক তেমনি শিশুর যখন কথা শেখার বয়স তখন যদি সে অধিকাংশ সময় টিভি দেখাতেই মগ্ন থাকে তবে পরবর্তীতে তার যোগাযোগ-দক্ষতার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। অর্থাৎ শিশুর প্রতিটি স্বাভাবিক বিকাশের জন্যে একেকটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, অভিভাবকদের অবহেলা কিংবা কোনো কারণে যদি সেসময় শিশুর প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেয়া না হয় এবং সেই সময়টি পেরিয়ে যায় তাহলে শিশুর সুষম বিকাশ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এছাড়াও আছে খাদ্যাভ্যাসের বিষয়টি; যেমন, ফাস্টফুড। আমরা রীতিমতো জেনেশুনে এসব স্বাস্থ্যঘাতী খাবার শিশুদের মুখে তুলে দিচ্ছি, অথচ একই খরচে আমরা কয়েকগুণ বেশি পুষ্টিকর ও দেশীয় খাবার শিশুদের খাওয়াতে পারি। আর শিশুর জন্মের পর, তার ছয় মাস বয়সে, দুবছর পর থেকে কী খাওয়াতে হবে–সেটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরিষ্কার বলে দিয়েছে এবং তাতে কোথাও ফাস্টফুডের কোনো স্থান নেই।

আমার খুব ভালো লাগে যে, আমি আমার সাধ্যমতো স্বল্প পরিসরে যে কথাগুলো বলছি কোয়ান্টাম মেথড সেটি ছড়িয়ে দিচ্ছে আরো বিস্তৃত পরিমণ্ডলে। তাতে আরো বেশি মানুষ উপকৃত হচ্ছে। শিশু-কিশোর বয়সে, বয়ঃসন্ধিকালে, স্কুল-কলেজে পড়ার সময় কিছু মনোদৈহিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। আর তখন যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু দেয়া যায়, কল্যাণচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয় তাহলে তাদের জীবনটা অনেক সুন্দর হতে পারে। আমি মনে করি, সে কাজটিই অত্যন্ত সুন্দরভাবে করছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

আসলে এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রত্যেকে যদি আমাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে মানুষের জন্যে কাজ করতে পারি, সামগ্রিক কল্যাণে সঙ্ঘবদ্ধ ও একাত্ম হতে পারি তবে আমাদের সামাজিক জীবনটা আরো ভালো হতে পারে, শান্তিময় হতে পারে।

কারণ, আমি বিশ্বাস করি, একা ভালো থাকা যায় না। আপনি ভালো আছেন, খুশিতে আছেন, আনন্দে আছেন; সেই ভালো আর আনন্দটা যখন চারপাশে ছড়িয়ে দেবেন তখনই আপনি আরো ভালো থাকবেন। আপনার আনন্দটাও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আমার প্রণাম নেবেন। মা-জীকেও আমার প্রণাম। গুরুজী, আমাদের ধর্মীয় পার্বণগুলো এখন মূলত কেনাকাটার মহোৎসবে রূপ নিয়েছে। বিষয়টি বেশ কিছুদিন ধরে আমাকে খুব ভাবাচ্ছে। তাই আমি এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানার জন্যে পড়াশোনা করেছি। আমার কিছু ভাবনা আপনাকে জানালাম।

প্রতিটি ধর্মেই আছে কিছু বিশেষ দিন-তিথি-ক্ষণ-রাত্রি। এসব সময়ে ধর্মপ্রাণ মানুষেরা নিজ নিজ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার মহিমা প্রকাশ করে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে আমাদের করণীয় এবং বর্জনীয় সম্পর্কেও এ দিনগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয়। ফলে সবার কাছেই এ দিনগুলো আদরের, পালনের, সম্মানের।

আমাদেরও আছে এরকম কিছু পবিত্র দিন। ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, শারদীয় দুর্গাপূজা যার অন্যতম। সারাবিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে পবিত্র রমজান মাস নানান দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ একমাস পানাহার ও প্রবৃত্তির অন্ধ অনুসরণ বর্জন করার মধ্য দিয়ে এ মাসে একদিকে যেমন আত্মশুদ্ধি অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ থাকে, তেমনি এই পুণ্যমাস স্রষ্টার নৈকট্যলাভেরও চমৎকার সময়।

অন্যদিকে, সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে শারদীয় দুর্গোৎসবের ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম। যাপিত জীবনের কেন্দ্রে যে মৌলিক সত্যগুলো বিদ্যমান এবং সেইসাথে বিভিন্ন প্রতীকের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্বের মূল রহস্য চিন্তার সুযোগ আসে এই উৎসবের মাধ্যমে।

কিন্তু প্রচলিত আচার-আচরণ ব্যবস্থা আমাদের কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে? আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবো যে, এই ধর্মীয় তিথিগুলোর সাথে বেশ অনেকদিন ধরেই একটি অনুষঙ্গ যোগ করা হয়েছে। তা হলো, কেনাকাটার মহোৎসব। এখানে 'যোগ করা হয়েছে' এজন্যেই বলা হচ্ছে, কারণ উপরোক্ত ধর্মীয় তিথিগুলোর সাথে আদতে এই অনুষঙ্গগুলো কখনোই ছিলো না। এগুলো কালের বিবর্তনে এবং বিশেষত পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণে আমাদের জীবনযাত্রায় ঢুকে পড়েছে। আর কেনাকাটার এই মহোৎসব প্রকারান্তরে পাশ্চাত্য-মরণব্যাধি কনজিউমারিজম বা পণ্যদাসত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়, যা আমাদের সমস্ত মনোযোগকে কেনাকাটার উদগ্র প্রবণতায় নিমগ্ন রাখে। এর ফলে এই পবিত্র আচার-অনুষ্ঠানগুলোর মূল চেতনা এবং দায়িত্বগুলো থেকে আমরা নিজেদের অজান্তেই ক্রমশ দূরে সরে যাই আর শারীরিক মানসিক আত্মিক সামাজিক–সব ধরনের উপকার থেকেই নিজেদের বঞ্চিত করি।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, এতে ক্ষতিটা কোথায়? পাশ্চাত্যের সবই কি খারাপ? প্রশ্ন আসতো না, যদি না খোদ পাশ্চাত্যেই এ নিয়ে কথা উঠতো। ২০০৭ সালে আমেরিকান চলচ্চিত্রকার ও টিভি প্রযোজক মর্গান স্পার্লক 'What would Jesus buy?' শীর্ষক একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করেন। তাতে দেখানো হয়, ক্রিসমাস উপলক্ষে পুরো পাশ্চাত্যে 'সিজন অব গিভিং' পরিণত হয়েছে 'সিজন অব শপিং' আর 'সিজন অব আউট অব কন্ট্রোল কনজিউমারিজম'-এ।

ডকুমেন্টারিটিতে আরো বলা হয়, এই পুরো প্রবণতাটি তৈরি করা হয়েছে 'কমার্শিয়ালাইজেশন অব হলিডেজ' নামক একটি সুদীর্ঘ পরিকল্পনার মাধ্যমে। কারণ, পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো, সবকিছুই এখানে পুঁজি তৈরির হাতিয়ার। এরই ধারাবাহিকতায় সব ছুটির দিন আর উৎসবই এখন এর প্রধান লক্ষ্য। আর এই সর্বগ্রাসী পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়ে নি ধর্মীয় উৎসবকেন্দ্রিক ছুটির দিনগুলোও।

এই 'সিজন অব আউট অব কন্ট্রোল কনজিউমারিজম' বা 'কমার্শিয়ালাইজেশন অব হলিডেজ' মানে হলো–ধর্মীয় উৎসবকে ঘিরে নিজেকে চেনার-জানার, নিজের ভেতরে ডুব দেয়ার এই পবিত্র সময়গুলোকে 'সিজন অব শপিং'-এ পরিণত করলেই আমি আধুনিক(!) হতে পারলাম। কারণ, কেনাকাটা করতে পারলেই তুমি সমাজে মাননীয়, গ্রহণীয় হতে পারবে–এই মৌলিক অবিদ্যায় আক্রান্ত করে মানুষকে আত্মপর্যালোচনা আর আত্মনিমগ্নতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখাই কায়েমী স্বার্থবাদীদের মূল উদ্দেশ্য।



এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী হতে পারে?

প্রথমত, কেনার আগে আমাদের ভাবতে হবে, যা কিনতে যাচ্ছি তা আসলে কতটুকু প্রয়োজন? অর্থাৎ জিনিসটা না হলে আপাতত চলছে কি না।

দ্বিতীয়ত, কিনতেই যদি হয় তাহলে দামি ব্রান্ডের বিদেশি পণ্য কিংবা দেবদাস চুড়ি, বাজাজ পাঞ্জাবি, প্রেরণা শাড়ি না কিনে আমাদের দেশীয় পণ্য কেনা উচিত। তাহলে অন্তত দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে, দেশের ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন।

তৃতীয়ত, কেনার সময় বাজেট নির্ধারণ করে, সংযমী হয়ে যতটুকু টাকা বাঁচানো যাবে তা দিয়ে আমরা সৎদানে আগ্রহী হতে পারি।

গুরুজী, আমাদের জন্যে প্রার্থনা করবেন–আমরা সবাই যেন আমাদের যার যার ধর্মীয় পার্বণগুলোতে প্রচলিত সামাজিক অবিদ্যার অন্ধকারে ডুবে না যাই, বরং এর মূল চেতনাটি উপলব্ধি করার মাধ্যমে মহান স্রষ্টার নৈকট্যলাভের পরম সুযোগটি যেন আমাদের জীবনে আসে।

–সুমন ধর
সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব বিজনেস,
ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

ঈদ সালামি ॥ আশীর্বাদ না অত্যাচার!

সালাম যতটা শান্তির, তার চেয়েও বেশি অশান্তি বয়ে আনতে পারে সালামি, বিশেষত ঈদ সালামি। 'ঈদ সালামি' প্রসঙ্গে একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও মতামত জানিয়ে গুরুজীকে লেখা একটি চিঠির কিছু অংশ তুলে ধরা হলো–

এ বছর ঈদুল ফিতরের দিন একটি বেসরকারি রেডিও স্টেশনে ছোটদের ঈদ উদযাপন নিয়ে একটি মতবিনিময় অনুষ্ঠান হয়। সেখানেই উঠে আসে সালামি নিয়ে নতুন প্রজন্মের চিন্তা-ভাবনা। তাদের কাছে স্ট্যান্ডার্ড সালামির পরিমাণ হলো, কমপক্ষে ৫০ টাকা, সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা থেকে শুরু করে যার কাছ থেকে যত বেশি পাওয়া যায় এবং যার কাছ থেকে এই পরিমাণ সালামি পাওয়া যায় তিনি ব্যক্তি হিসেবেও তত ভালো। স্কুলপড়ুয়া এক ছেলে বলছিলো, তার কাছে ঈদের সময় তার মেজ মামা সবচেয়ে প্রিয়। কারণ, মেজ মামার কাছ থেকে সে সবচেয়ে বেশি সালামি পায়। বাবাও ভালো। কারণ, এক হাজার টাকা সালামি নিশ্চিত আসবেই। আর মা? ছেলেটির ভাষ্য, মা এত্ত কিপটে! এত্ত কিপটে! ১০০ টাকার বেশি দেবেই না কখনো।

আরেকজন তো সোজাসাপ্টা বলেই ফেললো, যে আমাকে ৫০ টাকা সালামি দেয় তাকে আমি চিরতরে টা টা/ বাই বাই জানিয়ে দেই। আর সালামি যদি ৫০ টাকার কম হয়? এ প্রশ্নের জবাবে আরো তীব্র প্রতিবাদ–'প্রশ্নই আসে না'। ১০০ বা ৫০০ টাকার ওপরে উঠলেই সেটা হবে সালামি।

সালামির টাকা দিয়ে শিশু-কিশোররা কী করে–এ প্রশ্নের জবাবে উত্তর এলো দুরকম। যারা একটু সহজসরল তারা সালামির টাকা মা'র হাতে তুলে দেয়। কিংবা মায়েরাই চেয়ে নেন। অন্যরা ঈদের তিনদিনের মধ্যেই তা খরচ করে ফেলে–মুভি দেখে, সিডি/ ডিভিডি কিনে, বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে ঘোরাঘুরি করে বা ফাস্টফুড, রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে। তাদের মতে এটাই ভালো, নগদ উপার্জনের নগদ ব্যবহার!

কোমলমতি এই ছেলেমেয়েদের কাছে সালামির মাহাত্ম্য আর সালাম করার মধ্যে সীমিত নেই। অল্পবয়সে এমন আচমকা উপার্জন কিছু সময়ের জন্যে হলেও তাদেরকে লোভী আর বেহিসেবী করে তুলতে পারে। নগদ অর্থ হাতে পেয়ে অভিভাবকের অগোচরে বন্ধুদের সাথে মিলে তারা মেতে উঠতে পারে ক্ষতিকর কোনো আনন্দে।

তাই এ ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতন হওয়া জরুরি। নগদ অর্থের পরিবর্তে বয়স অনুসারে ঈদ-উপহার হিসেবে তাদের হাতে তুলে দেয়া যেতে পারে শিক্ষণীয় কিছু, যা শিশু-কিশোরদের মধ্যে মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে। যেমন, সুন্দর ও প্রয়োজনীয় বাণী সম্বলিত স্টিকার কিংবা শিষ্টাচার, সুবচন, শিক্ষার্থী, অটোসাজেশনসহ বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক কণিকা, দেশ-বিদেশের শিক্ষণীয় বিভিন্ন বৈচিত্রময় বিষয়ের ওপর রচিত বই, আত্মনির্মাণমূলক বই, গল্প-কবিতা-ছড়া-জীবনীভিত্তিক বই ইত্যাদি, যা তাদের মেধা বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ঈদে সালামি হিসেবে শিশুদের হাতে নগদ অর্থ তুলে দেয়ার বদলে সেই টাকায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে ঘুরে আসতে পারেন স্থানীয় ও জাতীয় ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে, যেমন : জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, পুরনো ঢাকায় অবস্থিত আহসান মঞ্জিল, লালবাগের কেল্লা, ঢাকার অদূরে সোনারগাঁ জাদুঘরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে, যেখানে গেলে শিশু-কিশোররা দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে, দেশকে ভালবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে শিখবে।

অর্থাৎ ঈদ সালামির প্রচলিত বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে সেই টাকায় আপনার সন্তান ও পরিবারের সবার অংশগ্রহণে গঠনমূলক কিছু করুন, যা আমাদের প্রজন্মের সুষম বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে এবং তারা প্রত্যেকেই যেন হয়ে উঠতে পারে এক একজন আলোকিত মানুষ।

গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

ধ্যানে প্রশান্তি আসে

শাহনাজ আরেফিন



বসে বসে অলস সময় না কাটিয়ে একটু ধ্যান করলে তো পারি– এই ভাবনা থেকেই কোয়ান্টামে আসা, মেডিটেশন শেখার জন্যে। কোয়ান্টামের অনেক সদস্যের সাথে বিভিন্ন সময় দেখা হয়েছে, কেউ গুরুজীর প্রশংসা করেছেন, কেউ নিজেদের জীবনযাপনের উন্নতির কথা বলেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ হিসেবে মনে প্রশ্ন জেগেছে, এত কী আছে এখানে?

এখানে এসে দেখলাম, আমাদের গুরুজী দীর্ঘ ৪০ ঘণ্টা কোনো রোগ শোক রাগ দুঃখ মান অভিমানের কথা না বলে শুধুমাত্র ইতিবাচক একটা মোহময়তায় আমাদেরকে ঘিরে রেখেছিলেন। আমরা আজ প্রতিজ্ঞা করতে পারি–আজ থেকে আমাদের সমস্ত নেতিবাচকতা আমরা ভুলে যাবো, শুধু ইতিবাচক কথা বলবো। তাহলে প্রকৃতি আমাদের সে ইতিবাচকতাই ফিরিয়ে দেবে।

এসেছিলাম ধ্যান শিখতে। কতটা শিখতে পেরেছি জানি না, প্রক্রিয়াটা শিখেছি। এখন এর চর্চা করে যাবো। চারদিনে আরো যা বুঝেছি, অলীক চাকচিক্য নয় বরং নিজের চারপাশে সারাক্ষণ একটা স্নিগ্ধ সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখা–সেটাই তো প্রশান্তি। আর এ প্রশান্তিই তো আসে ধ্যানে।

[শাহনাজ আরেফিন, উপ-সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। ৩৬৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

এখন আমি সুস্থ আর আত্মবিশ্বাসী

ইনজামাম উল হক



ব্যাকপেইন, মাইগ্রেন, সাইনুসাইটিস ছাড়াও আমি মানসিক অস্থিরতায় ভুগছিলাম। বাসা থেকে তো দূরের কথা, ঘর থেকেই বের হতাম না। পড়াশোনা আর গিটার নিয়ে থাকতাম সারাদিন। আমার ১১/১২ বছর ধরে ব্যাকপেইন। আধঘণ্টার বেশি বসে থাকতে পারতাম না। অনেক সময় মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে একটু নিচু হয়ে গিটার বাজাতেই শুরু হয়ে যেত ব্যাকপেইন, আর গাইতে পারতাম না।

আল্লাহর রহমতে কোর্সে দ্বিতীয় দিন থেকেই আমার সে ব্যথা আর নেই। আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়েছে। এখন চারপাশের সবার সাথে কথা বলি। মানসিক অস্থিরতা একেবারেই নেই। গত ৮/৯ বছর ধরে রাতে আমার ঘুম হতো না। কোর্সে গুরুজী ঘুমানোর কিছু টেকনিক শিখিয়েছেন। এখন রাতে ঘুম হচ্ছে চমৎকার।

[ইনজামাম উল হক, এইচএসসি শিক্ষার্থী। ৩৬৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সুস্থ হওয়ার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে

ফাতিমা বেগম



গত বছর সামান্য বুকব্যথার কারণে ডাক্তারের কাছে গিয়েছি। আমি যে সুস্থ আছি–এটা জানার জন্যেই আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম না যে, ক্যান্সারের মতো একটি অসুখ আমি বহন করছি। একটা টেস্ট করার তিন সপ্তাহ পরে জানা গেল যে, আমার ব্রেস্ট ক্যান্সার। ছেলে ফারদিনকে নিয়ে আমি প্রবাসে একা থাকি। তাই এমন একটি সংবাদ কিছু সময়ের জন্যে আমাকে দিশেহারা করে দিয়েছিলো। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলাম, মনে মনে ভাবলাম, আমার মতো পৃথিবীর অনেকের এ অসুখ হয়েছে। সবাইকে একদিন মরতে হবে। আমি তো এর বাইরে না।

আমি সবসময় খুব উৎফুল্ল থাকার চেষ্টা করি, যাতে আমাকে দেখে রোগের জন্যে কেউ সমবেদনা জানাতে না পারে। কারণ সেটি হবে আমার জন্যে আরো যন্ত্রণাদায়ক। চিকিৎসা চলার কারণে দীর্ঘদিন আমাকে অবসর সময় কাটাতে হবে। তাই এই সময়ে 'ক্যান্সার আমাকে বাঁচতে শিখিয়েছে' নামে একটি বই লেখা শুরু করি। বইটি বাংলা, ইংরেজি এবং নরওয়েজিয়ান তিনটি ভাষায় প্রকাশিত হবে।

অসুস্থতার প্রতিটি ধাপ আমি সেখানে লিখছিলাম। কিন্তু কেমোথেরাপির জায়গায় এসে আমি থেমে গেলাম। কারণ, এটা এত ভয়ংকর অভিজ্ঞতা যে, আমি লেখা বন্ধ করে দিলাম। ইনশাআল্লাহ আমি আবার লেখা শুরু করবো।

আমার সারা গায়ে ব্যথা থাকায় বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারি না। দাঁড়িয়ে, বসে বা হাঁটাহাঁটি করে সময় কাটাই। চিকিৎসার জন্যে একবছর আমাকে বিছানায় পিঠ রেখে ঘুমাতে হয়েছে। একটা বছর এভাবে শোয়ার অভিজ্ঞতা ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক! যা শুধু ভুক্তভোগীই জানেন।

কিন্তু কোয়ান্টাম কোর্স করার পর থেকে আমি ইচ্ছেমতো ডানে, বাঁয়ে, উপুড় হয়ে–যেভাবে ইচ্ছা ঘুমাতে পারি। শরীরে কোনো ব্যথা নেই। এখন আমার সুস্থ হওয়ার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে।

[ফাতিমা বেগম, নরওয়ে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত]

ফারদিন

নরওয়েতে আমার জন্ম। সেখানেই আমি বড় হয়েছি। দেশে এলেই আমার এলার্জি আর এজমার সমস্যা বেড়ে যায়। কিন্তু এ কোর্সে এসে প্রথমদিন থেকেই আমি সুস্থ। এলার্জির কোনো ওষুধ খেতে হচ্ছে না। এবারই প্রথম আমি গরমে দেশে এসেছি। এবার তাই পেটে ব্যথাসহ হজমে সমস্যা হচ্ছিলো। খাওয়ায় রুচি ছিলো না। বমি হতো। কোর্সে এসে মেডিটেশন করার পর দ্বিতীয় দিন থেকে আমি খেতে পারছি। আমার পেটে কোনো ব্যথা নেই। বমিও হয় নি। খুব ভালো আছি। গুরুজীকে অনেক ধন্যবাদ।

[ফারদিন, নরওয়ে প্রবাসী। ৩৬৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

স্মৃতিশক্তি বেড়েছে পেয়েছি ধূমপানমুক্ত জীবন

মো. নূর আজম



কোয়ান্টাম কোর্স করে আমার অনেকগুলো সফলতার মধ্যে একটি হলো, আমার স্মৃতিশক্তি বেড়েছে। নাম মনে রাখতে পারতাম না। ২/৩ মাস পর কোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে তার নাম চিন্তা করতে করতেই অনেক সময় চলে যেত। আল্লাহর রহমতে কোর্স করার পর থেকে এখন এ সমস্যাটি আর নেই।

গত ৬/৭ বছর ধরে আমার ঠান্ডার সমস্যা। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠতাম নাক বন্ধ আর মাথাব্যথা নিয়ে। কোর্স করার পর থেকে এজমা আর সাইনাসের সমস্যাও আর অনুভব করছি না।

কোর্সে গুরুজী ধূমপান ছাড়ার টেকনিক শিখিয়েছিলেন। তারপর বিরতিতে সিগারেটে একটা টান দেয়ার পর ভেতরে এমন একটা অনুভূতি হলো যে, দ্বিতীয়বার আর ধূমপানের ইচ্ছে হয় নি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, এ থেকে যাতে চিরদিন মুক্ত থাকতে পারি। গুরুজীকে অনেক ধন্যবাদ– এমন একটি পথ আমাকে দেখানোর জন্যে।

[মো. নূর আজম, ব্যবসায়ী। ৩৬৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

উন্নতির শিখরে থাকতাম!

কাজী আব্দুন নাঈম



আমার শ্বাসজনিত সমস্যা আছে। তাই সেন্ট্রালি কন্ট্রোলড এসি রুমে দুই ঘণ্টার বেশি থাকা ডাক্তারের নিষেধ। প্রথমদিন কোর্সে একটা জাম্বো জ্যাকেট নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু পরার প্রয়োজন হয় নি। গাড়িতে বসলে ব্যাকপেইন হয় তাই সাথে একটি শক্ত বালিশ রাখতাম। কোর্সের তৃতীয় দিন পর সেটিরও প্রয়োজন হয় নি। চারদিন এসি-তে থেকেও আমার শ্বাসের কোনো সমস্যা হয় নি।

আমার অনেক রাগ ছিলো। কোর্সের পর আমি রাগ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি নি। আমার একটি ইচ্ছা ছিলো যে, ৬০ বছর বয়স হওয়ার পর নিজের ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করবো। কোর্স করার পর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছি। কমপক্ষে ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবো। এখন আফসোস হচ্ছে, ২০ বছর আগে এখানে এলে উন্নতির শিখরে থাকতাম। স্ত্রী আর মেয়ের অনুপ্রেরণায় আমার এ কোর্সে আসার সৌভাগ্য হয়েছে। তাদেরকে যে কত ভালবাসি তা নতুনভাবে উপলব্ধি করেছি কোয়ান্টামের এ কোর্সে এসে।

[কাজী আব্দুন নাঈম, ব্যবসায়ী। ৩৬৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

এ কোর্স ভালো মানুষ হওয়ার পাথেয়

এডভোকেট চন্দন দাস



আমার আইনজীবী এক বন্ধুর উৎসাহে একদিন একটি সাদাকায়ন অনুষ্ঠানে গেলাম। কোয়ান্টাম প্রকাশিত একটা বুলেটিন কিনে পুরোটাই পড়ে ফেললাম। প্রশ্নোত্তর পর্বের পাতায় গুরুজীর দেয়া উত্তরগুলো শুধু বিজ্ঞানসম্মত নয় বরং অত্যন্ত যুগোপযোগী, যা আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছে। এরপরই সিদ্ধান্ত নিয়েছি কোর্স করার।

বর্তমান সময়ে আমরা সবাই এক যান্ত্রিক জীবনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এই ব্যস্ত যান্ত্রিক সময়ে মেডিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ভালো থাকতে হলে, সুস্থ থাকতে হলে মেডিটেশনের কোনো বিকল্প নেই। ভালো মানুষ হওয়ার জন্যে যে পথ এবং পাথেয়–তারই সন্ধান দিচ্ছে এই কোর্স। কোর্সের সমস্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বার বার বলা হয়েছে, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই এবং কারো প্রতি রাগ নয়, ক্ষোভ নয়; সবাইকে ভালবাসুন, সবার কল্যাণ করুন।

[এডভোকেট চন্দন দাস, সভাপতি, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি। ৩৬৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

একজন বিশ্বাসী মানুষ হয়েছি

আনোয়ারা খাতুন



আমি প্রচণ্ড অবিশ্বাসী একজন মানুষ ছিলাম। এ ধরনের মানুষের মনে যে কত অশান্তি তা বোঝানো যাবে না। ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলাম। পরে বিভিন্ন কারণে বুঝতে পেরেছি, আমার মা-বাবা আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা-ই ছিলো প্রকৃত শিক্ষা। ধীরে ধীরে বিশ্বাসী হওয়ার চেষ্টা করলাম। তবে মনে ভয় ছিলো যে, এত দূরে সরে গেছি, এখন হয়তো আল্লাহর পথে ফিরে আসা আর সম্ভব না।

বাসায় আমার ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ ছিলো। আমি বাসায় এলেই সবাই আতঙ্কিত থাকতো। কোর্সের পর আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আর কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করবো না। এ মন্ত্র আমি কোর্সে থেকে পেয়েছি। কোর্সে গুরুজীর আলোচনা শুনে আর মেডিটেশন করে নিজের ভেতর এমন একটা পবিত্র অনুভূতি হয়েছে যে, এখন মনে হয় আল্লাহ অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আবার আলোকিত জীবনের পথে ফিরে আসতে পারবো। শুধু তা-ই নয়, আমার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো যারা অবিশ্বাসী ছিলো, এখন তাদেরকেও ভালো পথে ফিরিয়ে আনতে পারবো।

[আনোয়ারা খাতুন, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। ৩৬৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

অন্যের কল্যাণে কাজ করতে হবে

মো. মিজানুর রহমান



কোয়ান্টাম কোর্স করার জন্যে আমার স্ত্রী আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন। এখানে এসে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি। এত সুন্দর উপলব্ধি অর্জনের সুযোগ পাওয়ায় আমার স্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

ভৌগোলিক কারণে আমাদের দেশের মাটি নরম। আমাদের দেশের মানুষের মনও নরম। সেই নরম মনের মানুষগুলোকে গুরুজী শিক্ষা দিয়ে তাদের মেরুদণ্ডটাকে সোজা করে দিচ্ছেন। যার ফল এ কোর্সে এসে আমরা দেখলাম। বান্দরবানের লামায় অসহায় বঞ্চিত শিশুদের মানুষ করার কাজে তিনি একটা অসাধারণ কার্যক্রম শুরু করেছেন।

আল্লাহ মানুষকে শ্রেষ্ঠতম জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরস্পরের কল্যাণ করা। আমরা তখনই মানুষ হয়ে উঠবো, আমাদের এ প্রশিক্ষণ তখনই সার্থক হবে যখন আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করবো। নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দানসহ প্রতিদিন অন্যের কল্যাণে কাজ করতে হবে–এই শিক্ষা নিয়ে যাচ্ছি কোর্স থেকে।

[মো. মিজানুর রহমান, প্রভাষক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৬৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আঘাত রূপ নিলো শক্তিতে

আফরোজা আক্তার



কয়েক মাস আগে পারিবারিক নানা অস্থিরতায় আমার প্রচণ্ড এসিডিটির সমস্যা শুরু হয়। এমনকি স্যালাইনের পানি খেলেও বমি হয়ে যায়। শরীরও খুব দুর্বল। ক্লাসে আধঘণ্টা পর পর বিশ্রাম না নিলে হাত-পা কাঁপা শুরু হয়ে যেত। নিয়মিত ওষুধ খাওয়ার পরও দুর্বলতা যাচ্ছিলো না।

এর মধ্যে কোয়ান্টামের কিছু বই সংগ্রহ করে পড়ছিলাম। মনছবি বা অটোসাজেশন চর্চা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিলো না। আমার খুব পালপিটিশন হতো। ভালোভাবে ঘুমাতে পারতাম না। বইটা পড়ার পর অটোসাজেশন দিতে লাগলাম–'আমার হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে'।

কিছুদিন পর লক্ষ করলাম, আমার পালপিটিশন কমে গেছে। মনছবি দেখতে লাগলাম যে, আমি সুস্থ স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে কর্মময় জীবনযাপন করছি। ধীরে ধীরে ওষুধ ছাড়াই দুর্বলতা, শরীর কাঁপা–এসব দূর হয়ে গেল। কোর্সে এসে শিখলাম–আঘাতকে শক্তিতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া। আমার বিশ্বাস, এ শক্তি আর মেধা দিয়ে এখন নিজের ও অন্যের কল্যাণ করতে পারবো।

[আফরোজা আক্তার, প্রভাষক, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। ৩৬৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

এখন অন্যকে ক্ষমা করতে পারবো সহজে

কোর্সে প্রথমদিন আমার বাবা আমাকে নিয়ে এসেছিলেন। যাওয়ার সময় কোয়ান্টিয়ারদের বলে গেছেন, তারা যেন আমার দিকে লক্ষ রাখে। কারণ আমি একা হাঁটতে পারি না, পড়ে যাই। অ্যাজমার সমস্যা আছে, কষ্ট হচ্ছিলো, তারপরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে, আমাকে কোর্সে আসতেই হবে।

দাম্পত্যজীবনে আমি খুবই সুখী একজন মানুষ। কিন্তু পারিবারিকভাবে কিছু সমস্যায় ছিলাম। সংসারে ছোটখাটো এমন অনেক কিছু ঘটে, যার ফলে অশান্তিগুলো জমতে জমতে ভেতর থেকে তা মানুষকে শেষ করে দেয়। দীর্ঘদিন এভাবে চলতে চলতে যেদিন একবারে সব প্রকাশ পেলো ততদিনে আমি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে গেছি। অসহ্য যন্ত্রণায় রাতের বেলা আমি দেয়ালে মাথা ঠুকতাম। পরিবারের সদস্যরাও অস্থির হয়ে উঠলো আমার এ অবস্থা দেখে।

আমার মা ঝাড়ফুঁক থেকে শুরু করে আমার সব ধরনের চিকিৎসা করিয়েছেন। যখন কোনো কিছুতে সুস্থ হচ্ছিলাম না তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমার চিকিৎসা আমিই করবো। আমার মন আমিই নিয়ন্ত্রণ করবো। সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেলাম। আমার সাইকোথেরাপি চলতে থাকলো। কিন্তু একসময় মনে হলো, এটা আমাকে সুস্থ করছে না বরং আমার ক্ষতি হচ্ছে। সব শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম, কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করবো। অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাতে নিজের সুখ নষ্ট না হয়, নিজের মনকে যাতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, সেজন্যেই আমার এ কোর্সে আসা।

আগে যে বিষয়টা আমাকে খুব যন্ত্রণা দিচ্ছিলো, কোর্স করার পর মনে হলো, সেটা ছিলো খুবই তুচ্ছ একটা ব্যাপার। যার খুব সহজ সমাধানও ছিলো। অথচ আমি সেটা নিজের মধ্যে চেপে রাখতে রাখতে অসুস্থ হয়ে গেছি। একসময় নিজের সমস্যা পরিবারের অন্য সবার মাঝেও ছড়িয়ে দিয়েছি।

কোর্সে প্রথম দুদিন দুশ্চিন্তা আর অস্থিরতার কারণে এজমায় কষ্ট হচ্ছিলো। কিন্তু তৃতীয়দিন থেকে আমি হাসতে শুরু করলাম। আশেপাশে সবার সাথে কথা বলতে লাগলাম।

আল্লাহর কাছে অনেক শুকরিয়া যে, আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি। কোর্স শেষে মনে হলো, যার কারণে আমার ভেতরে এত রাগ-ক্ষোভ-ঘৃণা জমা হয়েছিলো আর যাদের কারণে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেবো। এই ক্ষমাই আমার জীবনে শান্তি নিয়ে আসবে।

[নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট]

সবসময় বিশ্বাস করুন যে, আপনি সুস্থ হবেন।
সুস্থতার ব্যাপারে আশাবাদ নিরাময় প্রক্রিয়াকে বেগবান করে।

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *আমি কাউকে টাকা বা অন্য কিছু ধার দিয়ে তা সময়মতো ফেরত পাবো কি না–এ নিয়ে ভয় পাই। কিন্তু পরিচিত বা কাছের কেউ হলে 'না' বলতে পারি না। আমার করণীয় কী?*

উত্তর : এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ধার না দেয়া। খুব বিনয়ের সাথে বলা যে, ধার দেয়ার মতো টাকা আমার কাছে নেই। 'টাকা নেই' বলা যাবে না। কারণ 'টাকা নেই' বললে ভুল বলা হবে। বলতে হবে যে, দিতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম কিন্তু 'ধার দেয়ার মতো টাকা' আমার কাছে নেই।

দ্বিতীয়ত, কাউকে যদি টাকা ধার দিয়েই দেন তবে আর ফেরত পাওয়ার প্রত্যাশা করবেন না। এ নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তাও করবেন না। তিনি যদি নিজ থেকে টাকা ফেরত দেন তাহলে আপনি ভাগ্যবান, কিন্তু আপনি টাকা ধার দেবেন আবার একই সাথে দুশ্চিন্তা করবেন সেটা যুক্তিসঙ্গত হবে না।

অনেক সময় ধার না দিলে কিংবা ধার দেয়া টাকা ফেরত না পেলে সম্পর্ক নষ্ট হয়। আর টাকা না দেয়ার কারণে যদি কারো সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয় তাহলে বুঝতে হবে, এটা কোনো সম্পর্কই ছিলো না। এ সম্পর্ক ছিলো শুধু টাকার জন্যে। অতএব ধার দেয়া থেকে বিরত থাকলে তিনদিক থেকে আপনি উপকৃত হচ্ছেন।

তবে কখনো যদি মনে করেন যে, কারো যথার্থই টাকার প্রয়োজন, টাকার কথা তিনি বলতে চাচ্ছেন কিন্তু বলতে পারছেন না। তখন সামর্থ্য থাকলে তার প্রতি আপনার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। সেটা হতে পারে ধার হিসেবে অথবা সহায়তা হিসেবে।

প্রশ্ন : *সিদ্ধান্ত নিতে আমি অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগি। সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে যায়। কী করবো?*

উত্তর : সিদ্ধান্তহীনতাও একটা চোরাবালি। এর জন্যে নিয়মিত শিথিলায়ন মেডিটেশন করবেন। সিদ্ধান্তহীনতা মানে হচ্ছে অস্থিরতা। অস্থিরতা মানে হচ্ছে আপনার জীবনে শিথিলতা আসে নি। অস্থিরতা যখনই থাকবে বুঝতে হবে যে, আপনি শিথিল হতে পারছেন না। এ থেকে উত্তরণের জন্যে নিয়মিত দুই বেলা শিথিলায়ন মেডিটেশন এবং অটোসাজেশন অনুশীলন করে যান। দিনে যখনই সময় পাবেন 'আত্মজাগরণ' সিডির ২ নম্বর ট্র্যাকটি শুনবেন। এটি আপনার ভেতরের শক্তিকে জাগ্রত করবে। নিজের ওপর আস্থা আসবে। ফলে আপনার অস্থিরতা থাকবে না। আপনি প্রশান্ত হতে পারবেন। আপনার জীবনে সিদ্ধান্তহীনতা থাকবে না। আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

প্রশ্ন : *বাসার লোকজন কী ভাববে, বাইরের লোকে কী ভাববে–সবসময় এই চিন্তা কাজ করে। যেকোনো কাজ করতে গেলেই এ জাতীয় নেতিবাচকতা দিয়ে আক্রান্ত হই। এ থেকে মুক্তির জন্যে কী করতে পারি?*

উত্তর : চারপাশের অধিকাংশ মানুষ নেতিবাচক থাকবে, এটাই বাস্তবতা। ২১ বছর আগে আমরা যখন মেডিটেশন শুরু করেছিলাম তখন চারপাশটা আজকের চেয়ে অনেক বেশি নেতিবাচক ছিলো। কিন্তু আল্লাহর রহমতে মেডিটেশন সম্পর্কে এখন প্রশ্ন অনেক কম। অতএব অন্যের কর্মকাণ্ডের নেতিবাচকতা দিয়ে আপনি প্রভাবিত হবেন না।

আমরা সবসময় আমাদের বিশ্বাসে প্রবল থেকেছি। অন্যদের অনেক কথা আমরা শুনেছি, কিন্তু কারো কথায় প্রভাবিত হই নি। একজন মানুষ যিনি সত্যের আলোয় আলোকিত হতে চান তিনি শুধু সত্য দ্বারা প্রভাবিত হবেন, তিনি কখনো অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। আর নেতিবাচকতা দিয়ে তো নয়ই।

রসুলুল্লাহ (স)-এর জীবন যদি আমরা দেখি, তাঁর বহু প্রতিকূলতা ছিলো। তারপরও তিনি কখনো অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হন নি। তিনি সবসময় সত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, সত্যকে গ্রহণ করেছেন, সত্যকে প্রচার করেছেন এবং সত্য পালনে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

প্রশ্ন : *অন্যের ঘরে যাওয়ার আগে কি আমার আপনজনকে আলোকিত করা প্রয়োজন নয়? আমি এখনো তা করতে পারি নাই।*

উত্তর : দুটোই প্রয়োজন। আপনজনকে আলোকিত করা প্রয়োজন এবং অন্যের ঘরকেও আলোকিত করা প্রয়োজন। আপনজন কখনো কখনো অন্যের দ্বারাও আলোকিত হয়। আপনি সরাসরি বললে প্রভাবিত হবে, নাকি অন্য কারো মাধ্যমে বললে প্রভাবিত হবে, সেটা বুঝতে হবে। যেমন, রসুলুল্লাহ (স) মক্কার লোকদের প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন মদীনায় যাওয়ার পরে। যদিও তারা সবাই ছিলেন রসুলুল্লাহ (স)-এর আত্মীয়স্বজন অর্থাৎ আপনজন।

অতএব সবসময় সহজে গ্রহণযোগ্য জায়গায় আগে যাবেন। যাকে মনে হবে যে, এর সমস্যা আছে, তাকে আগে পরামর্শ দিলে সহজে তার সমস্যাটা দূর হয়ে যাবে, সেখানে যাবেন। তাই আমাদের ৪০ ঘরে সংযোগায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আপনজনকে আলোকিত করা অবশ্যই জরুরি। আপনজনকে আলোকিত করার জন্যেই কোনো কোনো সময় আগে অন্যকে আলোকিত করার প্রয়োজন হয়। আর সত্য কখনো শুধু আত্মীয়ের জন্যে নয়, সত্য কখনো শুধু আপনজনের জন্যে নয়, সত্য সার্বজনীন। সত্য সবার জন্যে।

প্রশ্ন : *আমি অনেক ভাগ্যবান একজন মানুষ। কারণ আমি কম কাজ করেও বেশি ফল পাই। যেমন পড়ালেখা না করেই ক্লাসে আমার রোল ৫-এর মধ্যে থাকে। কিন্তু কেউ কেউ আমার চেয়ে অনেক বেশি পড়ালেখা করেও সেটা পারে না। সমস্যা হচ্ছে, আমি কখনো ক্লাসে প্রথম হতে পারি না। তাহলে কি এটা আমার সাফল্যের চোরাবালি?*

উত্তর : অবশ্যই। সমস্যার শুরুটা এখান থেকেই। কারণ সহজে কিছু পেয়ে গেলে সেই পাওয়ার গুরুত্বটা আমরা বুঝি না। অতিরিক্ত মেধাও একটা চোরাবালি হতে পারে। আমাদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, অতিরিক্ত মেধার অধিকারীরা জীবনে বড় কিছু করতে ব্যর্থ হয়। কারণ তারা মনে করে যে, তারা সব পারে। একটা জিনিসকে নিখুঁত করার জন্যে সুন্দর করার জন্যে লেগে থাকতে হয়, পরিশ্রম করতে হয়। সে যেহেতু সহজে পারে তাই তার দ্বারা আর লেগে থাকা হয় না। তাই অতি মেধাবী যারা ক্লাসে প্রথম হয় তাদের ৯০ ভাগ জীবনে প্রথম হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, তারা তাদের মেধার জন্যে পরিবার, আত্মীয়স্বজন, সহপাঠী, শিক্ষক সবার কাছে সবসময় একটা বাড়তি মনোযোগ পেয়ে অভ্যস্ত থাকেন। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর এই মনোযোগটা আর তারা পান না। তখন এ অবস্থার সাথে মানসিকভাবে তারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেন না। ফলে তাদের মধ্যে হতাশা চলে আসে। তবে এই সমস্যাটিকে যারা অতিক্রম করতে পারেন তারা জীবনে সফল হতে পারেন, প্রথম হতে পারেন।

আসলে যারা অন্যের মনোযোগ প্রত্যাশা করেন না বরং অন্যকে মনোযোগ দিতে চান, তারাই জীবনে প্রথম হন। মনোযোগ প্রত্যাশা করে কেউ কখনো প্রথম হয় না, কারণ সে গ্রহীতা। আপনি তো মনোযোগ প্রত্যাশা করছেন, ফলে আপনি গ্রহীতার দলে চলে যাচ্ছেন। আর যিনি মনোযোগ দেন তিনি হচ্ছেন দাতা। দাতাদের নামই ইতিহাসে থাকে। গ্রহীতাদের নাম ইতিহাসে থাকে না। আর থাকলেও করুণার সাথে থাকে।

এটাই হচ্ছে মেধার চোরাবালি। মেধা আছে কিন্তু প্রচেষ্টা নেই। জীবনে সফল হতে হলে ধার এবং ভার দুটোই লাগে। 'ভার' হচ্ছে মেধা। আর 'ধার' অর্জন করতে হয়। এটিকে শান দিতে হয় সবসময়। তাহলেই ধারটা থাকবে।

অতএব মেধাবী হওয়ার এ সৌভাগ্যও চোরাবালি হতে পারে। এ কারণেই যারা সৌভাগ্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের অবদান পৃথিবীতে সবচেয়ে কম। কারণ তারা জন্মের পরই সৌভাগ্য দেখেছে, অভাব দেখে নি। তাই এটিকে ধরে রাখার কৌশলও তার জানা থাকে না। আপনার যেহেতু কম পড়াশোনা করেই ক্লাসে রোল ৫-এর মধ্যে থাকে, ভালোভাবে পড়াশোনা করলে অনেক ব্যবধানে আপনি প্রথম হতে পারেন। তাই নিজের সৌভাগ্যকে কাজে লাগান, আপনি ক্লাসে প্রথম হবেন, জীবনেও প্রথম হবেন।

প্রশ্ন : *ব্যর্থতাকে স্মৃতি করতে চাই না। তবে ব্যর্থতার ফলে ভেতরে নেতিবাচকতার পাশাপাশি ভয়ও সৃষ্টি হয়েছে। সাফল্য ও সফলতার অনুরণনে থাকতে চাই। ভয়ের জন্যে হচ্ছে না। এখন কী পদক্ষেপ নিলে ভালো হবে?*

উত্তর : নিয়মিত শুকরিয়ার মেডিটেশন করবেন। আপনি দেখবেন, ব্যর্থতার স্মৃতি বলে কিছু থাকবে না। ব্যর্থতাকে কখনো স্মৃতি করে রাখবেন না। স্মৃতি হবে সবসময় সুখস্মৃতি। সুখটাকে স্মৃতি হিসেবে রাখবেন। একটা সুখস্মৃতি অন্য সুখস্মৃতিকে আকর্ষণ করবে। আর ব্যর্থতাকে যদি স্মৃতি হিসেবে রাখেন তাহলে আপনার মস্তিষ্ক অবচেতনভাবে ব্যর্থতাকেই আকর্ষণ করবে। আরো ব্যর্থতা টেনে নিয়ে আসবে। অতএব, ভেতরে সুখস্মৃতি রাখবেন, সাফল্যের স্মৃতি রাখবেন। আপনি সফল হবেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

সুবিধা গ্রহণের মূল্য পরবর্তীতে অনেক বেশি দিতে হয়। তাই যেকোনো সুবিধা গ্রহণের ব্যাপারে সতর্ক থাকবো।

বিশ্ব যুব অলিম্পিক কন্টিনেন্টাল কোয়ালিফাইং টেস্টে ৪র্থ কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ছাত্র প্রেননয় মুরং



আর্চারি ভেন্যু তাইপে সংসান ডিস্ট্রিক্ট-এ প্রেননয় মুরং

তাইওয়ানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব অলিম্পিক গেমসের কন্টিনেন্টাল কোয়ালিফায়িং টেস্টের ইলিমিনেশন রাউন্ডে জুনিয়র আর্চারি পুরুষ বিভাগে ৪র্থ হয়েছে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্বকারী কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র প্রেননয় মুরং। ২৯ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর তাইওয়ানের রাজধানী তাইপে-তে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

এই খেলায় কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে পুরুষ বিভাগে আটটি দেশের ১৮ জন আর্চার অংশগ্রহণ করেন। এতে প্রেননয় মুরং ৬০ মিটার দূরত্বে ৭২টি তীর ছুঁড়ে ৭২০-এর মধ্যে ৬১৬ স্কোর করে র‍্যাংকিংয়ে ৫ম স্থান অধিকার করে।

৩১ অক্টোবর ২০১৩ বৃহস্পতিবার প্রেননয় ফিলিপাইনের খেলোয়াড় সান্তিয়াগো জন ফিলিপকে ৬-৪ সেট পয়েন্টে এবং জাপানের মুতো হিরুকিকে টাইব্রেকারের মাধ্যমে হারিয়ে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়। পরে সেমিফাইনালে টুর্নামেন্টের শীর্ষ র‍্যাংকিংধারী ফিলিপাইনের মোরেনো লুইস গ্যাব্রিয়েলের কাছে ২-৬ সেট পয়েন্টে পরাজিত হয়। শেষে ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে কাজাখস্তানের ইয়াগুদিয়েব আনসারের সাথে ৪-৬ সেট পয়েন্টে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে প্রেননয় ৪র্থ স্থান অর্জন করে।



তাইওয়ান যাত্রার প্রাক্কালে সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের সাথে কসমো স্কুলের ছাত্র প্রেননয় মুরং (ডান থেকে ৪র্থ)

শিল্পকলা একাডেমীতে মেডিটেশন কর্মশালা



বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হলো মেডিটেশন বিষয়ক একটি কর্মশালা। ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এ সভায় উপস্থিত ছিলেন দেশের বিভিন্ন জেলার শিল্পকলা একাডেমীতে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত ৩৪ জন সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা।

সাংস্কৃতিক কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত দুই মাসব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই মেডিটেশন বিষয়ক কর্মশালাটি স্থান পায়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে আয়োজিত পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী দুইদিনের এ কর্মশালায় মেডিটেশন সংক্রান্ত আলোচনার পাশাপাশি ছিলো প্রশ্নোত্তর পর্ব।

শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব লিয়াকত আলী লাকীর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় মূল আলোচক ছিলেন ফাউন্ডেশনের অর্গানিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল। ফাউন্ডেশনের মিডিয়া সেল-এর আর্ডেন্টিয়ার সাবিয়া সিদ্দিকী এ কর্মশালা আয়োজনে উদ্যোগ নেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেডিটেশনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ হন।

ভারতেশ্বরী হোমস ও কুমুদিনী মেডিকেল কলেজ-এ কোয়ান্টাম সভা



২৫ অক্টোবর টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে অবস্থিত ভারতেশ্বরী হোমস ও কুমুদিনী মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিয়ে তিনটি কোয়ান্টাম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ফাউন্ডেশনের মোহাম্মদপুর শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দেড় ঘণ্টাব্যাপী কোয়ান্টাম সভায় কুমুদিনী মেডিকেল কলেজের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী, নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থী, স্টাফ ও শিক্ষক মিলিয়ে মোট ১৩৭ জন উপস্থিত ছিলেন। এরপর ভারতেশ্বরী হোমসের প্রায় চার শতাধিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের উৎসাহে একটি মেডিটেশনও পরিচালনা করা হয়।

সন্ধ্যায় হোমসের আগ্রহী শিক্ষকদের নিয়ে ভিডিও ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি প্রোগ্রামে সফল শিক্ষার্থী জীবন গড়তে বিশেষ আলোচনা ও মেডিটেশন পরিচালনা করেন অর্গানিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল এবং 'শিক্ষার্থী জীবনের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় আলোচক নাফিজ ইমতিয়াজ।

মতিঝিল শাখার বার্ষিক আর্ডেন্টিয়ার ও কোয়ান্টিয়ার ওয়ার্কশপ

২৫ অক্টোবর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মতিঝিল শাখার উদ্যোগে কাকরাইলের কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে বার্ষিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এ ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন শাখার আর্ডেন্টিয়ার বিশ্বজিৎ রায়। আরো উপস্থিত ছিলেন শাখার মোমেন্টিয়ার অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্তাব।

ওয়ার্কশপে আলোচনা করেন এড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মো. মমিনুল ইসলাম রিংকু এবং অর্গানিয়ার মারুফ ইবনে মাহাবুব। এ ওয়ার্কশপে শাখার মোট ১১৮ জন আর্ডেন্টিয়ার ও কোয়ান্টিয়ার উপস্থিত ছিলেন।

ধানমণ্ডি শাখার বিশেষ ওয়ার্কশপ

১১ অক্টোবর ফাউন্ডেশনের ধানমণ্ডি শাখায় কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টারদের নিয়ে একটি বিশেষ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে 'পরিবারের সদস্যদের মেডিটেশনে উদ্বুদ্ধ করার গুরুত্ব এবং এ লক্ষ্যে করণীয়' বিষয়ে আলোচনা করেন অর্গানিয়ার ইমাম উদ্দীন চৌধুরী।

এরপর 'সঙ্ঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ ও উত্তরণের পথ'–এ বিষয়টি নিয়ে তিনি আরেকটি আলোচনা করেন। 'মনছবি বাস্তবায়নের পথ : সেবা ও দান' শীর্ষক আলোচনা করেন ধানমণ্ডি শাখার আর্ডেন্টিয়ার জহিরুল ইসলাম। মোট ৮১ জন গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার এ ওয়ার্কশপে অংশ নেন।

অক্টোবর জুড়ে অজেয় ১৯



২৬ অক্টোবর ২০১৩ ধানমণ্ডির ইউনিভার্সিটি ওমেন্স ফেডারেশন কলেজে অজেয় ১৯ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের অধ্যক্ষ আফরোজা আখতার, উপাধ্যক্ষ এবং কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্য মোস্তফা আজিজ মানসূর রঞ্জু এতে বক্তব্য রাখেন। দুশতাধিক ছাত্রী ও ২০ জন শিক্ষকের উপস্থিতিতে অজেয় ১৯ অনুষ্ঠানে রক্তদান সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং রক্তদানের উপকারিতা নিয়ে বিশেষ আলোচনা করা হয়। এছাড়াও অক্টোবর মাসে ঢাকার সায়েদাবাদের আর কে চৌধুরী ডিগ্রী কলেজ, উত্তরার ট্রাস্ট কলেজ, ধানমণ্ডির ঢাকা মহিলা কলেজে অজেয় ১৯ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনা করেন অর্গানিয়ার তুহিন দাস টিটো।

জীবনে সফল হওয়ার পথ প্রথমায়নের শততম ব্যাচপূর্তি



৮ ও ৯ নভেম্বর কাকরাইলের কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রথমায়ন কার্যক্রমের শততম ব্যাচ। জীবনে সফল হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো নিয়েই সাজানো হয়েছে প্রথমায়ন কার্যক্রম।

কোয়ান্টাম বিশ্বাস করে, সাফল্য প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। সফল হওয়ার জন্যে প্রয়োজন শুধু সফল হওয়ার ইচ্ছা, দৃঢ় বিশ্বাস আর শ্রমানন্দে অব্যাহত কাজ। আর এজন্যে প্রয়োজন জানাকে মানায় রূপান্তর করা।

প্রথমায়ন কার্যক্রমে অংশ নেয়ার মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটদের জন্যে জানাকে মানায় রূপান্তর হয় সহজ। যারা আত্ম উন্নয়নের সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে চান, মেধাকে বিকশিত করে সাংগঠনিক নেতৃত্বের গুণাবলিতে সমৃদ্ধ হতে চান তাদের জন্যে প্রথমায়ন অত্যন্ত সহায়ক।

ফাউন্ডেশনের কোয়ান্টিয়ার হিসেবে আত্ম উন্নয়ন ও সেবামূলক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে প্রথমায়ন এক অনন্য সুযোগ। এতে রয়েছে নিজের জীবনকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নেয়ার পাশাপাশি সৃষ্টির কল্যাণে কাজ করার দিক-নির্দেশনা।

প্রথমায়নে রয়েছে বিষয়ভিত্তিক চমৎকার কিছু আলোচনা। প্রতিটি আলোচনা অংশগ্রহণকারীদের পারিপার্শ্বিকতার নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত হয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগায়, করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান।

দুদিনের এই কার্যক্রমে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, মেডিটেশন ছাড়াও রয়েছে প্রশ্নোত্তর পর্ব। এছাড়াও অংশগ্রহণকারীদের সমন্বয়ে রয়েছে গ্রুপ ডিসকাশন ও ব্যক্তিগত এসাইনমেন্ট পর্ব। প্রথমায়ন কার্যক্রমের উৎসবমুখর এই শততম ব্যাচের মধ্য দিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে সাফল্যের এক নতুন অধ্যায়।

উল্লেখ্য, মে ২০০৮-এ ঢাকায় প্রথমায়নের প্রথম ব্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়।



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমানের পরিচালনায় এ পর্যন্ত ঢাকাসহ ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম কুমিল্লা কক্সবাজার খুলনা যশোর রাজশাহী বগুড়া দিনাজপুর রংপুর পাবনা চাঁপাইনবাবগঞ্জ সিলেট সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জ ও বরিশালে এর একাধিক ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।



স্বেচ্ছা রক্তদানের এ প্রচেষ্টা চিরদিন জাগরূক থাকুক

গত ২৯ মে ও ২৬ জুন অনুষ্ঠিত হলো শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানের ৯৮ ও ৯৯ তম আয়োজন। এখন পর্যন্ত ন্যূনতম তিনবার রক্ত দিয়েছেন এমন দুশতাধিক আজীবন রক্তদাতাকে অনুষ্ঠানে বিশেষ ক্রেস্ট প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা জানানো হয়। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান দুটি অনুষ্ঠিত হয় কাকরাইলের কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে।

৯৮ তম আয়োজনের প্রধান অতিথি ছিলেন নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার জনাব মো. শাহজাহান। তিনি বলেন, 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'। স্বেচ্ছা রক্তদাতারা যে রক্ত দিচ্ছেন এরও তেমনি কোনো ক্ষয় নাই। বরং লাভ আছে। কারণ আমরা জানি, রক্তকণিকাগুলোর একটি নির্দিষ্ট জীবনকাল আছে, সেই সময়টি পেরিয়ে গেলে এমনিতেও সেগুলো আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু রক্তদানের ফলে তা অন্যের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগছে। তাই স্বেচ্ছায় রক্তদানের এই প্রচেষ্টা চিরদিন জাগরূক থাকুক।

৯৯ তম আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন। স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের উদ্দেশ্যে



নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার জনাব মো. শাহজাহান

তিনি বলেন, আপনারা মানুষের মঙ্গলের জন্যে কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের দেশ নিয়ে অনেকে বলেন–দেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু আমি মনে করি, দেশে যখন এরকম শত শত রক্তদাতা আছেন, স্বেচ্ছায় যারা অন্যের জন্যে রক্তদান করতে পারেন তখন জাতির জন্যেও তারা অবশ্যই অরো বড় ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন। দেশকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারেন।



সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের সমাজে রক্তদান সম্পর্কে নানা কুসংস্কার থাকা সত্ত্বেও আপনারা মানুষের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন, ৯৯ তম শত আজীবন রক্তাদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান করার মধ্য দিয়ে একটা উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন–এ জন্যে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

অনুষ্ঠান দুটিতে সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মাদাম নাহার আল বোখারী এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে ফাউন্ডেশনের পরিচালক-সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান ও স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সমন্বয়ক মিসেস মাসুদা আক্তার আবেদীন।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : নভেম্বর ২০১৩ ॥ সম্পাদক : কাজী মাহ্তাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইভোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 8319377, 8391391 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন

ডিসেম্বর ২০১৩

৩ জানুয়ারি শুক্রবার
বর্ষায়ন ২০১৪

২০১৪-এর ১ জানুয়ারি ২২ তম বর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছে কোয়ান্টাম মেথড। এ উপলক্ষে ৩ জানুয়ারি শুক্রবার সারাদেশে ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা উদযাপন করবেন কোয়ান্টাম বর্ষায়ন।

সবাই যেন সপরিবারে শরিক হতে পারেন এজন্যেই বছরের প্রথম ছুটির দিনটিকেই বেছে নেয়া হয়েছে বর্ষায়ন উদযাপনের জন্যে। নতুন বছরের প্রথম শুক্রবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে দেশজুড়ে বিভিন্ন পার্ক, উন্মুক্ত স্থান, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কোয়ান্টাম পরিবারের গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার, এসোসিয়েটরা একত্রিত হবেন নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে।

বর্ষায়ন কার্যক্রম শুরু হবে সুখী জীবনের মেডিটেশন দিয়ে। মেডিটেশন ও পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর বাঙালির ঐতিহ্যবাহী খাবার পিঠা-পুলি-মোয়া দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে। শুধু দেশেই নয়, দেশের বাইরেও কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা বর্ষায়নকে কেন্দ্র করে গ্রহণ করছেন নানারকম প্রস্তুতি।

ফাউন্ডেশনের ২২ তম বছরকে সুন্দর আর সাফল্যময় করার প্রত্যাশা নিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বেন কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা। রোগশোক, ভ্রান্তবিশ্বাস আর সমস্ত নেতিবাচকতা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে চারপাশের সকলকে সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের সুরে একাত্ম করতে এই আয়োজন।

ডিসেম্বর ২০১৩-এর কর্মসূচি

গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ
৬ ডিসেম্বর

কোয়ান্টাম বেসিক কম্পিউটিং ও বেসিক হার্ডওয়্যার প্রোগ্রাম
৬, ৭, ৮ ও ৯ ডিসেম্বর

কোয়ান্টামম প্রো-মাস্টার্স কোয়ান্টায়ন
১৩, ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর

আলোকিত পরিবার কার্যক্রম
২৬ ডিসেম্বর

কোয়ান্টাম মেথড

৩৬৯ তম কোর্স
১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর

৩৭০ তম কোর্স
১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ জানুয়ারি ২০১৪

ভেন্যু : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

শততম শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে এনবিআর চেয়ারম্যান মো. গোলাম হোসেন

নিরাপদ রক্তের চাহিদা পূরণের দায়িত্ব আমাদের সবার



আমাদের সমাজে যারা থ্যালাসেমিয়াসহ বিভিন্ন দুরারোগ্য রক্তরোগে ভুগছেন কিংবা সেইসব মুমূর্ষু রোগী, যাদের চিকিৎসার জন্যে বিশুদ্ধ রক্তের প্রয়োজন তাদের সবারই রক্ত পাওয়ার অধিকার আছে। আছে সুচিকিৎসা লাভের অধিকার। কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে রাষ্ট্র সবসময় এটি নিশ্চিত করতে পারে না; তখন বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও সংগঠন মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে এ ধরনের কাজে এগিয়ে আসেন, স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম নিয়ে যেমন কাজ করছেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সদস্যরা। কিন্তু আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এটি কারো একার দায়িত্ব নয়, দেশে প্রয়োজনীয় নিরাপদ রক্তের চাহিদা পূরণের দায়িত্বটি আমাদের সবার।

১৫ নভেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত ১০০তম আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ অভিমত ব্যক্ত করেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) মাননীয় চেয়ারম্যান মো. গোলাম হোসেন। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ১৭৪ জন আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতাকে সম্মাননা জানানো হয়।

প্রধান অতিথি বলেন, সাধারণভাবে দেখা যায়, আমাদের সমাজে কেউ যখন কারো জন্যে কিছু করে, যতটা না করে প্রায়শই তার চেয়ে অনেক বেশি বলে, প্রচার করে। অর্থাৎ স্বীকৃতি চায়। আমার খুব ভালো লাগছে যে, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এ স্বীকৃতির অত্যাচার থেকে বেরিয়ে এসে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, কোয়ান্টাম এ কাজটি করছে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে। এজন্যে আমি তাদের অভিনন্দন জানাই।

অনুষ্ঠানে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন কোয়ান্টাম ল্যাবের অনারারি কনসালটেন্ট, দেশের বিশিষ্ট রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. এ বি এম ইউনূস। সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারী।

অনুষ্ঠানে সম্মাননাপ্রাপ্ত আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের সুদৃশ্য ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও আইডি কার্ড প্রদান করা হয়। তাদের মধ্য থেকে অনুভূতি ব্যক্ত করেন সাত বার স্বেচ্ছায় রক্তদানকারী আফিয়া জেরিন।

মাটির ব্যাংক সালতামামি উৎসব

করসেবা ২০ ও ২১ ডিসেম্বর

ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ডিসেম্বর মাসজুড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক সালতামামি উৎসব। এ উপলক্ষে ২০ ও ২১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ করসেবা।

বছরশেষের এই উৎসবমুখর করসেবায় দেশজুড়ে ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলগুলো অংশ নেবে মাটির ব্যাংক সংগ্রহ ও বিতরণে। আত্মীয়স্বজন বন্ধু প্রতিবেশী সহকর্মী ও পরিচিতদের কাছে বিতরণকৃত প্রতিটি মাটির ব্যাংক সংগ্রহ এবং নতুন ব্যাংক পৌঁছে দেয়াই এ করসেবার লক্ষ্য। আর সেই সাথে সবাইকে জানানো হবে আসন্ন বর্ষায়নের আমন্ত্রণ।

অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানকে একত্রিত করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে অনেক বড় কাজ করা সম্ভব–এ বিশ্বাস নিয়েই ১৯৯৮ সালে মাটির ব্যাংক কার্যক্রমের যাত্রা শুরু। সেই থেকে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য, সহযোগী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা এ কার্যক্রমে অংশ নেন।

ফাউন্ডেশনের সেবামূলক কাজের সাফল্য ও অগ্রগতি অনেকাংশেই নির্ভর করে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক থেকে সংগৃহীত দানের অর্থে। অর্থাৎ আমরা যত বেশি সংখ্যক মানুষকে সম্পৃক্ত করতে পারবো এ অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে তত সমৃদ্ধ ও আলোকিত হবে আমাদের চারপাশের মানুষের জীবন।

মাটির ব্যাংক সালতামামি উৎসবকে আরো সফল ও গতিময় করতে প্রকাশিত হয়েছে ডকুমেন্টারি 'নিয়মিত দান আনে কল্যাণ'। চারপাশের সবাইকে নিয়মিত দানে অনুপ্রাণিত করতে সেন্টার শাখা সেলগুলোতে, এমনকি ব্যক্তিগত উদ্যোগেও চলছে এই ডকুমেন্টারি প্রদর্শন। কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট থেকে যে-কেউ ডাউনলোড করতে পারেন এ ডকুমেন্টারিটি।

কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দান পরিণত হোক আমাদের প্রতিদিনের অভ্যাসে। বরকতময় হোক আমাদের নতুন বছর।

আবশ্যক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে শিক্ষক/ শিক্ষিকা/ আবাসিক শিক্ষক (ন্যূনতম অনার্স পাশ), শিশুকাননের শিক্ষার্থীদের দেখাশোনার জন্যে ব্রাদার, সিস্টার (ন্যূনতম এসএসসি পাশ) ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীরা সত্বর যোগাযোগ করুন :

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

QUANTUM the SCIENCE of LIVING

ড. সরকার আমিন। বাংলা একাডেমির উপ-পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'উত্তরাধিকার'-এর তিনি সহযোগী সম্পাদক। এছাড়াও কবিতা প্রবন্ধ স্মৃতিকথা অনুবাদ মিলিয়ে তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২০টি। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৬১ ব্যাচে অংশ নেন। কোয়ান্টাম বুলেটিনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন তার কবিতা ও সাহিত্যচর্চার নানা দিক এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন নিয়ে তার আশা ও উপলব্ধির কথা।

তরুণদের জীবনকে আনন্দময় করে তুলতে পারে মেডিটেশন

ড. সরকার আমিন



বছর দশেক আগে যুক্তরাজ্য প্রবাসী একজন কবি-বন্ধু একটি বই উপহার দেন আমাকে। লাওৎ'স-এর 'তাও তে চিং'। হঠাৎ ইলেকট্রিকের ভেজা তারে হাত পড়লে যে দশা হয়, বইটি পড়তে গিয়ে আমার অবস্থা হলো তা-ই। আমি পুরোপুরি সম্মোহিত হয়ে গেলাম। এত সুন্দর কথা, এ তো সব আমার কথা! মনে হলো, লাওৎ'স আমার ওপর ভর করেছেন। বইয়ের কথাগুলো তিনি বলছেন না, বলছি আমি!

ধারণা করা হয়, আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে প্রাচীন চীনে লাওৎ'স-এর আবির্ভাব ঘটে। অনেকের মতে, তিনি ছিলেন মহান চীনা-দার্শনিক কনফুসিয়াসের সমসাময়িক। লাওৎ'স শব্দের অর্থ 'বৃদ্ধ-তরুণ'। তিনি ছিলেন এক সহজ সরল নির্ভেজাল জীবনবোধের প্রবক্তা। অন্তর্গত সজ্ঞা আর হৃদয়বোধ দিয়েই কেবল অনুভব করা যায় তাঁর 'তাও' দর্শনকে।

'তাও' দর্শনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে অন্তরে প্রশান্তি অর্জন। দেহের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে এসে একটি আসক্তিমুক্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার কথা বলা হয়েছে এখানে। আর সে লক্ষ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, সুস্থির, সমাহিত চিত্ত রচনা করাই 'তাও' দর্শনের মূল কথা। 'তাও' মানুষকে জীবনের দিকে উদ্বুদ্ধ করে।

একসময় সিদ্ধান্ত নিলাম, বইটি অনুবাদ করবো। যেই ভাবা সেই কাজ। সবমিলিয়ে আমি তখন ভীষণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম–রাস্তায় হাঁটছি, অফিসে কাজ করছি, বাজার করছি–প্রতিনিয়ত বইটা আমার মনের ভেতর ঘুরছে। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে আমার অনুবাদে *'দর্শন-কাব্য তাও তে চিং ॥ সহজিয়া পথ'* নামে বইটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়।

আড়াই হাজার বছর আগে প্রচারিত তাও দর্শনের কথাগুলো আজকের দিনের সাথেও অদ্ভুতভাবে সাযুজ্যপূর্ণ। যেমন, বইটির এক জায়গায় আছে– *"...দেশ ডুবে গেলে নৈরাজ্যে, জন্ম নেয় দেশপ্রেম।"* এর চেয়ে আশার কথা আর কিছু হতে পারে না। অর্থাৎ দেশে যখন এক সর্বগ্রাসী নৈরাজ্য আর অস্থিরতার কাল শুরু হয় তখন কোথাও না কোথাও একদল মানুষ জেগে ওঠে, তারা তৈরি হয়, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আলোকিত জীবনের স্বপ্ন দেখে, আর সে লক্ষ্যে কাজ করে চলে নীরবে।

অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে– *"...নিয়ন্ত্রণ করো তোমার আকাঙ্ক্ষাকে, তাহলে তুমিই সবচেয়ে ধনী লোক"*। এদিক থেকে তাও দর্শনের সাথে বুদ্ধবাণী ও ইসলামের সুফিবাদী ধারার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে লাওৎ'স-এর বইটি যে আমাকে এতখানি প্রভাবিত করেছে, সেটি একদিনে হয় নি। এর অনেক আগেই একজন সত্যিকারের বড়মাপের সাধক আমার ভেতর সুফিবাদের বীজটি বপন করে দিয়েছিলেন।

সময়টা সম্ভবত ১৯৯৫ সাল। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ স্যার একদিন বললেন আমাকে তার পীরের কাছে নিয়ে যাবেন। মনে অনীহা, কিন্তু স্যারকে 'না' বলার সাহস নেই, তাই গেলাম।

মতিঝিলের একটা অফিস। বেশ বড়সড় একটা এসি রুমে ঢুকলাম। কিন্তু পীর কোথায়? সুদৃশ্য সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে রিভলবিং চেয়ারে বসে আছেন একজন চকচকে কৃষ্ণবর্ণ মানুষ। পরনে কালো জোব্বা, মাথায় ঈষৎ রূপালি কারুকাজ করা টুপি। স্মিত স্বর্গীয় হাসিতে তিনি আমাদের স্বাগত জানালেন। জানলাম, ইনিই স্যারের পীর। খুব অবাক হলাম।

তিনি হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৈনপুরী। আমার দেখা এক আলোকিত দার্শনিক ও সুফিবাদী পীর। তিনি মূলত সাধক। কিন্তু নিজে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কোনো দান-দক্ষিণা গ্রহণ করেন না। ইন্টারন্যাশনাল বুক এজেন্সি নামে একটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। টাইম, নিউজউইক, ইকনোমিস্ট-এর মতো বিশ্বখ্যাত সাময়িকীগুলোর এদেশে সোল-এজেন্ট তিনি। কর্মময় জীবন তাঁর, প্রতিদিন মোটর-সাইকেল চালিয়ে অফিসে যান। যদিও তাঁর বয়স তখন একশ'র কাছাকাছি, কিন্তু দেখে মনে হয় বড়জোর ষাট।

প্রথম আলাপেই তাঁকে আমার খুব ভালো লেগে গেল। তিনিও খুব স্নেহ করতেন আমাকে। অগাধ ছিলো তাঁর পাণ্ডিত্য আর জ্ঞানের পরিধি। কোরআন-হাদীস থেকে শুরু করে পোস্ট-মডার্নিজম, এমনকি মার্ক্সিজম–সবটাই ছিলো তাঁর আলাপের বিষয়। উর্দু আরবি বাংলা ইংরেজি সব ভাষাতেই তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। সেই সাথে বিস্তর তাঁর পড়াশোনা।

অসাধারণ এই মানুষটি গত হয়েছেন বছর কয়েক আগে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা ও সুফিবাদের মানবীয় জীবনদর্শনটি তিনি আমার সামনে উন্মোচন করে দিয়ে গেছেন, দীর্ঘ আলাপের পথ ধরে। পরবর্তীতে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে বিষয়গুলো আমি আরো উপলব্ধি করেছি, অনুপ্রাণিত হয়েছি।

অবশ্য মেডিটেশনের সাথে আমার পরিচয় ঘটে আরো আগেই। বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে একটা সময় থাইরয়েডজনিত অসুস্থতার কারণে আমি তীব্র বিষণ্নতায় ভুগছিলাম। সেইসাথে প্রচণ্ড অস্থিরতা, ঘুমাতে পারতাম না। নানারকম ফোবিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। তখন হলে থাকতাম, আমার রুমমেটকে দেখতাম মেডিটেশন করছেন। তিনি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন। পরে ১৯৯৩ সালে কোয়ান্টামের শিথিলায়ন ক্যাসেট প্রকাশিত হলে ওটা শুনে শুনে মেডিটেশন করতাম।

মেডিটেশন সেই সময়টাতে আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছে। টেনশন-অস্থিরতা-ভয়ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে আমি তখন ঘুমাতে পারছিলাম। সত্যি বলতে কী, ভয়াবহ বিষণ্নতার আগ্রাসন থেকে আমাকে তখন বাঁচিয়ে দিয়েছিলো আমার স্ত্রী লেখক-সাংবাদিক শাহ্নাজ মুন্নীর সাহচর্য, আমার কবিতা আর মেডিটেশন। বিষণ্নতা-জয়ের সেই অনুভূতিগুলো নিয়ে আমি কিছু কবিতা লিখেছিলাম, যা পরে সংকলিত হয়েছে আমার *'আত্মহত্যার পরিবর্তে এক কাপ চা খাও'* কাব্যগ্রন্থে।

আসলে মনের কষ্টের চেয়ে তীব্রতর কষ্ট বোধহয় পৃথিবীতে আর কিছু নেই। শারীরিক কষ্টও একটা পর্যায় পর্যন্ত সহ্য করা চলে, কিন্তু মনটা যদি বিষণ্ন কিংবা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে কোনো কারণে, এর চেয়ে অধিকতর যন্ত্রণা আর কীসে? আমি মনে করি, কোয়ান্টাম এই জায়গাটায় মানুষকে শুশ্রূষা দিচ্ছে, একটা মানসিক নিরাপত্তা যোগাচ্ছে।

মেডিটেশন বিষয়ে আমি বইপত্র-ইন্টারনেটে কিছু পড়াশোনা করেছি। আমার মনে হয়েছে, কোয়ান্টাম মেডিটেশন পদ্ধতিটি অনেক বেশি পরিকল্পিত ও গোছানো। সবচেয়ে বড় কথা, এখানে মেডিটেশনের সাথে একটি সুন্দর জীবনদর্শন গেঁথে দেয়া হয়েছে। মানুষ এখানে এসে জীবনের একটি সুন্দর অর্থ খুঁজে পেতে পারে।

আমাদের তরুণদের অনেকে আজ নানারকম হতাশা-বিষণ্নতায় আক্রান্ত। তারা চায় আনন্দ, কিন্তু আনন্দের বদলে চারপাশে কেবলই বিভ্রান্তি আর উত্তেজনা। আনন্দ আর উত্তেজনা কখনো এক নয়। আনন্দ মানুষকে প্রশান্তি দেয়, চিন্তাশক্তিকে বিকশিত করে। অন্যদিকে, উত্তেজনা তাকে শেষপর্যন্ত করে তোলে অবসন্ন। যার ফলে তরুণদের একটা অংশ আজ অবসাদগ্রস্ত, হতাশাচ্ছন্ন। এক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও সুস্থ বিনোদনচর্চার পাশাপাশি মেডিটেশন একটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে। তরুণদের জীবনকে আনন্দময় করে তুলতে পারে মেডিটেশন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

গুরুজীকে লেখা চিঠি



শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আমার সশ্রদ্ধ সালাম নিবেন। মা-জীকেও আমার সালাম জানাবেন।

২০০২ সালে আমি প্রথমবারের মতো লন্ডন যাই। তখন থেকেই আমার স্বপ্ন লন্ডনে পোশাক রপ্তানি করবো। লন্ডনে খুব সুনাম ও সাফল্যের সাথে ব্যবসা করছেন, এমন একজনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু করলাম। ভদ্রলোকের নয়টা আউটলেট আছে লন্ডনে এবং তিনি ভারত, পাকিস্তান, দুবাই ও চীন থেকে পোশাক আমদানি করেন। তার সাথে কয়েকবার দেখা করেছি। খুবই ভালো একজন মানুষ, কিন্তু বাংলাদেশের সাথে ব্যবসায় তিনি কোনোভাবেই আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন না। এদিকে আমিও নিয়মিত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার ভেতর সবসময় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে কোয়ান্টামের শিক্ষা যে, যতক্ষণ সফল না হবো, লক্ষ্য অর্জনে আমি কাজ করে যাবো, লেগে থাকবো।

এভাবেই চলছিলো। ২০১২ সালে লন্ডনে যাওয়ার আগে শান্তিনগর অফিসে যোগাযোগ করলাম যে, লন্ডন শাখার জন্যে কোনো কিছু নিয়ে যেতে হবে কি না। আমার কাছে জানতে চাওয়া হলো, আমি কী পরিমাণ অর্থাৎ কত ওজনের জিনিসপত্র নিতে পারবো? বললাম, সাধারণত এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ যতটুকু নেয়ার অনুমতি দেয়, তার পুরোটাই নিতে পারবো। তারপর কোয়ান্টামের বিভিন্ন বই, ব্রোশিউর, কণিকা সবমিলিয়ে প্রায় ৩৫ কেজি ওজনের প্রকাশনা-সামগ্রী সাথে নিলাম। নিজের জন্যে প্রয়োজনীয় কয়েকটা কাপড়-চোপড়, আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র ছাড়া আর কিছুই নিলাম না।

লন্ডন শাখার দায়িত্বশীল ভাইদের সাথেও যোগাযোগ করলাম। এয়ারপোর্টে নেমেই দেখি তারা আমাকে নিতে এসেছেন। এই অনুভূতি আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। এর আগে যতবার গিয়েছি, একা একা ট্রেনে চেপে গিয়েছি যেখানে যাওয়ার। বিদেশের মাটিতে তারা যেভাবে আন্তরিকতার সাথে আমাকে নিতে এলেন, অন্যরকম এক আনন্দ হচ্ছিলো। অনুভব করলাম সঙ্ঘের ভালবাসা আর একাত্মতা।

সে সময় লন্ডনে বৈশাখী মেলায় কোয়ান্টামের স্টল দেয়া হলো এবং এই স্টলের জন্যেই দেশ থেকে এইসব প্রকাশনা পাঠানো হয়েছে। লন্ডন শাখার সবার সাথে পুরো একদিন কোয়ান্টাম স্টলে সময় দিলাম।

এরপর যা ঘটলো তা আমার জন্যে সত্যি বিস্ময়কর–যে ভদ্রলোকের সাথে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে চেষ্টা চালিয়েও কোনো ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছিলাম না, এবার তাকে ফোন করতেই তিনি বেশ আন্তরিকতা দেখালেন। আমাকে পরদিন তার সাথে লাঞ্চ করার প্রস্তাব দিলেন এবং বেশ আপ্যায়ন করলেন। নিজেই আগ্রহী হয়ে বললেন, ইতোপূর্বে বাংলাদেশের সাথে ব্যবসার অভিজ্ঞতা তার ভালো নয় বলেই তিনি আর কারো সাথে ব্যবসায় আগ্রহী নন। আমি শুধু তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, আমি যতটুকু করতে পারবো ঠিক ততটুকুই বলবো।

এর কিছুদিনের মধ্যে তিনি নিজেই আমাকে ব্যবসার প্রস্তাব দিলেন এবং ধীরে ধীরে অর্ডারের পরিমাণ বাড়তে লাগলো। বর্তমানে প্রায় প্রতিমাসেই আমার প্রতিষ্ঠান থেকে লন্ডনে পোশাক রপ্তানি করছি।

স্রষ্টার কাছে আমার শুকরিয়া জানানোর ভাষা নেই। আমি বিশ্বাস করি, যে কাজটা আমি দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করেও পারছিলাম না, সেটাই আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মানুষের জন্যে কিছু করতে পারার মধ্য দিয়ে।

আসলে সত্যিই যখন আমরা সঙ্ঘের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কোনো কাজ করি, তখন সেই কাজে আল্লাহর রহমত থাকে। আবারো অনুভব করলাম।

গুরুজী, অনেক প্রতিকূলতার ভেতর আমি কোর্সে অংশ নিয়েছিলাম ১৯৪ তম ব্যাচে। তারপর থেকে আমাকে আর কখনো পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নি। আর আমার এই সাফল্যের পেছনে মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দানের অনেক অবদান আছে। বিভিন্ন সময় দেখেছি, মাটির ব্যাংক ম্যাজিকের মতো কাজ করে। যখনই ফাউন্ডেশনের কাজে অংশ নিয়েছি, আমার জীবনে সাফল্যের আর অগ্রগতির পরিমাণই শুধু বেড়েছে।

এ পর্যন্ত প্রায় তিনশত মানুষ আমার অনুপ্রেরণায় কোর্স করেছে। আমি যেখানেই যাই, আলাপচারিতায় কোয়ান্টামের প্রসঙ্গ চলেই আসে। বিভিন্নজনের সমস্যার কথা শুনে কোর্স করতে উদ্বুদ্ধ করি। আর সাথে তো ল্যাপটপ থাকেই–তাদের আমি 'আসুন সুস্থ থাকি' ডকুমেন্টারিটি দেখাই। এটা অনেকটা মন্ত্রের মতো কাজ করে। যিনিই দেখেন ভীষণ আকৃষ্ট হন।

গুরুজী, দোয়া করবেন, যতদিন বেঁচে আছি, আমি যেন ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্ম থাকতে পারি।

সানাউল হক বাবুল
সত্ত্বাধিকারী, এবি ফ্যাশন মেকার

'সুখ' তৈরি করে নিন! সুখী হোন

হেলেন কেলার-এর একটি কথা আছে–'সুখ আপনিই আসে না, একে তৈরি করে নিতে হয়'। সাম্প্রতিককালে মনোবিজ্ঞানী আর গবেষকরাও বলছেন অনেকটা সেরকম কথাই। তাদের মতে, দৈনন্দিন জীবনে কিছু আপাত সাধারণ আচার-বৈশিষ্ট্যই আমাদের সুখী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে।

সম্পর্ককে গুরুত্ব দিন

পরিবার, সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী–সবার সাথে আপনার যে সম্পর্ক, তার যথাযথ মূল্যায়ন করুন। সম্পর্কগুলোকে গুরুত্ব দিন। আপনি সুখী হবেন। আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দীর্ঘ গবেষণার পর বলছেন এমন কথা। তিরিশ বছর ধরে এক লক্ষ বিশ হাজার মানুষের ওপর পরিচালিত এ গবেষণাটিতে তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যেমন : তাদের আয়, শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, সেবামূলক কাজে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

এ গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয় অধুনালুপ্ত বিশ্বখ্যাত সাময়িকী নিউজউইক-এর একটি রিপোর্টে। রিপোর্টটিতে বলা হয়, সত্যিকার অর্থে তারাই সবচেয়ে বেশি সুখী, যাদের সম্পর্কগুলো তুলনামূলক দীর্ঘস্থায়ী ও পরিতৃপ্তিময়।

নিজেকে মেলে ধরুন

'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া...'। দৈনন্দিন রুটিন কাজের বৃত্তে নিজেকে গুটিয়ে রাখবেন না। মাঝেমধ্যে অন্যরকম কিছু একটা করুন। নতুন কারো সাথে পরিচিত হোন। রাস্তা দিয়ে চলছেন, অচেনা কোনো পথিকের দিকে সাহায্যের হাতটি কি কোনোভাবে বাড়িয়ে দেয়া যায়? কিংবা প্রতিদিনের ভারিক্কি গাম্ভীর্য ভুলে হঠাৎ প্রিয় গানের একটি লাইন গেয়ে ওঠার মতো কিছু একটা!

নর্থ ক্যারোলিনার ওয়েক ফরেস্ট ইউনিভার্সিটির গবেষকদের পরামর্শটা সেরকমই। তাদের মতে, যারা প্রায়শই চেনা গণ্ডির বাইরে হাঁটতে পারেন, কিছুটা মেলে ধরতে পারেন নিজেদের, তাদের মনের ভাবগতিক ভালো থাকে, তারা আনন্দে সময় পার করেন। আর যারা সবসময় গুটিয়ে রাখেন নিজেদের, তাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই ঘটে এর উল্টোটা।

পরার্থে ব্যয় করুন

আমেরিকার বিখ্যাত ব্যবসাভিত্তিক সাময়িকী ফোর্বস-এর উদ্যোগে একবার একটি সমীক্ষা চালানো হয়। এতে একদল স্বেচ্ছাসেবককে বিভিন্ন অংকের কিছু ডলার দেয়া হয়। তাদেরকে দুটি দলে ভাগ করা হয়। একদলকে বলা হয় তারা নিজেদের প্রয়োজনমতো সেটি খরচ করতে পারে আর অন্যদলকে বলা হয় যে, তারা যেন অর্থটা ব্যয় করে অন্যের জন্যে, অন্যের কল্যাণে।

দিনশেষে দেখা গেল, যারা অন্যের কল্যাণে ব্যয় করেছিলেন তারা তুলনামূলক সুখী ও আনন্দিত ছিলেন, সেই ব্যয়ের পরিমাণ যত অল্পই হোক। পরার্থে ব্যয় দ্বিতীয় দলের সদস্যদেরকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করে তুলেছিলো।

আপনি কতটা সুখী তার ওপর নির্ভর করে আপনার ভবিষ্যত সুস্বাস্থ্য
ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট

ইতিবাচকতার চর্চা জরুরি

জীবনে চলার পথে প্রতিদিন কতরকম কিছু ঘটে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই থাকে ভালো আর মজার অনেক কিছুই। সেগুলো লিখুন। বিস্তারিত লিখুন প্রতিদিন। এভাবে নিয়ম করে দৈনন্দিন সুখকর ঘটনাগুলো লিখতে লিখতেই আপনি একসময় হয়ে উঠবেন ইতিবাচক আর উদ্যমী। পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পজিটিভ সাইকোলজি সেন্টার পরিচালিত একটি গবেষণায় এর প্রমাণ মিলেছে।

সে গবেষণায় বলা হয়েছে, হতোদ্যম মানুষদের মধ্যে যারা প্রতিদিনকার ভালো বিষয়গুলো নিয়মিত লিখে গেছেন ছ'মাসের মধ্যেই তাদের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেছে। তারা হয়ে উঠেছেন ইতিবাচক আর তুলনামূলক সুখী।

পানি পানে সুখ!

সারাদিনে পর্যাপ্ত পানি পান করুন। আপনি প্রফুল্ল থাকবেন। ২০১২ সালে কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, পানিশূন্যতা এমনকি শরীরে পানির ন্যূনতম অভাবও মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। অবসাদ আর বিষাদগ্রস্ততা ভর করতে পারে আপনার ওপর। আর এটি তুলনামূলক বেশি ঘটে মহিলাদের ক্ষেত্রে।

–রিডার্স ডাইজেস্ট অবলম্বনে

১ নভেম্বর পারিবারিক ওয়ার্কশপে গুরুজী

পরিবারকে সুখী করার দায়িত্ব আমার

পরিবারে এক + এক = এগারো

সাধারণভাবে এক যোগ এক সমান দুই, কিন্তু পরিবারে বা একটি পরিবার গড়তে দুজন মানুষ যখন একত্র হন তখন সেটি হয়ে যায় এগারো। অর্থাৎ পরিবারে দুজন মানুষের শক্তি, সামর্থ্য ও কর্মক্ষমতা হয়ে উঠতে পারে এগারোজন মানুষের সমান। এটি তখনই সম্ভব, যখন আমরা বিশ্বাস করতে পারবো এবং সেই দক্ষতা অর্জন করতে পারবো।

সার্কাসে দেখা যায়, একজন জাগলার দুহাতে এগারোটি পর্যন্ত বল নিয়ে জাগলিং করতে পারেন, একটি বলও মাটিতে পড়ছে না। এটি তিনি কীভাবে পারেন? প্রথমত, তিনি এটি বিশ্বাস করেছেন। দ্বিতীয়ত, এই দক্ষতা তিনি অর্জন করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন যে, আমি এটি পারবো এবং করে দেখাবো।

আমরা অধিকাংশ মানুষ এখনো দায়িত্ব নিই–সেটা মনের টানে, মমতার টানে, আবেগের টানে–যে কারণেই হোক। আমরা আমাদের পরিবারের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে পারি, এটি আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য।

বিয়ে হলো একটি প্রয়োজন, একটি দায়িত্ব

একটি পরিবারের শুরুটা হয় বিয়ের মধ্য দিয়ে। আমরা বলতে পারি, বিয়ে হলো একটি প্রয়োজন, যা দুজন মানুষের জৈবিক মানসিক আবেগীয় ও সামাজিক চাহিদা পূরণ করে। বিয়েটা হচ্ছে এই প্রয়োজনগুলো পূরণের একটি প্রক্রিয়া বা উদ্যোগ। আর এগুলো পূরণের পথে কোনো ঘাটতি অনুভূত হলে সমস্যার শুরুটা হয় সেখান থেকেই।

অর্থাৎ বিয়ে মানে শুধুই ভালবাসা আর রোমান্টিসিজম নয়, এটি একটি দায়িত্ব। কিন্তু মিডিয়ার রঙিন জগতের প্রভাবে আমরা এটি ভুলে যাচ্ছি। ফলে সিনেমা নাটক টিভি-সিরিয়ালের অবাস্তব জীবনের সাথে আমরা কখনো কখনো আমাদের বাস্তব জীবনকে গুলিয়ে ফেলি।

বিয়ে নিয়ে আমরা অনেক সময় অলীক কল্পনার রাজ্যে ডুবে যাই। কল্পনার ফানুস ওড়াই। ছেলেরা নায়িকার মতো ও মেয়েরা নায়কের মতো জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী খোঁজে। ভাবে, তার স্বামী বা স্ত্রী সিনেমার স্বামী/ স্ত্রীর মতোই সবকিছু করবে, সব ভুল ক্ষমা করে দেবে, শ্বশুর-শাশুড়ি হবে সিনেমায় দেখা শ্বশুর-শাশুড়ির মতো। কিন্তু বাস্তব চিত্র প্রায়শই ভিন্ন।

বিয়ে ॥ জীবনের একটি বাস্তব ঘটনা

বিয়ে একটি বাস্তবতা, জীবনের আর অন্য সব অনুষঙ্গের মতো এটি খুবই বাস্তব একটি ব্যাপার। কিন্তু পরিবারের অন্যান্য সদস্য–যেমন, ভাই বোন বাবা মা সন্তানের সাথে বিরোধ আমরা সহজেই ভুলে যাই, সহজেই ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু দাম্পত্য বিরোধ আমরা ভুলতে পারি না। কেন?

এর কারণ হলো, বিয়েতে ও দাম্পত্য সম্পর্কে আমরা দিতে চাই কম, কিন্তু পেতে চাই বেশি। এখানে আমরা হিসেব কষি, আমি কী পেলাম? বৈবাহিক সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা কেবল নিজের অংশটুকু বুঝে নিতে চাই, যার ফলে অনেক ছোটখাটো সমস্যা প্রায়ই রূপ নেয় সংকটে। অথচ এক্ষেত্রে কিছুটা বাস্তববাদী হলে অনেক সমস্যা খুব সহজেই সমাধান করা যায়।

বিয়ের মধ্য দিয়ে একটি বাস্তব ও দৈনন্দিন সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে, আর এ বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা থাকা চাই প্রথম থেকেই। যেমন, স্ত্রী যদি মনে করেন, বিয়ের দিন তিনি যেভাবে সেজেগুজে বসে ছিলেন, অন্যেরা তার খাওয়া-দাওয়াসহ অন্যান্য সব কাজকর্মের দায়িত্ব নিয়েছে–বিয়ের পরও তা-ই ঘটবে, তাকে কিছুই করতে হবে না, কোনো দায়িত্ব নেই, তাহলে সেটি হবে অলীক কল্পনা মাত্র।

আবার, পুরুষদের কেউ কেউ নিজের ক্ষমতা, পৌরুষ আর কর্তৃত্ব জাহির করতে গিয়ে বিয়েতে বা বিয়ের পর অনেক অতিরিক্ত ও লোক-দেখানো খরচ করেন। অথচ পুরোটাই হয়তো ছিলো ঋণের টাকায়। পরবর্তীতে যখন বাধ্য হয়ে এটি বন্ধ করতে হয়, তখন ঘটে স্বপ্নভঙ্গ, শুরু হয় দ্বন্দ্ব। তাই প্রত্যেক স্বামীরই উচিৎ তার আয়-রোজগার সম্বন্ধে শুরুতেই স্ত্রীকে একটি স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া।

এছাড়াও বিয়ের ব্যাপারে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি। প্রথমত, বিয়েটা হতে হবে পাত্র-পাত্রীর পছন্দে। অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী যদি পরস্পরকে বিয়েতে সম্মত হন তবেই বিয়েটা হতে পারে। দ্বিতীয়ত, পারিবারিক পছন্দ বা সম্মতি। তৃতীয়ত, বিয়েটা সবসময় হতে হবে মোটামুটিভাবে সম-সামাজিক, সম-সাংস্কৃতিক, সম-অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে।

সুখী দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের জন্যে চাই সম্মান মর্যাদা মমতা

সুফিসাধক মওলানা জালালুদ্দীন রুমীর একটি গল্প আছে। তিন মুসাফির। একজন আরব, একজন রোমান, একজন পার্সিয়ান। তিনজন একই পথ দিয়ে চলেছে। তারা কেউই একে অন্যের ভাষা পুরোপুরি বোঝে না, কিন্তু কোনোরকম ইশারা-ইঙ্গিতে অল্পস্বল্প কথায় কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। পথ চলতে চলতে তাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও গড়ে উঠলো।

পথিমধ্যে তারা হঠাৎ একটি থলে কুড়িয়ে পেল। তাতে কিছু স্বর্ণমুদ্রা। তিনজনই উৎফুল্ল। সামনেই বাজার আছে, কিছু ফলমূল কিনে খাওয়া যাবে। আরব মুসাফির বললো, চলো, আমরা ইনাব কিনে খাই। পার্সিয়ান বললো, না, আঙুর কিনবো। রোমান বললো, ইনাব আঙুর কোনোটাই নয়, ভিটিস কিনতে হবে, আমরা সেটাই খাবো।

স্বর্ণমুদ্রাগুলো দিয়ে কী কিনবে, এ নিয়ে কিছুতেই একমত হতে পারছিলো না তারা। এভাবে এককথা-দুকথা, একপর্যায়ে শুরু হলো ঝগড়া। তাদের বন্ধুত্ব রূপ নিলো রীতিমতো কলহে। প্রত্যেকেই যার যার কথায় অনড়–একজন কিনতে চায় ইনাব, একজনের পছন্দ আঙুর আর একজনের কথা হলো, ভিটিস কিনতে হবে।

গল্পের এ পর্যায়ে রুমী বলছেন, এই তিন মুসাফিরের জন্যে এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একজন ভাষান্তরকারী বা দোভাষীর, যিনি তিনজনের ভাষাই বোঝেন। তাহলে এদের ঝগড়া খুব সহজেই মিটে যায়। কারণ, তারা প্রত্যেকেই একই জিনিস চাচ্ছে, কিন্তু বোঝাতে পারছে না।

আরবী ভাষায় যা ইনাব, ফার্সিতে তা-ই আঙুর আর একজন রোমান ভাষাভাষীর কাছে তা-ই ভিটিস। অর্থাৎ তিনজনের চাওয়া একই, কিন্তু একে অন্যের ভাষা বুঝতে পারছে না বা বোঝার চেষ্টাও করছে না বলেই তারা জড়িয়ে পড়েছে বিবাদে।

সুখী হোক আপনার পরিবার

- পারিবারিক মনছবি করুন। আপনার পরিবার ও পরিবারের সদস্যদেরকে কোথায় দেখতে চান, সবাইকে নিয়ে কোথায় পৌঁছতে চান, পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন চান, এ সবগুলো বিষয় একত্র করে মনছবি দেখুন। এর ফলে আপনাদের চাওয়াটা সংজ্ঞায়িত ও সুনির্দিষ্ট হবে। আসলে অধিকাংশ সময় আমরা বুঝিই না যে, আমরা কী চাই। ফলে কী করবো, কীভাবে করবো তা-ও বুঝতে পারি না। অন্যদিকে চাওয়াটা সুস্পষ্ট হলে তখন লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে দায়িত্ব নেয়া সহজ হয়।
- সরাসরি কথা বলুন। স্বামী স্ত্রী বাবা মা শ্বশুর শাশুড়ি শ্যালক ননদ সবার সাথেই আন্তরিকভাবে সরাসরি কথা বলুন, কোনো মাধ্যম ধরে নয়। সহজ যোগাযোগ সবসময় পারস্পরিক সম্পর্কের সেতুবন্ধনটাকে মজবুত করে। মানুষকে কাছে নিয়ে আসে। রাগ ক্ষোভ অভিমান এমনিতেই দূর হয়ে যায়। আর কথা অত্যন্ত শক্তিশালী। তাই মমতা ও বিনয়ের সাথে কথা বলুন।
- পারিবারিক রেওয়াজ গড়ে তুলুন এবং তা অনুসরণে পরিবারের সবাইকে উদ্বুদ্ধ করুন। যেমন, আমরা আমাদের পরিবারে উচ্চস্বরে চিৎকার, চেঁচামেচি বা ঝগড়া করি না কিংবা পরিবারের সবাই আমরা দিনে অন্তত একবেলা একসাথে খাওয়াদাওয়া করি। প্রতি বৃহস্পতিবার পরিবারের সবাইকে নিয়ে পারিবারিক মেডিটেশনে অংশ নিন। পরিবারের সবার সুস্বাস্থ্য, সাফল্য ও সার্বিক কল্যাণের নিয়তে মাটির ব্যাংকে দান করে দিনের কাজ শুরু করুন।
- একা নয় কিংবা শুধু স্বামী-স্ত্রী নয়, সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে অংশ নিন। সম্ভব হলে মাসে বা বছরে একবার পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যান।
- আপনার পরিবারকে ধর্মীয় ও আত্মিক চেতনা এবং নৈতিক মূল্যবোধ চর্চা ও প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করুন। সেবা ও সৎকর্মের চর্চা শুরু করুন পরিবার থেকেই। পরিবারের প্রতিটি কাজই সৎকর্ম ও ইবাদত। তাই পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে পরিবারের জন্যে যেকোনো কাজ আনন্দচিত্তে করুন, বিরক্তি নিয়ে নয়। তাতে কাজের আনন্দ ও সন্তুষ্টি বহুগুণ বেড়ে যাবে।

আমাদের পারিবারিক জীবনও আসলে তা-ই। পরিবারে একজন মানুষ কী চায়? প্রতিটি মানুষই, পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই মূলত একটি জিনিসই চায়। এককথায় বলা যায়, সেটি হলো, সম্মান।

পরিবারে স্বামী স্ত্রী সন্তান বাবা মা ভাই বোন শ্বশুর শাশুড়ি সবাই-ই চায় মূলত তার প্রাপ্য সম্মানটুকু, চায় একটা স্বীকৃতি। চায় শ্রদ্ধা, চায় তাকে একটু মমতা দিয়ে দেখা হোক।

খাওয়া-দাওয়াসহ জীবনধারনের জন্যে প্রয়োজনীয় যা কিছু, সেসব তো একটি পশুও চায়; কিন্তু মানুষ যা চায়, যা নিয়ে বাঁচতে চায়, তা হলো তার সম্মান আর আত্মমর্যাদা। এমনকি ঘরের গৃহকর্মীটি পর্যন্ত চায় ন্যূনতম সম্মান আর মর্যাদা।

ধর্মের চিরন্তন শিক্ষাও তা-ই। পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারা-র ১৮৭ আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নারী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরের পোশাক'। এ আয়াতের মর্মার্থ হলো, স্বামী-স্ত্রীর সম্মান ও মর্যাদা নির্ভর করে তাদের পরস্পরের উপর, তারা একে অন্যের সম্মান।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, দাম্পত্য জীবন এবং সর্বোপরি পারিবারিক জীবনের সবচেয়ে মৌলিক চাওয়াটিকে ধর্মীয়ভাবেও অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ, এটি ঠিক থাকলে বাকি সবকিছু এমনিতেই ঠিক হয়ে যায়।

যা চাই, তা-ই আগে দিতে হবে অন্যকে ॥ জীবন থেকে শুধু আনন্দটুকুই নিন

যা চাই, তা আগে দিতে হবে অন্যকে। আমি সম্মান চাই, মমতা চাই, সমমর্মিতা চাই–এ জিনিসগুলোই আমাকে আগে দিতে হবে। যদি দিতে পারি তবে আমিও তা-ই পাবো এবং সুখী হবো। অর্থাৎ পরিবারকে সুখী করার দায়িত্বটা আগে নিতে হবে আমাকেই।

আপনি যদি আপনার স্বামী/ স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হতে পারেন, ভেতর থেকে মমতা অনুভব করতে পারেন, সম্মান দিতে পারেন, তবে আজ কাল বা পরশু এই সম্মান মর্যাদা আপনি পাবেনই। এজন্যে চাই ধৈর্য। অনেক সময় আমরা এই ধৈর্যটাই ধরতে পারি না। কিন্তু ধৈর্য, অপেক্ষা আর প্রো-একটিভিটি সুখী জীবনের জন্যে, বিশেষত পারিবারিক সুখের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ধৈর্যটাকে অভ্যাসে পরিণত করুন।



সব জীবনেই কিছু আনন্দ আছে, তেমনি আছে কিছু কষ্টও। পারিবারিক জীবনও তার ব্যতিক্রম নয়। যিনি বুদ্ধিমান, তিনি আনন্দের পরিমাণ বাড়ান, আর আনন্দটুকুই শুধু নেন। কষ্ট নেয়ার দরকারটা কী? কষ্টটা তো বোঝা। বোঝা বয়ে নিজের ভার বাড়ানোর চেয়ে বরং আনন্দটা নিয়ে হালকা থাকুন। কখন কে কী বলেছে, বকেছে, সেটি মনে রাখার চেয়ে স্বামী/ স্ত্রীসহ সবার সাথের সুখস্মৃতিগুলো লালন করুন।

আজকের সুখী পরিবারই সুখী সমাজ এবং ভবিষ্যৎ সুখী প্রজন্মের ভিত্তি

আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, আমাদের আজকের সুখী পরিবারই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুখের ভিত্তি, সুখী প্রজন্মের শিকড়। পরবর্তী প্রজন্ম এ শিকড় থেকেই জীবনীশক্তি ও প্রাণরস লাভ করে।

সুখী সমাজের ভিত্তিও হচ্ছে সুখী পরিবার। সুখী পরিবার ছাড়া সুস্থ সমাজ হতে পারে না। কারণ, অসুখী পরিবারগুলোর সন্তানদের শতকরা প্রায় ৮০ থেকে ৯০ ভাগই হয় মাদকাসক্তি, না হয় মানসিক অসুস্থতায় ভুগছে, কিংবা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুখী দেখতে চাইলে তার প্রস্তুতি নিতে হবে মাতৃগর্ভে শিশুর বিকাশের সময় থেকেই। ভ্রূণাবস্থা থেকেই শিশুর মনোদৈহিক বিকাশ শুরু হয়। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল অনুসারে, মাতৃগর্ভে থাকাকালীন শিশু যে কেবল মায়ের চিন্তা দিয়েই প্রভাবিত হয়, তা নয়; বরং পারিপার্শ্বিক সবকিছু এমনকি বাবার চিন্তা দ্বারাও সে প্রভাবিত হতে পারে।

সন্তানসম্ভবা মায়ের চারপাশের পরিবেশ যত ভালো থাকবে, ইতিবাচক থাকবে মাতৃগর্ভে সন্তান তত সুন্দরভাবে বেড়ে উঠবে। এসময় সন্তানসম্ভবা মায়ের সাথে যত ভালো ব্যবহার করা যাবে, তার শারীরিক-মানসিক যত্ন নেয়া যাবে, তার প্রতি মমতা দেয়া যাবে, তিনি যত আনন্দিত ও উজ্জীবিত থাকবেন সন্তানের বিকাশ তত ভালো হবে।

এছাড়াও সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হোন। সন্তানকে আপনি যত সময় দেবেন সন্তান তত আপনাকে বুঝতে চাইবে, অনুভব করবে। সে আপনার সুখ-দুঃখ আবেগের সাথী হবে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমানে আমেরিকান শিশু-কিশোররা তাদের বাবাদের সাথে কথা বলে দিনে পাঁচ মিনিট, আর টিভি দেখে সাত ঘণ্টা। ফলে তাদের পারিবারিক পরিবেশ ও সমাজ হয়ে উঠছে আগের চেয়ে অস্থিরতাপূর্ণ ও সহিংস।

সন্তান যখন কথা বলতে শেখে তখন সে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে, কৌতূহলী হয়। এসময় তার প্রতি মনোযোগ দেয়াটা খুবই জরুরি। কারণ, সে যদি আপনার কাছ থেকে উত্তর না পায় তাহলে সে বাইরে যাবে উত্তর খুঁজতে, আর তাতে সম্ভাবনা আছে বিভ্রান্ত হওয়ার। তাই কখনো বিরক্ত হবেন না।

সৎসঙ্গে একাত্ম হোন

ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমগুলোর সাথে পারিবারিকভাবে একাত্ম হোন। সাদাকায়ন, আলোকায়ন, ওয়ার্কশপ, মাটির ব্যাংক করসেবাসহ ফাউন্ডেশনের সব অনুষ্ঠানগুলোতে সপরিবারে অংশ নিন। আপনার পারিবারিক প্রশান্তি বাড়বে, পারিবারিক আবহ হয়ে উঠবে আরো সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত, সমমর্মী ও সহযোগিতাপূর্ণ।

ফাউন্ডেশনের নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলে আপনার পরিবারের সদস্যদের আত্মিক শক্তি বিকশিত হবে। জীবনদৃষ্টি হবে সঠিক ও ইতিবাচক। ফলে পরিবারের সবার মধ্যে পরস্পরকে বোঝার, অনুভব করার ও অনুপ্রাণিত করার শক্তি বাড়বে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুন্দর ও আলোকিত বিকাশের জন্যে এটিই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

সুখী হোক আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম

- সন্তানসম্ভবা মা-কে সবসময় ভালো কথা বলতে এবং ভালো কিছু পড়তে, দেখতে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করুন। যেমন : অটোসাজেশন, জীবন কণিকা, কোরআনের মর্মবাণী, বিভিন্ন ধর্মবাণীর সংকলন ইত্যাদি। সন্তান জন্মের পর তাকে পাশে রেখে এবং আরো একটু বড় হলে সাথে নিয়ে মেডিটেশন করুন। তাহলে জীবনের শুরু থেকেই সে ইতিবাচকতায় অনুপ্রাণিত হবে।
- সন্তানকে আদর করবেন, কিন্তু আহ্লাদ দেবেন না। অতিরিক্ত আহ্লাদে সন্তান বখে যেতে পারে। চাওয়া মাত্রই সবকিছু দিয়ে দেবেন না, অপেক্ষার পর কোনো জিনিস পাওয়ার যে তৃপ্তি সেটি তাকে অনুভব করতে দিন। যা সহজেই পাওয়া যায় তাতে কোনো আনন্দ থাকে না।
- সন্তানের সাথে দৃঢ় হতে ভয় পাবেন না। কোনো ভুল বা অন্যায় দেখলে প্রয়োজনে দৃঢ় হবেন। সন্তান যখন আপনাকে দৃঢ় হতে দেখবে তখন সে বুঝবে, ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা আপনার আছে এবং আপনি তার প্রতি সচেতন। নৈতিক দৃঢ়তা সবসময় অন্যের কাছে আপনার সম্মানটা বাড়িয়ে দেয়।
- সন্তানকে অন্যের সামনে বকবেন না। ভুল করলে তাকে একা ডেকে বলুন। পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীসহ সবার ক্ষেত্রেই এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যখনই কাউকে অন্যের সামনে বকবেন সে তার ভুলকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করবে এবং যুক্তি-পাল্টাযুক্তির পর তা একপর্যায়ে ঝগড়ায় রূপ নেবে।
- সন্তানকে মারবেন না। যখনই মারলেন, আপনি আপনার সর্বশেষ অস্ত্রটা ব্যবহার করে ফেললেন। কিছু অস্ত্র আছে যা কখনো ব্যবহার করতে হয় না। এজন্যে সবসময় শক্তি-প্রদর্শন আর সহিংসতা এড়িয়ে চলবেন।

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *আমার স্বামী আমার সাথে তেমন ভালো আচরণ করেন না। কিন্তু যেকোনো ব্যাপারে তিনি অন্য মহিলাদের সাথে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। অনেক বোঝানোর পরেও কাজ হয় নি। কী করবো?*

উত্তর : কী করবেন এটা অন্যের পক্ষে বলা কঠিন। কারণ, আপনি যদি আপনার স্বামীকে আকর্ষণ করতে না পারেন, এই বুদ্ধি-পরামর্শ তো আপনাকে কেউ দিতে পারবে না যে, কীভাবে স্বামী আকৃষ্ট হবে। প্রত্যেক স্ত্রীর এটা একটা সহজাত গুণ হওয়া উচিত। আপনাকে তো বুঝতে হবে, আমার স্বামী কী চান? এটা বুঝলে তিনি অবশ্যই সব ব্যাপারে আপনার সাথেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। তবে আপনাকেই বুঝতে হবে যে, এটা কীভাবে করবেন। সেটা না হলে এই ব্যর্থতা আপনার। এটা যেমন সত্যি, তেমনি কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর প্রতি আকর্ষণ বোধ না করেন, স্বামীর সাথে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব না করেন সেটাও স্বামীর ব্যর্থতা যে, তিনি তার স্ত্রীকে আকৃষ্ট করতে পারছেন না।

প্রশ্ন : *সংসারে টাকা-পয়সাসহ সব বিষয়ে স্ত্রীর কর্তৃত্ব করা ঠিক, নাকি স্বামীর কর্তৃত্ব করা ঠিক?*

উত্তর : যদি ঘরের বিষয় হয়, সাংসারিক ব্যাপার হয়, প্রত্যেক পুরুষের উচিত এই কর্তৃত্ব স্ত্রীর হাতে ছেড়ে দেয়া। তাতে আপনি অনেক চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবেন। আপনার পেশাগত উন্নতির দিকে মনোযোগ দিতে পারবেন। আজ বাজার কী হবে, রান্নায় তেল বেশি দেয়া হবে, নাকি লবণ বেশি দেয়া হবে, এই চিন্তাও যদি আপনাকেই করতে হয়, এই কর্তৃত্বও যদি আপনি করতে চান, এর মানে হলো, খামোখা অশান্তি ডেকে নিয়ে আসা।

আসলে পরিবার মানে কী? দেয়া এবং নেয়া। আপনাকে কিছু বিষয়ে ছাড় দিতে হবে, কিছু বিষয়ে স্ত্রী ছাড় দেবেন। আর, বুদ্ধিমান পুরুষ এসব বিষয়ে প্রথমেই ছাড় দিয়ে দেন।

যেমন স্ত্রীর শাড়ি কিনতে গিয়েও অনেক স্বামী বলেন, এটা নাও, ওটা নাও। কেন? স্ত্রীকে সিদ্ধান্ত নিতে দিন যে, তিনি কোনটা কিনবেন। তিনি চাইলে আপনি মতামত দিতে পারেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত তার। এক্ষেত্রে স্ত্রীর খুশিই আপনার খুশি হওয়া উচিত।

আসলে সব ব্যাপারেই সবসময় লিডার ঠিক হওয়া উচিত। যেমন, প্রথমদিনই স্ত্রীকে আপনি বলে দিন যে, ঘরের যেকোনো ব্যাপারে তুমি লিডার। আর বাইরের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই তুমি যদি আমাকে লিডার হিসেবে পছন্দ কর, তবে আমি দায়িত্ব নিতে রাজি আছি। অর্থাৎ আপনি তো তাকে প্রথমে অধিকার দিয়ে দিলেন, দ্বিতীয় অধিকার তিনি আপনাকে এমনিতেই দিয়ে দেবেন।

আর পারিবারিক জীবনে ঘরের দায়িত্ব যত স্ত্রীর হাতে দিতে পারবেন, তাকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত ও কাজ করতে দেবেন, তত আপনি সুখী হবেন। কারণ, প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব এলাকা থাকা উচিত, যেখানে তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন। তাহলে তার মানসিক তৃপ্তি থাকবে, মানসিক বিকাশ ঘটবে এবং আপনিও শান্তিতে থাকবেন। স্ত্রীকে কখনো দাসী বা কর্মচারী মনে করবেন না; সবসময় তাকে সহযোদ্ধা মনে করবেন। সহযোগী ও বন্ধু মনে করবেন। তাহলে আপনার প্রতি তার যে অনুরাগ, সেটা আসবে ভেতর থেকে। স্ত্রী হিসেবে নিছক কর্তব্য পালন করা আর অনুরাগী হওয়া–দুটোর মধ্যে অনেক তফাত আছে।

প্রশ্ন : *আমার বড় মেয়ের বয়স ১৫ বছর। ইংলিশ ভার্সনে পড়ছে, আগামী বছর এসএসসি পরীক্ষা দেবে। লেখাপড়ায় বরাবরই ভালো। এ কারণে অনেক কিছুতেই ছাড় পেতে পেতে এখন মাথায় উঠে গেছে। ওর মনমতো চলতে-ফিরতে বাধা দিলেই বাবা-মায়ের সাথে বেয়াদবিসুলভ আচরণ করে। সে এই দেশ, বাংলা ভাষা এবং দেশের মানুষকে ঘৃণা করে, যা ধর্মীয়মনা বাবা হিসেবে আমাকে কষ্ট দেয়। ওর সাথে রাগ করি কমই। বরং দোয়া ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় ওর কল্যাণ কামনা করছি। কিন্তু পরিবর্তন নাই। ওর দেখাদেখি ছোট ছেলেমেয়েরাও প্রভাবিত হতে চলেছে। সে কোয়ান্টামেও আসে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, অন্যদের কল্যাণার্থে ওকে বাসা থেকে বের করে দেই। কিন্তু তা-ও পারছি না। কী করবো?*

উত্তর : অনেক মা-বাবা এই ভুলটা করেন। ভালো রেজাল্ট করলে সন্তানের অনেক অন্যায়কে ছাড় দিয়ে দেন। কিন্তু অন্যায়কে কখনো ছাড় দেবেন না রেজাল্ট ভালো হোক আর খারাপ হোক। তাহলে আপনি সন্তানকে মানুষ করতে পারবেন। একটা ভালো কাজ করা কখনো আরেকটা খারাপ কাজ করার জাস্টিফিকেশন হতে পারে না। জাস্টিফিকেশন হওয়া উচিত নয়। অন্যায় যখন ছাড় দেবেন না তখন আপনার সন্তান আপনাকে শ্রদ্ধা করবে।

সাম্প্রতিককালে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, আমরা পত্রিকায় পড়ছি–এগুলো তো একদিনে হয় নি। একদিনে তারা এমন বিধ্বংসী পর্যায়ে পৌঁছায় নি। একটু একটু করেই হয়েছে। একটা চারাগাছকে সোজা করতে হয় কখন? ছোট থাকতে। ছোট থাকতে যদি বাঁকা হয়ে যায়, বড় হওয়ার পরে সেই গাছটিকে কিন্তু আর সোজা করা যায় না।

তাই, যারা মা-বাবা রয়েছেন, সন্তান ছোট থাকতে তাকে সঠিক পথে রাখবেন। বিপথে যেতে দেবেন না। বিপথে যায় কিন্তু সে ধীরে ধীরে। তার একটা অন্যায়ের ছাড় তাকে আরো বড় অন্যায় করতে উৎসাহিত করে। সন্তানের জিপিএ ফাইভ পাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাকে সঠিক জীবনদৃষ্টি দেয়াটা তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অতএব সন্তানকে অতিরিক্ত আহ্লাদ দেবেন না। তবে সন্তানের বন্ধু হবেন। আর এই যে বললেন, ঘর থেকে বের করে দেবেন; আপনার মেয়ে তো! কোথায় বের করে দেবেন? বের করে দেয়াটা তো কোনো সমাধান না। তাকে বরং আরো ধরে রাখতে হবে, ধীরে ধীরে ভালো হতে উৎসাহিত করতে হবে। এজন্যে নিয়মিত কমান্ড সেন্টারে তার জন্যে হিলিং করবেন। নামাজে দোয়া করবেন। নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দান করবেন। ইনশাল্লাহ সে বুঝতে পারবে।

আর, সন্তানদের সবসময় সাথে করে সাদাকায়ন আলোকায়নে নিয়ে যাবেন, সৎসঙ্গে নিয়ে যাবেন, ভালো জায়গায় নিয়ে যাবেন। কোয়ান্টাম ওয়ার্কশপে নিয়ে আসবেন। প্রত্যেক মাসের শেষ বৃহস্পতিবার আলোকিত পরিবার কার্যক্রম হয়, সেখানে সপরিবারে আসবেন। অর্থাৎ ভালো ভালো প্রোগ্রাম যেখানে হয়, সেখানে বাচ্চাকে সাথে নিয়ে যাবেন। তাকে তো ভালো জিনিসগুলো দেখতে হবে। তখন তার মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসবে। সে ভালো বলতে শিখবে, ভালো বুঝতে শিখবে, ভালো করতে শিখবে।

আমরা সবসময় আশাবাদী। যেকোনো জায়গা থেকে একজন মানুষ ফিরে আসতে পারে। আমরা দোয়া করবো যাতে সে ফিরে আসে। কারণ এরাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ। এরা ভালো হোক, সেই লক্ষ্যেই তো আমরা কাজ করছি।

প্রশ্ন : *অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারে দেখা যায় বিয়ের ৮/১০ বছর পার হয়ে যাচ্ছে, কোনো সমস্যাও নেই, কিন্তু সন্তান নিতে চায় না। জিজ্ঞেস করলে বলে, সন্তান জন্ম দিয়ে খাওয়াবো কী? সন্তানকে ভালো ভবিষ্যৎ তো দিতে হবে!*

উত্তর : এটা একটা চরম ভুল ধারণা। আমরা মনে করি, বাচ্চাকে আমরা খাওয়াই। কিন্তু সত্য হলো, বাচ্চাকে শুধু নয়, সব মানুষকেই খাওয়ান আল্লাহ। আল্লাহ তার রিজিকের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তার জীবন-উপকরণের ব্যবস্থা করেন।

যেমন, ৪০ বছর আগেও আমরা শুনেছি যে, আমাদের দেশে খাদ্যাভাব। তখন দেশের জনসংখ্যা ছিলো পাঁচ কোটি। বলা হতো, জনসংখ্যার অনুপাতে আমাদের খাদ্যসামগ্রী কম–আমাদের খাদ্যাভাব, এই অভাব, সেই অভাব ইত্যাদি। আজকে আমাদের দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। খাদ্যের অভাব হয়েছে? হয় নি। এবং আমাদের দেশে ৫০ কোটি লোক হলেও খাদ্যের অভাব হবে না ইনশাল্লাহ। কেন? কারণ রিজিকের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। মানুষ তো বটেই, আল্লাহ প্রত্যেকটা প্রাণীকে তার রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন।

আর আমাদের সমস্যাটা কোথায়? সমাজে যাদের আর্থিক সঙ্গতি কম, আপাতদৃষ্টিতে যারা ভরণপোষণ করতে পারে না, সেখানে জনসংখ্যা বাড়ছে। অর্থাৎ বস্তিতে সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু যারা সামর্থ্যবান, যাদের সন্তানসংখ্যা বেশি হওয়া উচিত, তাদের কমছে। হয়তো তারাও বলে যে, সন্তান বেশি হলে খাওয়াবো কীভাবে? কিন্তু এটা পুরোপুরিই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ, খাওয়ানোর মালিক একমাত্র আল্লাহ। অতএব ন্যূনতম দুটি সন্তান হলে কী খাওয়াবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করে সন্তান না নেওয়াটা একধরনের বোকামিই বটে। আর এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

এ মাসের অটোসাজেশন

মানসিক নিরাপত্তার উত্তম মানবীয় উৎস হচ্ছে পরিবার। পরিবারকে সুখী করার জন্যে প্রয়োজনীয় সময় আমি দেবো।

চট্টগ্রামে রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান ও পারিবারিক ওয়ার্কশপ



৮ নভেম্বর কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম চট্টগ্রাম সেন্টারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান। ২৫ বার, ১০ বার ও তিন বা ততোধিকবার রক্তদানের মাধ্যমে আজীবন রক্তদাতা সদস্য হয়েছেন এমন সাড়ে চার শতাধিক স্বেচ্ছা রক্তদাতাকে নিয়েই ছিলো এই আয়োজন।

২৫ বার রক্তদানের মাধ্যমে গোল্ডেন ক্লাবের সদস্য ২৪ জন, ১০ বার রক্তদানের মাধ্যমে সিলভার ক্লাবের সদস্য ১৯১ জন ও তিন বা ততোধিকবার রক্ত দানের মাধ্যমে ২৬০ জন আজীবন রক্তদাতাসহ সর্বমোট ৪৭৫ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতাকে সুদৃশ্য ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের শাহ আলম বীর উত্তম মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ-এর সভাপতি মাহবুবুল আলম। স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়ে রক্তদাতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আপনারা মানবতার কল্যাণে যে দান করছেন, তা এক মহান ও সর্বোত্তম দান। এই দানের সত্যিকার প্রতিদান দিতে পারেন একমাত্র মহান স্রষ্টা।'

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট লেখক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ এবং আমাদের সময়-এর উপদেষ্টা-সম্পাদক কবি আবুল মোমেন। তিনি বলেন, 'পৃথিবীর সব বড় কাজই হয়েছে স্বেচ্ছা দানের মাধ্যমে। বাঙালি বরাবরই ঐতিহাসিকভাবে দানে অভ্যস্ত। আপনারা সেই চিরন্তন সেবাই দিয়ে যাচ্ছেন।'

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের কো-অর্ডিনেটর মিসেস মাসুদা আক্তার আবেদীন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষা-সংগঠক ও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারের উপদেষ্টা-সমন্বয় মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান। সবশেষে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সেন্টারের অর্গানিয়ার কো-অর্ডিনেশন মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন। রক্তদান কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছা রক্তদাতা, রক্তগ্রহীতা ও তাদের পরিবারের সদস্যবর্গ, শুভাকাঙ্ক্ষী ও মিডিয়া কর্মীবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিলো 'পারিবারিক সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে সন্তান, মা-বাবা ও সঙ্ঘের ভূমিকা' শীর্ষক বিশেষ ওয়ার্কশপ। এতে আলোচনা করেন মিসেস মাসুদা আক্তার আবেদীন, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারের অর্গানিয়ার কো-অর্ডিনেশন মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন এবং অর্গানিয়ার মারুফ ইবনে মাহবুব।

সিডনি সেল-এর উদ্যোগে বিশেষ ওয়ার্কশপ



৩ নভেম্বর সিডনি সেল-এর উদ্যোগে সিডনির অর্বান সারবেনিয়াল হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি বিশেষ ওয়ার্কশপ। এ ওয়ার্কশপে 'সেবক/ প্রো-কোয়ান্টিয়ার হওয়ার গুরুত্ব ও সজ্ঞাচার' বিষয়ে আলোচনা করেন ইউএসএ সেল-এর আর্ডেন্টিয়ার ডা. আবদুল্লাহ ইউসুফ। 'সুসমন্বয়ের গুরুত্ব ও কৌশল' নিয়ে আলোচনা করেন সিডনি সেল-এর আর্ডেন্টিয়ার ফৌজীয়া রাব্বি খান। এতে অন্যতম আকর্ষণ ছিলো শ্রদ্ধেয় গুরুজীর কণ্ঠে রেকর্ডকৃত বিশেষ আলোচনা 'প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞাহীনতা কী? প্রজ্ঞাবান হওয়ার কৌশল' এবং একটি মেডিটেশন। মোট ২৭ জন গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার অংশগ্রহণ করেন এই ওয়ার্কশপে।

ময়মনসিংহ শাখার বার্ষিক ওয়ার্কশপ

১ নভেম্বর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ময়মনসিংহ শাখার উদ্যোগে গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টারদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক ওয়ার্কশপ। দিনব্যাপী এ ওয়ার্কশপে আলোচনা করেন অর্গানিয়ার ইঞ্জিনিয়ার আহমেদ জুবায়ের হাসান। এছাড়াও ছিলো পারিবারিক মেডিটেশন, এসাইনমেন্ট, জীবন কণিকা অডিও সিডি শোনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আত্ম পর্যালোচনার মেডিটেশন। ওয়ার্কশপে সমাপনী বক্তব্য রাখেন অর্গানিয়ার আহমেদ শরীফ। এ ওয়ার্কশপে মোট ৮৫ জন গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার উপস্থিত ছিলেন।

ইউএসএ ভার্চুয়াল সেল-এর উদ্যোগে অনলাইন ওয়ার্কশপ

২৬ অক্টোবর ২০১৩ ইউএসএ ভার্চুয়াল সেল-এর উদ্যোগে প্রবাসী প্রো-মাস্টারদের জন্যে চার ঘণ্টাব্যাপী একটি বিশেষ অনলাইন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় সময় সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। এতে ১০টি দেশ (আমেরিকা, কানাডা, বাংলাদেশ, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, ইংল্যান্ড, আরব-আমিরাত এবং ওমান) থেকে অংশ নিয়েছিলেন প্রায় ৩০ জন প্রো-মাস্টার। এতে আলোচনা করেন অর্গানিয়ার রাবিয়া নাজরীন এবং অর্গানিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল।

ওয়ার্কশপে ছিলো রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রামের ওপর দুটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা 'জীবনদৃষ্টি' এবং 'সমর্পণ ও সমর্পণের সূত্র'। আলোচনা ছাড়াও ছিলো শ্রদ্ধেয় গুরুজীর কণ্ঠে রেকর্ডকৃত একটি বিশেষ মেডিটেশন এবং প্রশ্নোত্তর।

দিনাজপুর সেল-এর উদ্যোগে পারিবারিক ওয়ার্কশপ

১৫ নভেম্বর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন দিনাজপুর সেল-এর উদ্যোগে দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্স মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো একটি বিশেষ পারিবারিক ওয়ার্কশপ। সকাল ৯টা থেকে প্রায় চার ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত এ ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন মোট ১৬৭ জন গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার ও এসোসিয়েট।



ওয়ার্কশপে 'অভিভাবক-সন্তান সুসম্পর্ক : অভিভাবকের করণীয়' নিয়ে আলোচনা করেন ফাউন্ডেশনের আর্ডেন্টিয়ার বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. হাসনাইন নান্না এবং 'অভিভাবক-সন্তান সুসম্পর্ক : সন্তানের করণীয়' বিষয়ে আলোচনা করেন অর্গানিয়ার মারুফ ইবনে মাহবুব। প্রোগ্রামের মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন আর্ডেন্টিয়ার এ.এস.এম মুনিম হোসেন রুপম। এতে গ্রুপ-ডিসকাশন, প্রেজেন্টেশন ছাড়াও ছিলো সুখী পরিবার ও আত্মপর্যালোচনার মেডিটেশন।

বগুড়া শাখায় ওয়ার্কশপ

১৫ নভেম্বর বগুড়া শাখায় বিশেষ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। চার ঘণ্টাব্যাপী এ ওয়ার্কশপে আলোচনা করেন রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ-এর সহকারী অধ্যাপক ও ফাউন্ডেশনের আর্ডেন্টিয়ার জনাব মাসুদুল হক সিদ্দিকী। নিয়মিত মেডিটেশন, পরিবারের সদস্যদের মেডিটেশনে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা ও নিয়মিত দানের অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের প্রথম সেশনে ১২০ জন গ্রাজুয়েট ও এসোসিয়েট এবং দ্বিতীয় সেশনে ৮৫ জন গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার অংশগ্রহণ করেন।



নিয়মিত সঞ্চয়বদ্ধ দান ॥ আনে কল্যাণ অফুরান

সৃষ্টির সেবায় সঞ্চয়বদ্ধভাবে কাজ করার তাগিদে ১৯৯৮ সালে সূচনা হয় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মাটির ব্যাংক কার্যক্রমের। নিজের বালা-মুসিবত দূরে এবং অসহায় মানুষের কল্যাণে প্রথম বছরে সম্মিলিত দানের পরিমাণ ছিলো ১৮ হাজার টাকা। পরের বছরগুলোতে এই দানের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০০৪ সালে এই দান অতিক্রম করে কোটির অংক আর ২০১২ সালে দানের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১ কোটি ৮৩ লক্ষাধিক টাকা।

এই বাস্তবতার নেপথ্যে রয়েছে দাতা ও গ্রহীতার নিশ্চিত কল্যাণ। মাটির ক্ষুদ্র পাত্রে একজন দাতা সাধ্যমতো দান করতে পারেন। প্রতিদিনের ক্ষুদ্র দান বছর শেষে একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করে বঞ্চিতের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ। সেই সাথে দাতা এর মাধ্যমে অর্জন করেন দৈনন্দিন জীবনে প্রাচুর্য, দুরারোগ্য ব্যধি থেকে মুক্তি এবং নানাবিধ পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ। তাই তো অফুরন্ত কল্যাণ আর রহমতের মাধ্যম এই ছোট্ট মাটির ব্যাংক আজ দৃশ্যমান হয় ঘরে, দোকানে, অফিসে।

দানের মাধ্যমে আমরা যেমন কল্যাণের ভাগীদার হই তেমনি সঠিক খাতে ব্যয় না হলে তার দায়ভার থেকেও আমরা মুক্ত নই।

বিদেশী সাহায্য বা দাতাগোষ্ঠীর সৌজন্যে নয়, বরং স্ব-অর্থায়নে বাংলাদেশেও পরিচালিত হতে পারে সফল সেবা প্রকল্প। এই বিশ্বাস নিয়ে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন যে মাটির ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে তাতে ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের নানা শ্রেণী পেশার মানুষ। অসহায় মানুষের জন্যে কিছু করার দায়িত্ববোধ থেকে ১৫ বছরে সংযুক্ত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ।

দিনে বা রাতে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, সচ্ছল বা অসচ্ছল অবস্থায় দান করার এক অনন্য ক্ষেত্র এই মাটির ব্যাংক। আপনিও এতে শরিক হোন। মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দানে আসুক আপনার জীবনে সমৃদ্ধি আর স্বাবলম্বী হোক আরো অসংখ্য মানুষ।



এ বছরের জানুয়ারিতে কোয়ান্টাম পরিবারের ১৩২ জন চিকিৎসকের অংশগ্রহণে লামায় অনুষ্ঠিত দেশের সর্ববৃহৎ মেডিক্যাল ক্যাম্প। এছাড়াও কোয়ান্টামম এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত চিকিৎসাসেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হয়েছে ৬০ হাজারেরও বেশি দুঃস্থ রোগীকে



অসহায় অনাথ শিশুদের জন্যে কোয়ান্টামম-এর আলফা পয়েন্টে অনন্য স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত হয়েছে নতুন আবাসন। ১৫০x৩২ ফুট আয়তন বিশিষ্ট এ ঘরে একসাথে থাকতে পারবে তিন শতাধিক শিশু



পড়াশোনা ও খেলাধুলাসহ সব ক্ষেত্রে সাফল্যের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের সাড়ে ছয় শতাধিক শিক্ষার্থী



থ্যালাসেমিয়া-আক্রান্ত পাঁচ শতাধিক রোগীকে প্রতিমাসে প্রসেসিং খরচ ছাড়াই বিনামূল্যে রক্ত প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও গত ১২ বছরে কোয়ান্টাম ল্যাব সরবরাহ করেছে সাড়ে পাঁচ লক্ষাধিক ইউনিট বিশুদ্ধ রক্ত ও রক্ত উপাদান



মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ১১শ মা ও শিশু পেয়েছে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা ও পর্যাপ্ত পুষ্টি



স্বনির্ভরায়ণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণমুক্ত স্বাবলম্বী জীবন গড়ছেন শত শত মানুষ



গৃহহীনদের জন্যে তৈরি করে দেয়া হচ্ছে নতুন টিনের ঘর



এ পর্যন্ত খতনা সেবা দেয়া হয়েছে ৯০ হাজারের অধিক শিশু-কিশোরকে

কোয়ান্টাম বুলেটিন : ডিসেম্বর ২০১৩ ॥ সম্পাদক : কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইভোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 8319377, 8391391 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd